পত্রবিলাসী

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

সুরভি প্রকাশনী
১, কলেজ রো, কলিকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ : শ্রীপঞ্চমী ১৩৬৮
৯ ফেব্রুআরি ১৯৬২

প্রকাশক : শ্রীসরোজবরণ মুখোপাধ্যায়
সুরভি প্রকাশনী
১ কলেজ রো, কলকাতা ৯

প্রচ্ছদপট : শ্রীগণেশ বসু
ব্লক : স্ট্যাণ্ডার্ড ফোটো এনগ্রেভিং কোং
মুদ্রন : চয়নিকা প্রেস প্রাইভেট লিঃ

মুদ্রাকর : শ্রীবিমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
তারকনাথ প্রেস
২ শিবদাস ভাদুড়ী স্ট্রীট
কলকাতা ৪

তিন টাকা

স্বরশিল্পী নিতাই বসু
কল্যাণীয়েষু

Now to your touch this string, now that one stirs
And each man sees what in his heart he bears.

Goethe.

তারে তারে লাগে ছোঁয়া জনে জনে জানে
হৃদয় গুমরি ওঠে কিসের আহ্বানে।

লেখকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস

হেডমাস্টার

জবানিতে

নিজের বইয়ের ভূমিকা লেখার রেওয়াজ আজকাল আর নেই। ভূমিকা যদি লিখতেই হয় আর একজন কেউ লিখে দেবেন। তাই নিয়ম। নিজের সম্বন্ধে 'অন্যে বাক্য কবে তুমি রবে নিরুত্তর।'

বিশেষ করে গল্প উপন্যাসের ভূমিকার তো কথাই ওঠে না। গল্পের আবার ভূমিকা কিসের। আদি অন্ত মধ্য তো কাহিনীর মধ্যেই নিহিত।

প্রকাশকের ব্যয়বাহুল্য কমানো ছাড়াও নিজের সৃষ্টি সম্বন্ধে মৌন থাকার স্বপক্ষে আরো অবশ্য যুক্তি আছে। লেখকের যা বলবার তিনি তো তাঁর গল্পের মধ্যেই বলেছেন। তার পরেও যদি কিছু বলেন তা হয় পুনরাবৃত্তি হবে, না হয় অপ্রাসঙ্গিক। তা হবে ধান ভানতে শিবের গীত। গলা যদি ভালো হয় সে গীতও হয়তো পাঁচজনকে কিছুক্ষণের জন্য শোনানো যায়। কিন্তু কাঁসর কণ্ঠ হলে আর রক্ষা নেই।

আরো বিপদ আছে। লেখক সবসময় সৎপাঠক নন। অন্তত সব লেখক নন। না নিজের লেখার, না অন্যের। সমালোচক হিসাবেও তিনি খুব কম ক্ষেত্রেই আস্থাভাজন। তাই নিজের লেখা সম্বন্ধে তিনি যখন কিছু বলেন তা সব সময় শ্রোতব্য নাও হতে পারে। যে লেখক নিজেই নিজের মল্লিনাথ তাঁর হাতে রচনার অপব্যাখ্যা অতিব্যাখ্যার আশঙ্কা আছে। যিনি নিজেই নিজের টীকা করেন তাঁকে সমাজের আর পাঁচজনের টিপ্পনী সহ্য করতে হয়।

এই সব বিপদের ঝুঁকি ঘাড়ে নিয়েও আমি মুখবন্ধে মুখ সত্যি বন্ধ না রেখেই দু'চার কথা বলবার মনস্থ করেছি। প্রস্তাবটা অবশ্য অকৃপণ প্রকাশকের পক্ষ থেকেই প্রথম এসেছে। তারপর আমি দাঁড়িয়ে উঠে সমর্থন করেছি। প্রকাশকের অনুরোধের কথায় আমার মনে হল পুরনো গয়নার প্যাটার্ণের মত, কি অতি সেকেলে নামের মত কিছু কিছু রীতিকে নতুন রূপে ফিরিয়ে আনলে মন্দ হয় না। এই শতাব্দীর গোড়ার দিকেও লেখক তাঁর রচনা সম্বন্ধে এখনকার দিনের মত এত নির্বিকার থাকতেন না। রচনার প্রথম প্রকাশের সন তারিখ এবং যেসব সাময়িক পত্রিকায় তা প্রকাশিত হয়েছে বইয়ের সুরুতে তার উল্লেখ থাকত। আজকাল আমরা নিরবধিকালে বিশ্বাসী। সেই কালের গায়ে

তারিখের চকখড়ির দাগ দিতে নারাজ। রচনার ইতিবৃত্তে লেখকও আজকাল নীরব, পাঠকও উৎসাহহীন। কিন্তু আমার মনে হয় আমাদের লেখক জীবনের এই ছোট ছোট তারিখগুলিকে মাঝে মাঝে লিখে রাখবার রীতি আমরা ফের প্রবর্তন করলে পারি। একেবারে নৈর্ব্যক্তিক ভাবে বইখানিকে পাঠকদের কাছে না পাঠিয়ে কোনকোন সময় দুচারটি ব্যক্তিগত কথায় তাঁদের সঙ্গে আরও একটু ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পাতাতে পারি। অবশ্য যে পাঠক এ ধরনের পাতানো সম্পর্কে বিশ্বাসী নন তিনি গোড়ার দিকে শুকনো পাতাগুলি ঝাঁট দিয়ে সরাসরি গল্পের উদ্যানে ঢুকে পড়বেন। তাঁকে রুখবে কে? কিন্তু যাঁর হাতে কিছু সময় আর মনে কিঞ্চিৎ উদারতা আছে, তিনি লেখকের গৌরচন্দ্রিকায় কান পাতলেও পাততে পারেন।

এই সংকলনের গল্পগুলি গত পাঁচবছরের মধ্যে লেখা। তাই বলে এগুলি যে আমার কোন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার নিদর্শন তা নয়। এই পাঁচ বৎসরেরর মধ্যে ছোট বড় মাঝারি আরো অনেক গল্পই লিখেছি, সেগুলি বই হিসেবেও বেরিয়েছে। এই গল্পগুলিও ছিটকে পড়ে কোন-না-কোন সংকলনের দুটি মলাটের মধ্যে আশ্রয় নিতে পারত। পাঁচটি না হোক, দু'তিনটি ভিন্ন ভিন্ন সংকলনে ছড়িয়ে পড়বারই এদের বেশি সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তা হয়নি। একটি বিশেষ সংকলনের জন্যই এদের আমি আলাদা করে রেখেছিলাম। আমি এতদিন সাধারণত রচনাকালের দিকে লক্ষ্য রেখেই আমার গল্পগুলিকে সংকলিত করেছি। এদের বলা যায় বর্ষপঞ্জী। এক বছরের সন তারিখ যেমন সীমানা ডিঙিয়ে আর এক বছরের আঙিনায় প্রবেশ করে না, আমিও প্রায় তেমনি এক বছরের রচনাকে আর এক বছরের বইয়ের মধ্যে মাথা গুঁজতে দিই নি। যদিও নিশ্চিত জানি, কোন লেখকের চিন্তাধারা কি রচনারীতিই ক্যালেণ্ডারের শাসন মানে না। অতি প্রতিভাবান দীর্ঘায়ু লেখক হয়তো দশকে দশকে বদলান। কিন্তু বেশির ভাগ লেখকই বাহুত ব্যকরণের অব্যয়। কি দর্শনের ব্রহ্ম। সারা জীবনেও তাঁরা মোড় ঘোরেন না।

লোকে যে মনোভাব নিয়ে বছর বছর আলাদা আলাদা ডায়েরি রাখে, আমিও অনেকটা সেই রকম করে ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়ে গল্পগুলিকে বেঁধে রেখেছি। গল্পও তো এক হিসাবে ডায়েরি। ছদ্মনামে, ছদ্মবেশে লেখকের মনোলোকের দিনলিপি।

পত্রবিলাসের সাতটি গল্পকে আর একটি ভিন্ন পরিকল্পনায় এক পরিবার-ভুক্ত করেছি। এরা কোন একটি বিশেষ বছরের ফসল নয়, পাঁচ বছরের পঞ্চশস্য। কিছু বা আয়তন, কিছু বা মানগত ঐক্যে, এই সাতসঙ্গীর

সামান্যতা। অবশ্য উৎকর্ষের উল্লেখ সংকোচের সঙ্গে করি। নিজের রচনা সম্বন্ধে লেখকের নিজের বিচার ঠিক নির্ভরযোগ্য মাপকাঠি নয়, একথা আগেই বলেছি, বরং দুর্বল সন্তানের ওপর মায়ের মাত্রাধিক মমতার মত দুর্বল সৃষ্টির প্রতি শিল্পীর পক্ষপাত বেশী থাকে বলে অনেকে মনে করেন। কোন কোন সময় এ ধারণা নির্ভুল হতে দেখা যায়। আবার এর ব্যতিক্রমও যে না ঘটে তা নয়।

সাতটি গল্পই যে একই শ্রেণীভুক্ত, তারা যে পাঠক পাঠিকাকে সমান তৃপ্তি দেবে, তা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। লেখককেও তা দেয়নি। নিজের রচনায় লেখকের তৃপ্তি বোধহয় সব চেয়ে ক্ষণিক। সৃষ্টি কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তারপর নিজের মনে তাঁর রচনার কালান্তর ঘটে। লেখার সময় যে তীব্রতা যে তন্ময়তা তিনি অনুভব করেন, সেই অনুভূতি নিজের রচনার পাঠ তাঁকে এনে দিতে পারে না। লেখক তাঁর নিজের রচনার অনভ্যস্ত প্রুফরীডার মাত্র। নিজের লেখা সম্বন্ধে তাঁর এই স্বভাবগত নির্মমতা আছে বলেই পরের মুখে ঝাল না খেলে তাঁর চলেনা। ঝাল মানে এখানে মিষ্টি। লেখক তাঁর পাঠক পাঠিকার কথামৃতে বাঁচেন। তাছাড়া শিল্পীরা প্রায় সবাই স্তুতি নির্ভর। এদিক থেকে সুরলোকের দেবতা আর ইহলোকের দেবীদের পরেই তঁদের আসন। যাঁরা বিচক্ষণ বৈষয়িক, তাঁরা লেখকদের এই দুর্বলতার সুযোগ নিতে ছাড়েন না।

প্রসঙ্গের বাইরে চলে যাচ্ছি, এবার ফের ভিতরে আসবার চেষ্টা করি। এই সাতটি গল্পকে গুচ্ছবদ্ধ করে আমি বলতে চাইনে আমার সামগ্রিক রচনায় এরা কোন বিশেষ পর্বের সূচনা করেছে, আমি এমন কোন অভিনব আঙ্গিক গ্রহণ করেছি, যা এর আগে করিনি, কি এমন কোন অভিজ্ঞতার কথা বিবৃত করেছি যা এর আগে করিনি, এমন কোন অননুভূত উপলব্ধিকে তুলে ধরেছি এর আগে যার ধরাছোঁয়া পাই নি। আমার কোন রচনার মধ্যেই বোধহয় সেই বিস্ময়কর সীমাতিক্রম নেই। আমার সব রচনাই অনুচ্চভাষী, অনুচ্চাভিলাষী। একেবারে অসার্থক নিকৃষ্ট গল্পগুলিকে বাদ দিয়ে আমার গত ষোল সতের বছরের (আমার প্রথম গল্প-সংকলন অসমতল বেরোয় ১৯৪৬এ। সাময়িক পত্রে লেখা ছাপা হয় তারও দশ বছর আগে।) ভালো মন্দ, মাঝারি গল্পগুলির দিকে যদি পিছন ফিরে তাকাই এক অদ্ভুত অনুভূতিতে আমার মন ভরে ওঠে। যেমন অতীতের ফেলে আসা দিনগুলিকে রাতগুলিকে স্মৃতির রঙীন চশমার ভিতর দিয়ে আমি শুধু চেয়ে দেখতে পারি, সত্যিসত্যি সেখানে গিয়ে আর বাস করতে পারিনে, তেমনি আমার রচনাগুলির দিকে কোন কোন সময় আমি মমতার চোখে

তাকালেও আমার আশঙ্কা হয় সেগুলি আমি আর ফের পড়তে পারিনে। শুধু তাই নয় তেমন করে লিখতেও পারিনে।

ক্ষমতা অক্ষমতার কথা না তুলে বলা যায় এই না পারাটা আমাদের স্বভাব। আমার প্রথম গল্প সংকলন থেকে আপাতত এই শেষ গল্প সংকলনের ষোল বছর ধরে এক হিসাবে আমি বিশেষ বদলাইনি। যদি বদলে থাকি, আমার কোন কোন বন্ধুর মতে আমার সেই পরিবর্তন প্রীতিকর নয়। আমার ছোট গল্প দীর্ঘকায় হয়েছে, আঁটসাঁট গড়ন ঢিলে হয়েছে। আমি ঘরের বাইরে যদি বা গিয়েছি, পাড়ার বাইরে বড় একটা পা বাড়াইনি। আমি শুধু দুচারটি মধ্যবিত্ত পরিবারের প্রতিদিনের সুখ দুঃখের কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করেছি। এ অভিযোগ খণ্ডন করবার চেষ্টা করব না। কিন্তু আমি জানি দৃশ্যত চমকপ্রদভাবে না বদলালেও আমি অব্যয় অপরিবর্তনীয় হয়েও থাকতে পারি নি। কেউ তা পারে না। জীবদেহ যেমন স্বাভাবিক নিয়মে কৈশোর যৌবন জরার সীমানা ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে চলে তেমনি কোন লেখকের রচনারও প্রায় স্বাভাবিক নিয়মে আন্তর পরিবর্তন ঘটে। তাঁর বয়স আর অভিজ্ঞতার ছাপ লেখার গায়ে না পড়েই যায় না। কারণ তাঁর বাক্য তো শুধু বাক্য নয়, মনেরই অবয়ব।

আমি পরিবর্তনের এই অস্পষ্ট প্রচ্ছন্ন ধারায় বিশ্বাসী ; আমি অন্তঃশীলা ফল্গুধারাকে ভালবাসি। এই আমার স্বভাব। সেই স্বভাব অতিক্রম করা যায় না, কারণ অতিক্রম করতে আমরা চাইনে। এই ন্যূনতম আত্মাদর আছে বলে আমরা বেঁচে আছি।

বিষয় বৈচিত্র্যের গুরুত্ব আমি অস্বীকার করিনে কিন্তু সে বৈচিত্র্য যে সব লেখকের জন্য নয়, সে কথাও স্বীকার করি। দূর দূরান্তর থেকে আমি যে গল্প আহরণ করতে পারিনি সে জন্যে আমার মনে ক্ষোভ নেই। যারা আমার কাছাকাছি আছে, আশেপাশে আছে তাদের যে আমি আরো গভীর ভাবে দেখতে পাইনি, তারা যে আমার চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে, আমার অন্যমনস্কতার অর্দ্ধমনস্কতার আড়াল দিয়ে চলে যাচ্ছে, তাদের সঙ্গে আমার যোগ যে নিবিড়তর হয়নি, আমার মনস্তাপ সেই জন্যে। আমি দেখেছি যাদের আমি চিনি বলে মনে করি তাদেরও আমি কম চিনি। চেনাবার শক্তি আরো কত কম। কী হবে আমার অচীন দেশে গিয়ে।

কিছুদিন আগে আমার এক প্রীতিভাজন বন্ধু আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আচ্ছা, আপনি কি আপনার গল্পের ফর্ম নিয়ে কিছু ভাবেন না ?' তাঁর প্রশ্নের ধরনে আমি মনে মনে বিস্মিত, একটু বা আহত হয়েছিলাম। আমার অন্তরঙ্গ পাঠক জানেন যে আমি আমার লেখার বহিরঙ্গ সম্বন্ধে অচেতন

যা অবচেতন নই। কি নিজের লেখায়, কি অন্যের লেখায়, আমি প্রকাশভঙ্গিকে লক্ষ্য করি। লেখক কী বলেন শুধু তাই শুনিনে, কেমন করে বলেন তাও দেখি। রচনার দেহকেই আত্মা বলব আমি সেই অর্থে দেহাত্মবাদী নই। কিন্তু শিল্পের ক্ষেত্রে দেহ আর আত্মা যে অভিন্ন তাতে আমি সংশয়হীন।

তবু আমার সেই হিতৈষী বন্ধুর কথা ভেবে দেখেছি, বাক্যের গঠন সম্বন্ধে নিজের মনঃপূত শব্দ চয়নে আমি অসতর্ক না হয়েও গল্পের গঠনে তার নতুন নতুন ছাঁচ আর ছক উদ্ভাবনে আমি আমার কোন কোন লেখক বন্ধুর মত মনোযোগী নই। তেমন উৎসাহীও নই; বোধহয় কোন কালেই ছিলাম না। এদিক থেকে আধারের চেয়ে আধেয়ই আমার ধ্যেয়, স্থান কালের চেয়ে পাত্রপাত্রী। তবু অন্যের রচনায় বহিরঙ্গের বৈচিত্র্যকে আমি উপভোগ করি, যদিও খুঁড়িয়ে হাঁটাকে আমি হাঁটার নতুন রীতি বলিনে, তোতলামিকে নতুন বাকভঙ্গি বলে মানতেও রাজী হইনে। হতে পারি আমি রক্ষণশীল।

পত্রবিলাসের গল্পগুলির সম্বন্ধে কিছু বলব বলে ভূমিকার পত্তন করেছিলাম। কিন্তু বলতে গিয়ে মত পালটে নিয়েছি। যদিও লেখা নিয়ে একথা সে কথা কম বলা হল না, কিন্তু তীর কিছুতেই লক্ষ্য ভেদ করেনি। পাঠক বোধহয় ইতিমধ্যে টের পেয়েছেন, লক্ষ্য কিছু নেই, এলোপাথাড়ি শর নিক্ষেপই উদ্দেশ্য।

গল্পগুলির ভাষ্য করার প্রয়োজন নেই। টীকা টিপ্পনী দোষগুণ বিচারের ভার লেখকের নিজের হাতে নেই। টের পেলেও নিজের রচনাকে পুরোপুরি নিখুঁৎ করা তাঁর ক্ষমতার বাইরে, শুধু খুঁৎখুতিটুকু একান্তভাবে তাঁর নিজস্ব। তার কেউ অংশীদার নেই।

তার চেয়ে গল্পগুলির উপাদান নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারত। কোন কোন জীবন্ত পাত্রপাত্রী কোন কোন অংশে তাদের পায়ের ছাপ হাতের ছোঁয়া রেখে গেছে, সেই কাহিনী পাঠকদের শোনাতে পারতাম। কিন্তু আইন আদালতের শাসন এবং সামাজিক রীতিনীতির অনুশাসনের কথা বাদ দিলেও গল্পের পাশে তার উৎসকে তুলে ধরলে, কোন কোন পাঠকের কৌতূহল উদ্রেক করা গেলেও, তাতে রসের হানি হয়। তাছাড়া লেখকের নানা ঘটনা কি চেনা পাত্রপাত্রীই তো তাঁর লেখায় উৎসের সবখানি নয়। সত্যিকারের উৎস আরও গভীরে, আরও গহন দেশে। সেখানে খননের কাজ চালানো কঠিন। সে কাজ মনস্তাত্ত্বিকের। লেখক যত সত্য ঘটনা নিয়েই লিখুন, গল্প যাঁর শিল্পমাধ্যম, কথা তাঁকে বানাতেই হয়। ব্যবহারিক জীবনে তিনি মাঝে মাঝে যত সত্যান্ধই হননা কেন, কলমের মুখে সত্য কথা বলা তাঁর কুষ্ঠীতে লেখা নেই।

সোহাগিনী নামের গল্পটি ১৯৫৭ সনে (বাংলা ১৩৬৪) 'দেশ' পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় 'তুফানী' নামে বেরিয়েছিল। এই সংকলনে শুধু নামান্তর নয়, দু'একটি জায়গায় গল্পটির রূপান্তরও ঘটিয়েছি। তাতে মূলরসের ধারা শীর্ণ হয়নি বলেই আমার বিশ্বাস। গল্পটি যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, সেসময়ে প্রতিকূল সমালোচনার তুফান ছুটেছিল। অশোভন আর অশালীন বলে গঞ্জনাও গল্পটির ভাগ্যে কম জোটে নি। এমন কি আমার ঘনিষ্ঠ কয়েকজন লেখক বন্ধুও গল্পের কোন কোন অংশে সায় দিতে পারেননি। কেউ বা শরীরতত্ত্বের তথ্যগত ভুলও ধরেছেন। নিন্দুকদের গালমন্দের জন্যে নয়, বন্ধুদের বিচারবোধের উপর নির্ভর করেই আমি গল্পটির কোন কোন জায়গায় কিছু কিছু ঘষামাজা আর অদলবদল করেছি। যে স্বল্পসংখ্যক পাঠক রচনাটির পূর্বপাঠের অনুরাগী ছিলেন, তাঁরা এতে ক্ষুণ্ণ হবেন এবং লেখকের ভীরুতা দুর্বলচিত্ততার উপর পরিহাসবৃষ্টি করবেন।

গল্পটির বিশেষ বিশেষ অংশে রূঢ়তা আর স্থূলতার ছাপ ছিল, সে কথা আজ স্বীকার করি। তবে পরিমার্জনের ফলে গল্পটির শক্তি বাড়ল না কমল সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ নির্দ্বিধ নই। কিন্তু এক সঙ্গে দুইকূল রাখা যায় না। যদিও তুলনা করবার জন্যে দুটি পাঠই রইল। একটি এই বইয়ের দুখানি মলাটের মধ্যে; আর একটি 'দেশ' পত্রিকায়—পুরনো ফাইলের কথা বলছিনে, তা আর কে ঘাঁটতে যাবে—আর একটি পাঠের স্বাদ হয়তো রইল তখনকার সহৃদয় দুচারটি পাঠক বন্ধুর ক্ষীণ অস্পষ্ট স্মৃতিলোকে।

শ্রীপঞ্চমী, ১৩৬৮
পাইকপাড়া, কলিকাতা

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

শ্বেত ময়ূর

নীল রঙের একটি দোতলা বাস পশ্চিম থেকে পুবে ছুটে যেতে না যেতেই নতুন ঘন নীলের আর একটি বাস পুব থেকে পশ্চিমে ছুটে এল। আর শীলাদের বাড়ির সামনের স্টপটাতেই দাঁড়িয়ে পড়ল। পোস্টের গায়ে আঁটা গোল চাকতিতে স্টপ বলে লেখা থাকলেও সব বাস এই স্টপে দাঁড়ায় না। যাত্রী থাকলেও নয়। 'বাঁধো বাঁধো' করতে করতে ড্রাইভার ভারী বাসটাকে আরও দূরে স্কুলের সামনে যে স্টপটা সেদিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। তাদের বাড়ির সামনে বাস না থামলে মাঝে মাঝে শীলার রাগ হয়। আবার কোন কোনদিন সহানুভূতি হয় ড্রাইভারের ওপর। বাস চালাতে শুরু করলে তা বোধ হয় আর থামাতে ইচ্ছা করে না। মনে হয়, কেবলি চালাই কেবলি চালাই। বাসের দোতলায় একবার উঠে বসলে শীলার যেমন আর নামতে ইচ্ছা করে না। মনে হয় কেবলি চলি কেবলি,চলি।

কিন্তু চলা তো আর সব সময় যায় না। আজকাল শীলা খুব কমই বাড়ি থেকে বেরোতে পারে। সংসারে অনেক কাজ তাছাড়া সে ঢের বড় হয়ে গেছে। এখন কি আর যখন তখন বাইরে বেরোলে চলে? কিন্তু বাড়ির বাইরে না গেলেও সিঁড়ি পর্যন্ত আসতে দোষ কি। বসবার ঘরের জানলা দিয়ে, কি সদর দরজার আধখানা পাট মেলে, লোকজনের চলাচল, ট্যাক্সী, কার, আর বাস চলাচল দেখতে তো দোষের কিছু নেই। চলন্ত বাসের ফাঁক দিয়ে মানুষকে দেখতে বড় ভালো লাগে শীলার। এই পাড়ার লোককেই মনে হয় অচিন দেশের মানুষ। মা অবশ্য তার সদরে এসে দাঁড়ানো বেশি পছন্দ করেন না। প্রায়ই ধমক দেন, 'কি যখন তখন হাঁ করে রাস্তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে থাকিস? লজ্জা করে না? ষোল উৎরে সতেরয় পড়লি এখনো কি সেই ছোটটি আছিস?' কিন্তু পড়লই বা সতেরয়। তাই বলে কি আর শীলার দেখতে ইচ্ছা করে না? এই গাছপালা লোকজন রোদবৃষ্টি পৃথিবীর সবই যে কত সুন্দর মা তো তা জানে না।

'কি শীলারাণী, একেবারে দোরের সামনে এসে দাঁড়িয়ে যে! আমাদের অভ্যর্থনা করার জন্যে নাকি?' বাস স্টপে নেমে রাস্তা পার হয়ে দুজন ভদ্রলোক

যে একেবারে তাদের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন তা শীলা লক্ষ্যই করেনি। নীল মেঘের মত চলন্ত বাসটাই তার দুটি কৌতূহলী চোখকে সঙ্গে সঙ্গে টেনে নিয়ে চলেছিল।

একটু জিভ কেটে লজ্জিত ভঙ্গিতে শীলা পিছিয়ে এল। আগন্তুক হেসে বলল, 'ও কি, পালাচ্ছ কেন।'

পালাবার কিছু নেই। ছোড়দির বর অনিন্দ্যদা। আত্মীয়। আপন জন। কিন্তু ওঁর পাশে উনি কে। অনিন্দ্যদার চেয়ে মাথায় আধ হাতখানেক লম্বা। দুধের মত ফর্সা চেহারা! সবুজ রঙের একটা জামা গায়ে আর চোখ দুটিও নীল নীল। কে উনি?

শীলা ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করল, 'অনিন্দ্যদা, কে উনি? উনি কি সাহেব?'

অনিন্দ্য সরবে সগৌরবে হেসে বলল, 'অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ট্যাংলো ইণ্ডিয়ান নয়, একেবারে খোদ সাহেব। দ্বীপবাসী ইংরেজ তনয় নয়, কন্টিনেণ্টের জাত জার্মান।'

তারপর অতিথির দিকে ফিরে অনিন্দ্য বলল,

'Man, she is my sweet sister-in-law—the youngest, the sweetest and the best.'

শীলা মৃদু তিরস্কারের সুরে বলল, 'অনিন্দ্যদা, ওকি হচ্ছে। আমি ছোড়দিকে ঠিক বলে দেব।'

কিন্তু ততক্ষণে সাহেব হাত এগিয়ে দিয়েছে, উদ্দেশ্য—করকম্পন। পর-মুহূর্তেই তার কি মনে পড়ে গেল। জোড়হাত কপালে তুলে বলল—'নো-মস্কার।'

তার উচ্চারণ আর নমস্কার জানাবার ভঙ্গি দেখে হাসি চেপে রাখা শীলার পক্ষে কঠিন হল। উচ্ছ্বসিত হাসি সংবরণের চেষ্টায় প্রতিনমস্কারের কথা তার মনে রইল না। অনিন্দ্যের দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল, 'ওঁকে নিয়ে ভিতরে আসুন।'

নীলাদ্রি মুখ হাত ধুয়ে চাটা খেয়ে ছোট তক্তপোষখানার ওপরে সবে সেতারটির ঢাকনি খুলেছে, শীলা তার ঘরের দিকে মুখ বাড়িয়ে বলল, 'ফুলদা, দেখ কে এসেছেন।'

নীলাদ্রি স্মিতমুখে বলল, 'কে রে?'

'অনিন্দ্যদা, আরো যেন কে। বেরিয়ে এসে দেখই না। বাইরের ঘরে আছেন।'

কোন রকমে তাকে খবরটা দিয়ে শীলা পাশের ঘরে এসে ঢুকল। এ ঘরেও একখানা তক্তপোষে বিছানা গুটানো রয়েছে। তার ওপর উপুড় হয়ে পড়ে কোমল সুন্দর মুখখানাকে শক্ত করে চেপে ধরল শীলা। ডুরে শাড়িপরা তার তনুদেহ বিপুল আবেগে ফুলে ফুলে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল।

আলমারি থেকে বাজারের টাকা বের করে দেওয়ার জন্যে সরোজিনী এসে ঘরে ঢুকলেন কিন্তু আঁচলের চাবি আলমারির তালায় লাগাবার আগে মেয়েকে দেখে হঠাৎ থমকে গেলেন।

মৃদু কিন্তু উদ্বিগ্ন স্বরে বললেন, 'কী ব্যাপার। কী হোলো তোর।'

তারপর নিচু হয়ে ঝুঁকে পড়ে মেয়ের মুখখানা একটু দেখে নিয়ে আশ্বস্ত হয়ে বললেন, 'ও হাসছিস, তাই বল। আমি ভাবলাম কী আবার হোলোরে বাপু। এই সাত সকালে কে আবার তোকে বকুনি লাগাল।'

শীলা এবার মুখ তুলে বলল, 'বাঃ রে বকুনি আবার কে দেবে। মা জানো, অনিন্দ্যদা কোত্থেকে এক জার্মান সাহেবকে নিয়ে এসেছে। কী তার বাংলা বলবার কায়দা আর নমস্কার জানাবার বহর। যাও, দেখ গিয়ে। বাইরের ঘরে সব বসে আছে।'

'অনিন্দ্য এসেছে নাকি? কোথায়!' আলমারি খুলে পাঁচ টাকার একখানি নোট বের করলেন সরোজিনী, তারপর মাথার আঁচলটা একটু টেনে দিয়ে বসবার ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন। হাসির কয়েকটি উচ্ছল তরঙ্গকে বিছানার মধ্যে ঢেলে দিয়ে শীলাও চলল মার পিছনে পিছনে। যখন তখন খিল খিল করে হাসলে ফুলদা বড় বিরক্ত হয়। যার তার সামনে কড়া ধমক লাগায়। কিন্তু হাসি পেলে কেউ না হেসে পারে। তবু তো আগের চেয়ে আজকাল অনেক কম হাসে শীলা। আগে তেমন সাংঘাতিক রকমের হাসি পেলে মেঝেয় লুটোপুটি খেত। গড়িয়ে গড়িয়ে একেবারে তক্তপোষের তলায় চলে যেত। চোখে জল না আসা পর্যন্ত হাসি তাকে ছেড়ে যেত না।

ফুলদা বলে, 'হাসিটা ওর এক রোগ। শীলা একটা আস্ত পাগল।'

'আহা পাগল এ সংসারে কেই বা না। তোমাকেও তো লোকে পাগল বলে। গানপাগল, সুর-পাগল।'

কয়েক মিনিটের মধ্যেই রাস্তার ধারের বসবার ঘরখানা একেবারে সরগরম

হয়ে উঠেছে। ফুলদা গিয়েছে, মা গিয়েছে, দোতলা থেকে খবরের কাগজ হাতে বাবাও নেমে এসেছেন। সাহেব এসেছে খবর পেয়ে বাজারের থলি হাতে কয়েকটি কৌতূহলী ছেলে এসে জানালার কাছে দাঁড়িয়েছে।

শীলা আর ভিতরে ঢুকল না। আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের কথাবার্তা শুনতে লাগিল। আর দেখতে লাগল। দেখবার মতই রূপ। কী সুন্দর। কী অদ্ভুত সুন্দর। ফর্সা আর লম্বা। লালচে চুল, সিঁদুরে ঠোঁট আর নীল রঙের চোখ। শীলা এ পর্যন্ত যত পুরুষ দেখেছে, জামাই বাবুদের আর দাদার যত বন্ধুদের দেখেছে তাদের কারো সঙ্গেই এর মিল নেই। কী করে থাকবে। উনি তো এ দেশের মানুষ নন। অনেক দূরের ইউরোপের মধ্যে সেই জার্মানী। কোথায় যেন দেশটা। ইউরোপের পুরো ম্যাপটা শীলার ঠিক মনে পড়ল না। উত্তর পশ্চিমে নীল সমুদ্রের মধ্যে লাল রঙের গ্রেট ব্রিটেন আর তার কোলে ছোট আয়র্ল্যাণ্ড দ্বীপটিকে দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু মূল ভূভাগে ফ্রান্স জার্মানীর অবস্থানটা কেমন যেন ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। থার্ড ক্লাসে ইউরোপ তাদের পাঠ্য ছিল বটে কিন্তু শীলা ভালো করে পড়েনি আর ভূগোল তার মোটেই ভালো লাগত না। ভূগোলের দিদিমণির চোখাচোখা পরিহাস তার মনে জ্বালা ধরিয়ে দিত। কিন্তু কী হবে ইউরোপের ম্যাপ দিয়ে। সবুজ জার্মানী একেবারে তাদের বৈঠকখানার ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। টিয়াপাখির মত দুটি লাল ঠোঁটে মিষ্টি মিষ্টি হাসছে। এত কাছে দাঁড়িয়ে রক্তমাংসের কোন সাহেবকে শীলা চোখে দেখেনি। ফুলদার সঙ্গে সিনেমায় দু একখানা বিলিতী বইতে সাহেবদের ছুটোছুটি লাফালাফি দেখেছে কিন্তু জীবন্ত সাহেব এই প্রথম। তাও যে সে সাহেব না, রূপকথার রাজপুত্রের মত পরম সুন্দর সাহেব।

সরোজিনী ঘর থেকে বেরিয়ে এসে হেসে বললেন, 'আয়। আর ওখানে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না। আমার সঙ্গে সঙ্গে চা আর খাবার টাবার করবি আয়। অনিন্দ্য নাকি এক্ষুনি চলে যাবে।'

শীলা চমকে উঠে বলল, 'এক্ষুনি চলে যাবেন? ওঁকেও সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন নাকি?'

সরোজিনী হেসে বললেন, 'নারে, তা নিতে পারবে না। নীলু ওকে কেড়ে রেখেছে। এ বেলা আমাদের এখানে খাবে। আমার নীলুর তো ও গুণ খুব আছে। অল্প সময়ের মধ্যে অচেনা মানুষের সঙ্গে খুব ভাব করে নিতে পারে। যেন ওর সঙ্গে কত কালের বন্ধুত্ব।'

বাড়ির কর্তা আর চাকরকে বাজারে পাঠিয়ে সরোজিনী মেয়েকে নিয়ে রান্নাঘরের সামনে লুচি বেলতে বসলেন। বাইরের ঘর থেকে কথাবার্তা আর হাসির শব্দ মাঝে মাঝে ভেসে আসছে। সরোজিনী মেয়ের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললেন, 'তোর মন বুঝি ও-ঘরেই পড়ে রয়েছে। আচ্ছা তুই যা। আমি একাই সব করে নিতে পারব।'

শীলা সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে উঠল, 'হুঁ, ও-ঘরে পড়ে রয়েছে তোমাকে বলেছে। আমাকে ছাড়া তোমার কোন কাজটা হয় শুনি ?'

সরোজিনী বললেন, 'তা ঠিক। আজকাল তোর হাতের চা ছাড়া বাবুদের অন্য চা পছন্দ হয় না। তুই পান সেজে না দিলে—'

কথা শেষ না হতেই বাইরের ঘর থেকে অনিন্দ্য নতুন জুতোর মচ মচ শব্দে সামনে এসে দাঁড়াল।

'ম্যাকসকে তো ফুলদা এ বেলার জন্যে রেখে দিল। আমি তাহলে এখন যাই মা। হস্টেলে আমার অনেক কাজ পড়ে রয়েছে।'

সরোজিনী বললেন, 'তাই কি হয় বাবা। চাটা কিছু মুখে না দিয়েই কি যেতে হয়। শীলা, তোর জামাইবাবুকে—অনিন্দ্যদাকে—একটা মোড়া এনে দে তো, বসুক এখানে। আমরা আমাদের বড় ভগ্নিপতিকে জামাইবাবু বলে ডাকি। আরো আগে ছিল দাদাবাবু। এখন আবার সেই পুরোন চলন ফিরে এসেছে। কিন্তু যাই বলো জামাইবাবুর মত মিষ্টি ডাক আর হয় না।'

অনিন্দ্য শ্যালিকার এনে দেওয়া মোড়াটায় বসে হাসিমুখে চুপ করে রইল। কাল বদলাবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের কান বদলায়, ভাষা বদলায়, মাধুর্যের আধারেরও বদল হয়। এই দু বছরের মধ্যে সে এ বাড়ির প্রায় ছেলের মত হয়েছে। জামাতার সেই দূরত্ব আর নেই। সম্বোধনটা আর কি করে থাকবে।

সরোজিনী তাঁর মেয়ে ইলার কথা জিজ্ঞাসা করলেন। আদরের বউ হয়েছে শ্বশুর শাশুড়ীর। কৃষ্ণনগরে তাঁদের কাছেই আছে। এই প্রথম পোয়াতী। আর কয়েকমাস পরেই সরোজিনী তাকে নিজের কাছে নিয়ে আসবেন।

শীলা আর একটি বিশেষ প্রসঙ্গের জন্য উৎসুক হয়ে উঠছিল। এসব পুরোন ঘরোয়া আলোচনায় তার মন নেই।

একটু ফাঁক পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শীলা জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা অনিন্দ্যদা, আপনি ওঁকে কোথায় পেলেন ?'

'কাকে ?'

শীলা একটু হেসে বলল, 'আপনার ওই নতুন বন্ধুকে ?'

অনিন্দ্যও হাসল, 'ও ম্যাকসের কথা বলছ ? বন্ধুই বটে। দুদিনেই ও আমার পরম বন্ধু হয়েছে। জার্মান কনসালেট অফিসে আমার একজন জানাশোনা ভদ্রলোক আছেন। তিনিই ওকে আমাদের হস্টেলে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এ দেশের ছাত্রদের সঙ্গে মিশতে চায়, আলাপ পরিচয় করতে চায়। টুরিস্ট হয়ে এসেছে। ইণ্ডিয়া দেখবে। আপাতত বঙ্গ দর্শন। আমি ওকে বলেছি, দেশকে যদি দেখতে চাও বড় বড় হোটেলে থেকে তার পরিচয় পাবে না। কলেজ-হস্টেলে থেকেও নয়। চল তোমাকে আমি কলকাতা শহরের একটি আইডিয়াল ফ্যামিলিতে নিয়ে যাচ্ছি। সেখানে দিন কয়েক বাস করো। একটি পরিবারের ভিতর দিয়ে গোটা দেশের পুরো পরিচয় তুমি পেয়ে যাবে। যে-সে পরিবার নয়। যেমন বনেদী তেমনি—।'

সরোজিনী লুচি ভাজবার জন্যে রান্নাঘরের ভিতরে গিয়ে ঢুকেছিলেন।

শীলা অনিন্দ্যকে একা পেয়ে হেসে বলল, 'আহা, আমাদের সামনে শ্বশুরবাড়ির খুব সুখ্যাতি করা হচ্ছে। আড়ালে গিয়েই তো নিন্দা করবেন। খোঁটা দেবেন ছোড়দিকে। আমরা সব জানি।'

অনিন্দ্যকে বেশিক্ষণ আটকে রাখা গেল না। ব্যস্ত প্রফেসর। দুটো সিফটে পড়ায়। তারপর আবার হস্টেলের ছেলেদের খবরদারি করে। শ্বশুরবাড়িতে বেশিক্ষণ বাস করবার তার সময় কই। ষোড়শী শ্যালিকার অনুরোধও তাকে ঠেলতে হয়। কাজের এমনি চাপ।

জামাইবাবুদের মধ্যে অনিন্দ্যকেই সবচেয়ে পছন্দ শীলার। ভারি আমুদে আর শৌখীন মানুষ। সেবার কোত্থেকে একটা হরিণ নিয়ে এসে উপস্থিত। আর একবার নিয়ে এসেছিলেন বিচিত্র বর্ণের একজোড়া চীনা মোরগ। তার একটা মোরগ আর একটা মুরগী। কিন্তু এবার যা এনেছেন তার তুলনা হয় না। তাঁর এই সাদা রঙের নীল চোখো প্রাণীটি সবচেয়ে সেরা। আচ্ছা, ম্যাকস কথাটার মানে কী ? কে জানে কী মানে। শীলা লক্ষ্য করে দেখেছে অনেক নামের মানেই অভিধানে মেলে না। সে মানুষের নামই হোক আর জায়গার নামই হোক। নামের মানে তুমি যা ভাববে তাই। নামের মানে তুমি যা মনে করবে তাই। ম্যাকস কথাটার কোন মানে আছে কিনা শীলা জানে না। কিন্তু ওকে দেখবার পর থেকেই ফুলদার সেই সাদা ময়ূরের গল্পের কথা মনে পড়ছে শীলার। ফুলদার ছেলেবেলার এক মেয়ে-বন্ধু নাকি ময়ূরভঞ্জের মহারাজার

কাছ থেকে চমৎকার এক সাদা ধবধবে ময়ূর উপহার পেয়েছিল। কী বা তার পাখা আর কী বা তার পেখম। আকাশে কালো মেঘ দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গে সে তার পেখম ছড়িয়ে দিত। তাকে নিয়ে দাদার সেই সখীর সোহাগের অন্ত ছিল না। সাদা ময়ূর শীলা চোখে দেখেনি। কিন্তু পর পর দুদিন স্বপ্নে দেখেছে। আর আশ্চর্য, সেই সুখস্বপ্নের পর এক অপরূপ দিবা-স্বপ্নের মত ম্যাকস এসে উপস্থিত। ময়ূর কি সুখের বাহন ?

অন্তত ফুলদার ভাবভঙ্গি দেখে তাই মনে হচ্ছে। সকালে অন্তত তিন চার ঘণ্টা ঝাড়া রেওয়াজ করে ফুলদা। কিন্তু আজ কোথায় গেল তার রেওয়াজ, কোথায় গেল কী। বসবার ঘর থেকে ম্যাকসকে একেবারে বাড়ির ভিতরে নিয়ে এসেছে ফুলদা। ঘুরে ঘুরে দেখিয়েছে ফুলের টব। যে টবগুলিতে শীলা রোজ জল দেয়, গাছের শুকনো পাতা বেছে ফেলে। বড় বড় গাঁদা ফুল দেখে ম্যাকসের কী আনন্দ। গাঁদা ফুল তো আর ওদের দেশে নেই। ঘুরে ঘুরে দেখিয়েছে এঘর ওঘর একতলা দোতলা। ছাদ। দেখিয়েছে ঠাকুরদার আমলের পুরোন লাইব্রেরী। টুং টুং করে সেতারের একটু বাজনাও শুনিয়ে দিয়েছে এক ফাঁকে। ম্যাকস দেখছে শুনছে আর হাসছে শীলা যখন নানান কাজ এঘর থেকে ওঘরে যাচ্ছে, সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে উঠছে নামছে—দুটি নীল চোখ মেলে ম্যাকস তাকাচ্ছে তার দিকে। কিন্তু শীলাকে অত লুকিয়ে লুকিয়ে দেখবার কীই বা আছে। সে তো আর দিদিদের মত অত সুন্দরী নয়। সে তো মেঘের মতই কালো। তার দিদিরা যদি এখানে কেউ থাকত ও হয়তো তার দিকে ফিরেই তাকাত না। কিন্তু এখনই বা কী দেখছে এত। ও কি সারা বাড়িটাকেই আকাশ ভেবেছে নাকি। আর সেই আকাশভরা মেঘ দেখছে ? মেঘ দেখলে কি ময়ূর খুশি হয় ? ফুলদা তো তাই বলে।

বেলা প্রায় এগারটার সময় নীলাদ্রির সময় হল। সে রান্নাঘরের সামনে এসে বলল, 'শীলা, আমাদের আরো দু কাপ চা দে।'

সরোজিনী মাছের কালিয়া রাঁধছিলেন।

শুনতে পেয়ে ছেলেকে ধমকে উঠলেন, 'না, এত বেলায় আর চা নয় বাপু। আমার রান্না হয়ে গেছে। এবার তোমরা চানটান করে খেয়ে নাও।'

নীলাদ্রি বলল, 'তাই নেব। আজ যখন বাজনা টাজনা কিছু হলই না।'

শীলা সুযোগ পেয়ে বলল, 'কী করে হবে ফুলদা। আজ তো তুমি সেই সকাল থেকে নাচছ। বাজাবে আর কখন।'

নীলাদ্রি এগিয়ে এসে বোনের বিছুনী টেনে ধরল, 'কী, কী বললি। কে যে নাচছে তা আমিও দেখতে পাচ্ছি।'

শীলা দাদার হাত থেকে চুল ছাড়িয়ে নিয়ে সরে দাঁড়াল।

সরোজিনী বললেন, 'কী এত গল্প করছিসরে ওর সঙ্গে। কোন ভাষায় কথা বলছিলি তোরা?'

নীলাদ্রি হেসে বলল, 'ভাষা নয় মা, ভঙ্গি। বেশির ভাগ ভঙ্গি দিয়েই কাজ সারতে হচ্ছে। যৎসামান্য ইংরাজী জানে। যেটুকুও জানে উচ্চারণ অপূর্ব। অবশ্য আমার উচ্চারণও ওর কানে অভূতপূর্ব শোনাচ্ছে। কাজ চালিয়ে নিচ্ছি। তবু ওর কত কথাই না শুনে নিলাম। জানো কী সাহস। ইংরেজী জানে না, হিন্দী জানে না, উর্দু জানে না, এদিকে সঙ্গী নেই, সাথী নেই টাকার জোরও তেমন নেই; শুধু মনের জোরে ফার ইস্ট টুর করে এসেছে এই ইণ্ডিয়ায়। ওর ইচ্ছে পৃথিবীর কোন জায়গা বাকি রাখবে না।'

সরোজিনী উনুনের ওপর থেকে কড়াটা নামাতে নামাতে বললেন, 'ভালোই তো। হয়তো তুমিও একদিন যাবে।'

নীলাদ্রি একটু হাসল, 'আমি? ওকে দেখে অবশ্য আমার সেই ঘুমন্ত সাধ জেগে উঠেছে। পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ। কিন্তু চাইলেই কি পারা যায়?'

শীলা বলল, 'এবার তোমরা নাইতে যাও ফুলদা। আমি বাথরুমে ঢুকলে শেষে যে মিনিটে মিনিটে তাড়া লাগাবে তা চলবে না।'

স্নান তো করবে, কিন্তু সমস্যা হল ম্যাকস পরবে কী। ওর ব্যাগ আর বিছানা সবই তো সেই হস্টেলে ফেলে এসেছে। নীলাদ্রি বলল, 'তাতে কী হয়েছে। ও আমার লুঙ্গি পরে চান করুক। নেয়ে উঠে আর ট্রাউজার্স নয়, আমার একখানা ধুতিই পরবে। শীলা আমার সেই নকশী চুলপেড়ে ধুতিখানা বের করে রাখতো। আর একটা ফর্সা পাঞ্জাবি—।'

শীলা হেসে বললে, 'দাদা তোমার পাঞ্জাবি কিন্তু ওঁর গায়ে ছোট হবে।'

নীলাদ্রি বলল, 'তা হোক। খানিকটা তো ঢাকবে। ধুতি পাঞ্জাবিতে সাহেব বেশ আরাম পাবে। এখানে এসে ওর খুব গরম লাগছে মনে হচ্ছে।'

ফাল্গুনের মাঝামাঝিতেই এবার বেশ গরম পড়ে গেছে। বাড়ির দু দুটো ফ্যান অচল। ইলেকট্রিক মিস্ত্রীকে খবর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তার আর দেখা নেই।

শুধু সেতারে নয়, ফুলদার হাত সব ব্যাপারেই খোলে। সত্যিই ম্যাকসকে একেবারে বাঙালীবাবু সাজিয়ে নিয়ে এসেছে। নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে ওকে ধুতি পরা শিখিয়েছে, পাঞ্জাবির বোতামগুলি নিজের হাতে এঁটে দিয়েছে। মেয়েদেরই পুতুল খেলার শখ থাকে। কিন্তু ফুলদাকেও যেন হঠাৎ পুতুল খেলার শখে পেয়ে বসেছে। যে মানুষের স্বভাব অত গুরুগম্ভীর, যে মানুষ রাতদিন সেতার নিয়ে পড়ে থাকে, তার মধ্যেও যে এমন একটি ছেলেমানুষ লুকিয়ে আছে তা কে জানত।

বড় ঘরের মেঝেয় আসন পেতে নীলাদ্রি ম্যাকসকে পাশে নিয়ে খেতে বসল।

সরোজিনী বললেন, 'টেবিল চেয়ারের ব্যবস্থা করে দে। ওকি ওভাবে খেতে পারবে? ওর কষ্ট হবে। খাওয়াও হবে না।'

কিন্তু নীলাদ্রি নাছোড়বান্দা। সে বলল, 'খুব পারবে মা। কতক্ষণ বা আছে। এলই যখন, বাঙালী জীবনের সব স্বাদ ওকে পাইয়ে দি। আমাদের কথা ওর চিরদিন মনে থাকবে।'

দেখা গেল ম্যাকসেরও তাতে আপত্তি নেই। এরই মধ্যে সে একেবারে নীলাদ্রির মন্ত্রশিষ্য হয়ে গেছে। সে যা করছে ম্যাকস তারই অনুসরণ করছে। চলাফেরা ওঠাবসা সব লক্ষ্য করে করে দেখছে আর প্রাণপণে তা নকল করবার চেষ্টা করছে।

শীলা ভেবেছিল, এত সব কাণ্ডকারখানা দেখে সে বুঝি হাসতে হাসতে মরেই যাবে। কিন্তু সামলানো যায় না এমন বেয়াড়া হাসি এই মুহূর্তে তাকে জব্দ করতে পারল না। পরিবেশিকার কাজ সে বেশ গম্ভীরভাবেই করে যেতে লাগল। ভাত ডাল মাছ তরকারি সবই সাহেবের জন্য বসে বসে রেঁধেছেন মা। সেই সঙ্গে রুটি মাংসও করে রেখেছেন। কী জানি যদি ওসব কিছু না খেতে পারে। খেতে পারুক আর না পারুক সাহেবের উৎসাহের অভাব নেই। চামচে তুলে তুলে সব একটু একটু চেখে চেখে দেখছে। ভালো না লাগলে মুখ বিকৃত করছে।

বাবা এই সঙ্গে খেতে বসেননি। অফিস থেকে রিটায়ার করলে কি হবে, সেই দশটা পাঁচটার অভ্যাসটি ঠিক আছে। ঠিক আগের সময়ের হিসাবে নেয়ে খেয়ে এখন আর ছুটতে ছুটতে গিয়ে বাস ধরেন না, কাগজ কি বই-টই কিছু একখানা নিয়ে ইজিচেয়ারে শুয়ে পড়েন। তারপর দু চারপাতা ওলটাতে না ওলটাতেই তাঁর নাক ডাকার শব্দ শোনা যায়। শীলার মনে আছে, খুব

ছেলেবেলায় মাঝরাত্রে কি শেষরাত্রে ঘুম ভেঙে গেলে বাবার এই নাকের শব্দ কানে গেলে কী ভয়ই না সে পেত। মার কাছে সরে এসে তাঁকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরত।

খেতে খেতে নীলাদ্রি জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা মা, ধুতি-পাঞ্জাবিতে ম্যাকসকে কেমন মানিয়েছে বলো তো?'

· সরোজিনী একটু হেসে বললেন, 'বেশ মানিয়েছে।'

নীলাদ্রি গম্ভীরভাবে বলল, 'অনিন্দ্য দত্তের ছোট ভায়রা বলে মনে হচ্ছে না?

সরোজিনী হেসে বললেন, 'হতভাগা কোথাকার। তোর না আপন বোন? অনিন্দ্যের ভায়রা হলে তোর কী হয়?

নীলাদ্রি বলল, 'তার চেয়ে তোমার সম্পর্কটাই ভালো। একেবারে জার্মান জামাতা। চমৎকার অনুপ্রাস।'

বলতে বলতে নীলাদ্রি হো হো করে হেসে উঠল।

ম্যাকস নীলাদ্রির দিকে চেয়ে বলল, 'what's the fun?'

নীলাদ্রি বলল, 'Nothing nothing. In our national dress you are looking like a typical জামাইবাবু।'

জামাইবাবু কথাটার মানে বুঝতে না পেরেও ম্যাকস হাসতে লাগল। কিন্তু হাসির বদলে প্রচণ্ড রাগ হোলো শীলার। ছি ছি ছি একী অসভ্যতা। সে কী সেই ছোট্ট খুকু আছে? কিচ্ছু বোঝে না? ফুলদার সঙ্গে জন্মের মত আড়ি। জীবনেও শীলা আর তার সঙ্গে কথা বলবে না।

বিকালবেলায় পাড়ার ছেলেমেয়েরা জার্মান সাহেবকে দেখতে এল। এদের মধ্যে কেউ কেউ শীলার বন্ধুও আছে। রীণা, দীপ্তি, বরুণা। স্কুলে এক সঙ্গে পড়ত। রীণা আর দীপ্তি সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ে। একজন আর্টস নিয়েছে আর একজন সায়ান্স। আর বরুণা পেয়েছে দাম্পত্য জীবন। আর্টস আর সায়ান্সের মিকসড কোর্স।

দীপ্তি বলল, 'ওঁর সঙ্গে আমাদের আলাপ করিয়ে দেবেন না ফুলদা?'

নীলাদ্রি বলল, 'আমি কিছু জানিনে দীপ্তি। ম্যাকস বাওয়ার এখন ষোল আনা শীলার সম্পত্তি।'

শীলার আর সহ্য হোলো না। তীব্র স্বরে প্রতিবাদ করে উঠল, 'এসবের মানে

কী হচ্ছে ফুলদা? তুমি ওঁকে এক মিনিট কাছ ছাড়া করছ না আর বলছ আমার সম্পত্তি?'

নীলাদ্রি বলল, 'আহা আমি তো তোর সামান্য প্রাইভেট সেক্রেটারী মাত্র। কি তোর personnal circus এর ম্যানেজারও বলতে পারিস। জানো বরুণা, প্রোপ্রাইট্রেস শীলা রায়ের কাছে দু রকমের টিকিট আছে। শুধু দেখলে দু আনা আর কথা বলতে গেলে চার আনা।'

টিকিটের কথা শুনে তিন সখী খিল খিল করে হেসে উঠল।

রীণা বলল, 'আমরা কিছু কনসেসন পাব না ফুলদা?'

শীলা মনে মনে আর একবার প্রতিজ্ঞা করল, জীবনে ফুলদার আর মুখদর্শন করবে না।

দীপ্তিরা ম্যাকসকে আড়াল থেকে দেখে টেঁথে বিদায় নিল। কিন্তু নতুন বন্ধুকে নীলাদ্রি অত সহজে ছেড়ে দিল না।

সে বলল, 'অনিন্দ্যের হস্টেল থেকে তোমার বাকস বিছানা এক্ষুনি আনিয়ে নিচ্ছি। তুমি এখানেই আরো কটা দিন থেকে যাও। যদি চাও তো আমরা দুজনে তোমার গাইডের কাজ করে দিতে পারি। পয়সা লাগবে না।'

ম্যাকস আপত্তি তো করলই না, বরং খুশি হয়েই নীলাদ্রির আতিথ্য নিল। ফুলদার পাশের ঘরে ওর বিছানা পেতে দিল শীলা। জিনিসপত্র গুছিয়ে ঠিক করে রাখল। সুগন্ধি ধূপকাঠি জ্বেলে দিল। শুকনো শূন্য ফুলদানিটা জলে আর ফুলে ভরে উঠল।

নিজের বিছানা দোতলায় তুলে নিয়ে গেল শীলা। বাবা-মার পাশের ঘরে সে থাকবে। বড়দা ছোড়দা সপরিবারে একজন দিল্লীতে আর একজন চণ্ডীগড়ে। বাড়িতে এখন আর ঘরের অভাব নেই। কিন্তু একতলার ঘরগুলি খালিও বড় একটা থাকে না। ফুলদার গানবাজনার গুণী বন্ধুদের কেউ না কেউ এসে হাজির হয়, ফুলদা সহজে কাউকে ছাড়তে চায় না।

ম্যাকস যদিও গান বাজনা জানে না, কিন্তু দূর দেশের মানুষ তো। আর কত দূর দেশের খবর সে নিয়ে এসেছে। তাই বোধ হয় ফুলদার কাছে ওর এত আদর। গান বাজনা নিয়ে বেশি সময় কাটালেও ফুলদা যে শুধু গান বাজনাই ভালবাসে তা নয়। সে মানুষজন ভালোবাসে, ঘরদোর সাজাতে গুছাতে ভালোবাসে, পাড়ার বউদিদের, বন্ধুর বউদের শাড়ির রঙ আর পাড় পছন্দ করে দিতে ভালবাসে। সেই সঙ্গে ম্যাকসকে ভালোবেসেছে দেখে শীলা খুব খুশি হল।

তাদের এই বাড়ি তাদের এই পাড়া ম্যাক্সের নিশ্চয়ই খুব ভালো লেগে গেছে। যে মানুষের সকালে এসে বিকালে চলে যাবার কথা সেই মানুষ পরদিন গেল না, তার পরদিনও গেল না, তার পরদিনও নয়। নীলাদ্রি হেসে বলল, 'ও এখানে থেকে যাবে। যা আদর যত্ন পাচ্ছে ওর বিশ্বপরিক্রমা এখানেই শেষ।' শীলার দিকে চেয়ে চেয়ে নীলাদ্রি হাসতে লাগল।

শীলা রাগ করে বলল, 'ফুলদা, ভালো হবে না কিন্তু। ফের যদি অমন কর তা হলে তোমার সঙ্গে জন্মের মত আড়ি হয়ে যাবে।'

আর কোন ভাইবোন তো এখন আর বাড়িতে থাকে না। ফুলদাই একমাত্র। সে একই সঙ্গে দাদা আর দিদি, সখা আর সখী।

সপ্তাহে দু তিনদিন বাইরে টিউশনি করে ফুলদা। সেতারের টিউশনি। দু চারজন ছাত্রছাত্রী বাড়িতে এসেও শেখে। বাকী সময়টা ফুলদা বাজায়। এখন তার আরো কাজ বেড়েছে। কাজ নয় খেলা। ম্যাকসের সঙ্গে বসে বসে গল্প করে। কোনদিন ক্যারম খেলে। কখনো বা খেলাচ্ছলে তাকে বাজনা শোনায়।

ম্যাকস কি ফুলদার বাজনা বোঝে? এইসব বিদেশী সুর তার ভালো লাগে? ম্যাকসের মুখের হাসি চোখের উল্লাস দেখে মনে হয় সত্যিই ও খুব উপভোগ করছে।

মাঝে মঝে আবার রাগরাগিণীর নামও জিজ্ঞাসা করে ম্যাকস। 'What is this tune!'

ফুলদা জবাব দেয়, 'দেশ।'

ম্যাকস তার বিদেশী জিহ্বা দিয়ে চেখে চেখে উচ্চারণ করে 'ডেস।'

'What is this one?'

সেতারের আলাপ শুনে ম্যাকস আর একটি রাগের নাম জিজ্ঞাসা করে।

ফুলদা বলে, 'খাম্বাজ।'

ম্যাকস অদ্ভুতভাবে কথাটা উচ্চারণ করে নিজেই হেসে ওঠে।

শীলা একদিন জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা ফুলদা, ওঁকে যে অমন করে রাগ-রাগিনীর নাম মুখস্থ করাচ্ছ, উনি কি তোমার বাজনা কিছু বুঝতে পারেন?'

নীলাদ্রি জবাব দিল, 'একটু একটু পারে বইকি। তোর চেয়ে ভালোই পারে। ম্যাকস কত বড় বাজিয়ের দেশের লোক তা জানিস! কত বড় বড় কম্পোজার ওর দেশে জন্মেছেন। বিটোফেনের নাম শুনেছিস?'

নামটা যেন শোনা শোনা। শীলা ঘাড় কাত করে। আস্তে আস্তে বলে, 'উনি কি এখনো বাজান নাকি ফুলদা!'

নীলাদ্রি হেসে ওঠে, 'গ্যেটের সমসাময়িক ছিলেন তিনি, এখন আর নেই। কিন্তু তাঁর অমর সিম্ফনিগুলি রয়ে গেছে। আচ্ছা তোকে রেকর্ড শোনাব। মোৎসার্ট ভাগনার শুবার্ট শুম্যান সুরে সুরে সারা ইউরোপকে ছেয়ে দিয়েছেন।'

তাঁদের সেই সুর যেন এই মুহূর্তেও ফুলদা শুনতে পাচ্ছে। তার কথায় সুরেলা আবেশ, মুখ চোখের ভঙ্গির মুগ্ধতা দেখে শীলার সেই রকমই মনে হোলো। তারপর ওইসব সুরকারের কথা নিয়ে ম্যাকসের সঙ্গে ফুলদা আলোচনা আরম্ভ করল। শীলা আস্তে আস্তে সেখান থেকে সরে এল। তার তো অত বিদ্যা নেই যে সব বুঝতে পারবে। ইংরেজী ম্যাকস যে তার চেয়ে বেশি ভালো জানে তা নয়। অমন দু চারটে কথা ভাঙা ভাঙা শব্দ শীলাও বলতে পারে। কিন্তু বলতে এত লজ্জা করে। একটা কথাও মুখ থেকে বেরোয় না। কী জানি যদি উনি হাসেন। ফুলদা ওঁর সঙ্গে এত কথা বলে, কিন্তু ওঁকে বাংলা শিখতে বলে না কেন। বাংলা শেখায় না কেন। উনি যদি বাংলা জানতেন কী চমৎকারই না হোতো। শীলা ওঁর সঙ্গে কথা বলতে পারত, গল্প বলতে পারত।

এর মধ্যে অনিন্দ্য এল আর একদিন খোঁজ নিতে। শীলাকে ডেকে বলল, 'কী ব্যাপার শীলাবতী। তুমি নাকি ম্যাকস সাহেবকে একেবারে বন্দী করে রেখেছ। একজোড়া নীল নেত্রকে কিছুতেই কালো চোখের আড়াল করতে চাইছ না। নীলাদ্রি ফোনে বলছিল।'

শীলা রাগ করে বলল, 'কী বাজে বাজে কথা বলছেন অনিন্দ্যদা। ফুলদাই তো ওকে নিয়ে রাতদিন মশগুল হয়ে আছে। রোজ বেড়াতে বেরোচ্ছে। আজ জু কাল মিউজিয়াম, পরশু আর্ট একজিবিশন আমাকে কি সঙ্গে নেয়?'

অনিন্দ্য চুকচুক শব্দ করে বলল, 'ভারি আফশোষের কথা। সত্যিই ভারি অন্যায়। তোমাকে অবশ্যই সঙ্গে নেওয়া উচিত। আর এই জার্মান টুরিস্টটিই বা কী। মনে কি কোন রস কস নেই? আমি হলে তোমাকে ছাড়া বেড়াতে বেরোতামই না। ওই রাঙাবরণ শিমূল ফুলকে বাদ দিয়ে কৃষ্ণকলির হাতে হাত রেখে বিশ্ববিজয়ে বেরিয়ে পড়তাম।'

শীলা বলল, 'থাক থাক আপনার ওই মুখেই সব। বেরোবার কত সময় হয় আপনার।'

অনিন্দ্যদা মৃদু হেসে ফুলদার ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। ম্যাকসকে সামনে রেখে ওঁদের মধ্যে ইংরাজীতে তুমুল আলোচনা আরম্ভ হোলো। দর্শনে বিজ্ঞানে সাহিত্যে সঙ্গীতে জার্মানী পৃথিবীকে অনেক দিয়েছে। কাণ্ট হেগেলের দেশ জার্মানী, গ্যেটে-শিলারের দেশ জার্মানী, এঙ্গেলসের দেশ জার্মানী। আইন-স্টাইনের দেশ জার্মানী। ম্যাকস যেন নিজের দেশের প্রতিনিধি। তাকে লক্ষ্য করে দুজনের প্রীতি আর প্রশস্তি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। সব কথা শীলা বুঝতে পারল না। কোন কোন নাম সে এর আগে দু' একবার শুনেছে। কিন্তু শুধু নামমাত্রই। আর কিছু সে জানে না। শীলা দোরের কাছে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করল সে যেন বুঝতে পারছে না, ম্যাকসেরও তেমনি সব কথা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে। একখানা ছোট ডিকসনারী আছে ম্যাকসের পকেটে। ইংরাজী কথার জার্মান মানে আর জার্মান কথার ইংরাজী মানে তাতে আছে। ম্যাকস বার বার পকেট থেকে সেই ডিকসনারীখানা বার করছে। পাতা উল্টে উল্টে শব্দগুলি খুঁজে নিচ্ছে। তারপর তারিফ করার ধরনে বলছে, 'Oh, I see !' কখনো বা শব্দের অর্থে মজার সন্ধান পেয়ে হো হো করে হেসে উঠছে। কিন্তু সে হাসি অনেক বিলম্বিত; অনিন্দ্যদা আর ফুলদা তখন অন্য প্রসঙ্গে চলে গেছেন।

মুখে আঁচল চেপে শীলা সেখান থেকে সরে এল। কিন্তু আজ আর তেমন জোর হাসি তার পেল না। বেচারা ম্যাকসের ওপর তার সহানুভূতিই হোলো। সে সাতসমুদ্র তেরনদী পার হয়ে এসেছে, কিন্তু ভাষার দেয়াল টপকাতে পারছে না। শীলার মতই সে অসহায়। জানালার কাছে দাঁড়িয়ে শীলা ভাবতে লাগল। কিন্তু ইংরেজী ভাষা না জানলেও ম্যাকস অনেক কিছু জানে। কত দেশ দেশান্তর ঘুরে এসেছে। কত বিদ্যা শিখেছে। আর শীলা? সে তো কিছুই জানল না, শিখল না। থার্ডক্লাসে দু দুবার ফেল করে সে অভিমানে পড়া ছেড়ে দিয়ে বাড়িতে বসে রইল। ভেবেছিল প্রাইভেট পড়বে। পড়ে পড়ে পরীক্ষা দেবে। কিন্তু তাও আর হয়ে উঠল না। এদিকে তার সঙ্গে যারা পড়ত তারা কত এগিয়ে গেল। স্কুলের গণ্ডী পার হয়ে কলেজে গিয়ে পৌছল। কিন্তু শীলার আর এগোনও হোলো না, পৌছানোও হোলো না; সে কেবল পিছুতেই লাগল। দু চারদিন গান নিয়ে চেষ্টা করল, ছেড়ে দিল। বাজনাও তেমনি। ফুলদা বলল, 'তোর মন নেই।'

শীলা বলল, 'বেশ নেই তো নেই।'

সে সরে এল মায়ের কাছে, মায়ের পাশে। চা করে, পান সাজে, বিছানা পাতে, রান্নাবান্নার জোগান দেয়। বেশ ছিল। সব আফশোস আর আক্ষেপ সংসারের কাজের মধ্যে চাপা পড়ে ছিল। হঠাৎ সব কাজ দ্বিগুণ বেগে ফেটে বেরোল। শীলার মনে হতে লাগল, ছি ছি ছি এ কী করেছে সে। নিজের হাতে নিজের সব পথ বন্ধ করেছে। কিছুই জানেনি, কিছু শেখেনি, কোন যোগ্যতা অর্জন করেনি।

হঠাৎ কেন যেন কান্না পেতে লাগল শীলার।

সরোজিনী এসে পিছনে দাঁড়ালেন, 'ওকি এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী করছিস। চুল বাঁধবিনে?'

শীলা পিছনে না তাকিয়ে বলল, 'বাঁধব। তুমি যাও মা।'

সরোজিনী বললেন, 'ওরা যে ডাকছে তোকে। আজ নাকি তোকে সঙ্গে নিয়ে প্রিন্সেপ্‌স ঘাটে যাবে। যা না। জাহাজ টাহাজ দেখে আসবি। তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নে তাহলে।'

শীলা মাথা নেড়ে বলল, 'না মা, আমি যাব না।'

অনিন্দ্যও এসে খানিকক্ষণ সাধাসাধি করল।

'ফ্রয়েলাইন রায়, হের বাওয়ার ডাকছে তোমাকে। তাকে নিরাশ কোরো না, চলো। ফ্রয়েলাইন মানে জানো? কুমারী। আর ফ্রাউ তার পরের অবস্থা। আমাদের এইটুকু জানলেই হল। এখন চল যাই।'

কিন্তু শীলাকে কিছুতেই কেউ নড়াতে পারল না।

সেই রাত্রে শীলা স্বপ্ন দেখল সত্যিই সে বেড়াতে বেরিয়েছে। প্রিন্সেপস ঘাট থেকে প্রকাণ্ড এক জার্মান জাহাজ সমুদ্রের দিকে যাত্রা করেছে। সে জাহাজে আর কেউ নেই। শীলা আর প্রকাণ্ড এক ময়ূর। সাদা ধবধবে তার গায়ের রঙ। কী সুন্দর আর কী সুন্দর। কিন্তু অত মানুষ-প্রমাণ ময়ূর কখনো হয়! শীলা আরো কাছে এগিয়ে গিয়ে দেখল—ওমা, এতো ময়ূর নয়, এ যে—। না না না, আমি বাড়ি যাব আমি বাড়ি যাব। ছি-ছি-ছি, সবাই কী ভাববে। কিন্তু যে যাই ভাবুক জাহাজ আর ফিরল না। ভাসতে ভাসতে একেবারে মাঝ সমুদ্রে গিয়ে পড়ল। সেখান থেকে আরও দূরে আরও দূরে। আর কী নীল সেই সমুদ্রের জল। এই নীলের আভাস দুটি চোখ আগেই নিয়ে এসেছিল। তারপর সেই নীল

সমুদ্র হঠাৎ ফেনিল হয়ে উঠল। ‘আকাশে ঝড়ের আভাস। উত্তরে চাই দক্ষিণে চাই ফেনায় ফেনা আর কিছু নাই।’ তাদের জাহাজ সেই উত্তাল সমুদ্রের বুকে টলতে লাগল দুলতে লাগল। শীলা তো ভয়েই অস্থির। সবশুদ্ধ ডুবে মরবে নাকি। কিন্তু নীল দুটি চোখ তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাসছে। চোখে ভয়ের লেশমাত্র নেই। কেন থাকবে। তার তো ঝড়ের সমুদ্রের ওপর দিয়ে জাহাজে করে যাতায়াতের অভ্যাসই আছে। সে কাছে এগিয়ে এসে শীলার হাত ধরল। তারপর পরিষ্কার বাংলায় বলল, ‘অত ভয় পাচ্ছ কেন, আমি তো আছি।’ ছি ছি ছি, কী লজ্জা, কী লজ্জা। যদিও দেখবার মত কেউ নেই তবু দুজনকে তো দুজনে দেখতে পাচ্ছে।

মায়ের ডাকাডাকিতে শীলার ঘুম ভেঙে গেল। সরোজিনী বললেন, ‘সেই সন্ধ্যা থেকে কী ঘুমই না ঘুমোচ্ছিস।’

শীলা বলল, ‘লম্বা একটা সিনেমার গল্প স্বপ্নে দেখছিলাম মা।’

সিনেমার গল্পই তো। ফুলদার সঙ্গে মাস কয়েক আগে যে ইংরেজী ছবিটা দেখতে গিয়েছিল শীলা, তাতেও এই রকম জাহাজ ছিল, সমুদ্র ছিল, ঝড় ছিল। সেই ঝড়ের ঝাপটায় নায়িকা নায়কের—। ছি-ছি-ছি।

সারা সকালের মধ্যে ম্যাকসের মুখের দিকে তাকাতে পারল না শীলা। অন্য দিনের মত সে ওকে চা দিল, খাবার দিল, কিন্তু চোখে চোখে তাকাতে পারল না। ম্যাকস কিন্তু আগের মতই তার দিকে তাকাচ্ছে হাসছে একথা সেকথা বলছে ও। কী সুবিধে। একজনের স্বপ্ন আর একজন দেখতে পারে না, একজনের স্বপ্নের কথা আর একজন ভাবতেও পারে না।

শীলা কিন্তু বেশিক্ষণ ম্যাকসকে এড়িয়ে থাকতে পারল না। ফুলদাই সব মাটি করে দিল। শীলাকে ডেকে বলল, ‘আজ কিন্তু ম্যাকসের সঙ্গে তোর খেলতে হবে।’

শীলা বলল, ‘আমি পারব না ফুলদা। কেন, তুমি কী করবে।’

নীলাদ্রি বলল, ‘আমার পরশু রেডিও প্রোগাম। দুদিন আমাকে দারুণ রেওয়াজ করতে হবে। কেন, ম্যাকসের সঙ্গে কথা বলতে তোর অত ভয় কিসের রে। ছড়বেছড় ইংরেজী বলবি। ইংরেজী ম্যাকসের কাছেও বিদেশী ভাষা, আমাদের কাছেও তাই। গ্রামার ট্রামারের অত ধার না ধারলেই হোলো।’

শীলা মৃদু হেসে বলল, ‘আমি পারব না ফুলদা। তোমরা পারো। গ্রামার

শুদ্ধ করেও বলতে পারো, আবার ভুল করেও বলতে পারো। আমার সবই আটকে যায়।'

নীলাদ্রি বলল, 'তাহলে বাংলাতেই বলবি। তোর কথা ও শুনতে খুব ভালবাসে।'

শীলা লজ্জিত হয়ে বলল, 'যাঃ।'

নীলাদ্রি বলল, 'সত্যি বলছি। তুই যখন কথা বলিস ও কান পেতে থাকে। অর্থ দিয়ে কী হবে। ধ্বনি ওর ভালো লাগে। সেদিন বলছিল, তোর গলার স্বর নাকি আমার এই ইনস্ট্রুমেন্টের মতই মিষ্টি। একেই বলে ভাগ্য। আমি বারো বছর ওস্তাদের বাড়িতে ধর্ণা দিয়ে, দুবেলা রেওয়াজ করেও যা করতে পারিনি আর তুই অশিক্ষিত পটুতায়—।'

শীলা তাকে বাধা দিয়ে প্রতিবাদ করে উঠল, 'কী যে বলো ফুলদা, শুধু আমার কথা কেন হবে। তোমার কথা, যার কথা সবাইর কথাই উনি অবাক হয়ে শোনেন। বিদেশী কিনা। বাংলা ভাষাটাই ও'র কানে মিষ্টি লাগে।'

নীলাদ্রি সঙ্গে সঙ্গে সেতারে একটু বাজিয়ে নিল, 'আমরি বাংলা ভাষা! মোদের গরব মোদের আশা।'

শীলা একটু হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার ফিরে এল।

নীলাদ্রি সেতার বাঁধতে শুরু করেছিল। চোখ না ফিরিয়েই বলল, 'কীরে।'

শীলা তার বাসন্তী রঙের শাড়ির আঁচল চাঁপার কলির রঙের না হোক সেই গড়নের আঙুলে জড়াতে জড়াতে বলল, 'ফুলদা একটা কথা বলব,' রাখবে ?'

'বল না। বেড়াতে যাবি ? সিনেমায় যাবি ?'

শীলা বলল, 'না। ওসব কিছু না। আমাকে ফের শেখাবে ফুলদা ?'

'কী শেখাব ?'

'তোমার ওই সেতার।'

নীলাদ্রি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসে, 'হঠাৎ যে এই সুমতি ? আচ্ছা আচ্ছা। শেখাব।'

শীলা এবার সামনে থেকে নীলাদ্রির পিছনে চলে আসে। তারপর দাদার পিঠে গাল ঠেকিয়ে বলে, 'আর একটা কথা। আমি আবার পড়ব। আমাকে কয়েকখানা বই কিনে দেবে ফুলদা ? তিন চারখানা কিনে দিলেই হবে।'

নীলাদ্রি আঙুলে মেরজাপটা পরতে পরতে বলে, 'আচ্ছা আচ্ছা। তুই

যদি সত্যিই ফের পড়তে শুরু করিস তাহলে তিন চারখানা বইতো ভালো, গোটা কলেজ স্ট্রীটটাই এখানে তুলে নিয়ে আসব।'

শীলা বেরিয়ে এলে নীলাদ্রি দোরে খিল দিয়ে বাজাতে শুরু করল।

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর নিঃসঙ্গ ম্যাকস এসে আজ নিজেই শীলাকে ডেকে নিল।

'Come, no harm, no shame. Play and be happy.'

ক্যারম বোর্ডের দিকে আঙুল দেখিয়ে মুখের ভঙ্গিতে প্রশ্ন বোধক চিহ্ন টানল ম্যাকস।

প্রথমে সরোজিনী খানিকক্ষণ বসে বসে দেখলেন। ম্যাকস তাঁকেও ইশারায় খেলতে ডাকল।

সরোজিনী হেসে বললেন, 'না বাপু, ওখেলা আমি জানিনে। তাসটাস হোলে না হয় দেখা যেত। তোমরা খেল, আমি একটু গড়িয়ে নিই।'

সরোজিনী চলে গেলেন।

ম্যাকস হাঁ করে সেই বাংলা কথাগুলি শুনল। হাসল। তারপর শেষ দুটি শব্দ নিজস্ব ভঙ্গিতে উচ্চারণ করল, 'গড়িয়ে নি।' শেষে হেসে বলল, 'Well Sheela, will you be my interpreter ?'

ইনটারপ্রেটার কথাটার অন্য কোন অর্থ আশঙ্কা করে শীলা বলে উঠল, 'No No No.'

ম্যাকস তার ভঙ্গি দেখে হাসতে হাসতে বলল, 'You have learnt only no no no. And I have learnt yes yes yes. Very good. Let us begin.'

খেলা চলতে থাকে। বোর্ডের ওপর টকাটক টকাটক গুটির শব্দ হয়। ওঘরে সেতারে 'দেশ' রাগের রেওয়াজ চলে। এঘরে শীলা বিদেশীর সঙ্গে ক্যারম খেলে। এও আর এক ধরনের বাজনা। সেতারের চেয়ে কম মধুর নয়।

খেলায় ম্যাকসেরই জিত হয় বেশি। আঘাতে আঘাতে গুটিগুলি ঠিক গিয়ে পকেটে পড়ে। শীলা খেলবে কি, মাঝে মাঝে অবাক হয়ে ম্যাকসের দিকে তাকিয়ে থাকে। এর চেয়ে বড় বিস্ময় বড় রহস্য যেন আর নেই। কোথায় কোন দেশের মানুষ। শীলা সে দেশের ভাষা জানে না, ইতিহাস জানে না, ভূগোল জানে না, কিছুই জানে না। সেই অচিন দেশের অপরূপ

এক মানুষের সঙ্গে শীলা নিজের ঘরে বসে ক্যারম খেলছে। দুদিন বাদে একথা কি কেউ বিশ্বাস করবে? এই মানুষটিরই বা সে কী জানে, কতটুকু জানে। ফুলদার কাছে শুনেছে, পশ্চিম জার্মানীর কোন্ এক শহরে থাকে। সে শহরের নাম ফুলদাই উচ্চারণ করতে পারে না আর তো শীলা। সেখানে বাবা আছে, মা আছে, ভাই আছে। না স্ত্রী নেই। এত অল্প বয়সে ওরা বিয়ে করে না। বাবার ছোটখাটো ব্যবসা আছে। ও নাকি একটা টেকনিক্যাল স্কুলে পড়ে। কিন্তু পড়াশুনোয় তেমন মন নেই। এদিক থেকে শীলার সঙ্গে ওর খুব মিল আছে। পৃথিবীটাকে ও নিজের চোখে দেখতে চায়। শীলার যদি সাধ্য থাকত সেও তাই চাইত। সেও অমনি করে ঘুরে বেড়াত। ম্যাকস সম্বন্ধে এর চেয়ে বেশি কিছু শীলা জানে না। কিন্তু এটুকু জানাও যেন বাহুল্য। এটুকু না জানলেও ম্যাকসকে যেমন আপন মনে হচ্ছে, তেমনি আপন মনে হত শীলার। বন্ধুত্বে কোন বাধা হত না। বন্ধু! কথাটা মনে মনে উচ্চারণ করতেও যেন লজ্জা হয়। সে কি ওর বন্ধু হবার যোগ্য! শীলা যে থার্ড ক্লাসের ওপরে আর উঠতে পারেনি। কোন গুণ-যোগ্যতাই যে আয়ত্ত করতে পারেনি সে। কিন্তু ম্যাকসের তাকাবার ভঙ্গি, শীলার সঙ্গে তার মেলামেশার ইচ্ছা দেখে তো মনে হয় না গুণ-যোগ্যতা নিয়ে তার কোন মাথা ব্যথা আছে। শীলাকে দেখেই ও খুশি, তার কথা শুনেই ওর আনন্দ। শুধু দেখবার মত হওয়া আর শোনবার মত কথা কওয়া। যে বলে 'তোমাকে এর চেয়ে বেশি কিছু আর হতে হবে না', তার চেয়ে বড় আপন আর কে আছে।

কিন্তু না। আর একজন না চাইলে কি হবে, শীলার কি যা আছে তাই থাকলেই চলে? তার কি আরো জানবার শোনবার শিখবার আরো যোগ্য হতে ইচ্ছা হয় না? যেমন ইচ্ছা করে সাজতে, ভালো শাড়ি পরতে, গয়না পরতে, সুন্দর করে চুল বাঁধতে, কাজল পরতে—তেমনি ইচ্ছা করে আরো যোগ্য হতে। যোগ্যতার মানে তো পড়াশুনো? সবাই তাই বলে। গুণ মানে তো গাইতে জানা বাজাতে জানা? যদি এমন কোন বর পাওয়া যেত, যাতে পৃথিবীর সমস্ত বই একরাত্রের মধ্যে মুখস্ত হয়ে যায়, এমন বর যদি পাওয়া যেত সমস্ত রাগরাগিণী তার গলায় এসে বাসা বাঁধে, আর ফুলদার মত তারও আঙুলের ছোঁয়ায় ছোঁয়ায় সেতারে তারগুলি ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে! যদি এমন হোতো!

শীলাকে খেলায় হারিয়ে দিয়ে ম্যাকস হো হো করে হেসে উঠল: **You know nothing, you know nothing.**

হঠাৎ কি যেন মনে হোলো ম্যাকসের। কী একটা কথা বলতে গিয়ে শব্দ সমুদ্রে যেন হাবুডুবু খেতে লাগল ম্যাকস। তারপর লাইফবেল্টের মত বেরোল সেই ডিকসনারী। হঠাৎ যেন লাফিয়ে উঠল ম্যাকস: 'Yes, Joke, just the word. Joke, only joking, don't be sorry. Are—Are you?'

দুঃখিত হবে কি শীলা ম্যাকসের সেই শব্দ হাতড়ানোর ভঙ্গি দেখে ওর হাসির সিন্ধু আবার উথলে উঠেছে।

মেঝের ওপর প্রায় লুটোপুটি খেতে লাগল শীলা। খিল খিল খিল। কুল কুল কুল। জলপ্রপাতের ধারা গড়িয়ে পড়ছে।

ম্যাকসও মৃদু মৃদু হাসতে লাগল। 'I see! No sing of sorrow. The world is full of happiness.'

বেরিয়ে এসে শীলা গুনগুন করতে লাগল জার্মানী জার্মানী। ম্যাকস ভারতের কথা অনেক জানে। কিন্তু শীলা কিচ্ছু জানে না। যদি জানত, তাহলে শীলা সেসব বিষয়ে নিয়ে ম্যাকসের সঙ্গে আলোচনা করতে পারত। এখন আর তার ভয় নেই। ওইরকম yes no very good করে সেও কথা চালিয়ে যেতে পারে।

একটা দেশকে চোখে দেখেও জানা যায়, আবার বই পড়েও জানা যায়। এই মুহূর্তে ম্যাকসের দেশকে তো আর চোখে দেখবার উপায় নেই শীলার। বইয়েরই শরণ নিতে হবে।

কোণের ঘরটায় ঠাকুরদার আমলের স্তুপাকার বই জমে আছে। শীলা চুপি চুপি এসে সেগুলি ঘাটতে লাগল। অনেক বইয়ের খানিকটা খানিকটা উই আর ইঁদুরের পেটে গেছে। আরো অনেকগুলি ধূলি-ধুসর। আইনের বই, রোমের ইতিহাস, যোগাবশিষ্ট রামায়ণ, দামোদর গ্রন্থাবলী সব জাতি বর্ণ মর্যাদার শ্রেণীভেদ ভুলে একসঙ্গে পাশাপাশি রয়েছে। কিন্তু শীলা যা চায়, তা কোথায়?

মা এসে ধমক দিলেন, 'এই অবেলায় তুই আবার ওগুলো ঘাটতে গেলি কেন? কী চাস বলতো।'

শীলা মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, 'কিছু না মা।'

'তাহলে চলে আয়, কিছুতে কামড়ে টামড়ে দেবে। সেদিন একটা বিছে দেখেছিলাম।'

ফিরে এসে শীলা অগত্যা সেই পুরান স্কুলপাঠ্য আদর্শ ভূপরিচয়খানাই খুঁজে খুঁজে বার করল। অনাবশ্যক বলে এসব বই তাকের ওপর তুলে রেখেছিল। ধূলি আর মাকড়সার জালের আড়ালে অনাদরে পড়েছিল বছরের পর বছর। শীলার কোমল হাতের স্পর্শে আজ সেই নীরস ভূগোল নতুন গৌরবে নতুন মূল্যে মূল্যবান হয়ে উঠল সিঞ্চিত হোলো কাব্যরসের ধারায়।

ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে পাতা উল্টে উল্টে ইউরোপের মানচিত্র বার করল শীলা। সতৃষ্ণ চোখে তাকাল একটি বিশেষ দেশের উপরে। তার উত্তরে নীল সমুদ্রেই কি সে স্বপ্নের জাহাজ ভেসেছিল।

সরোজিনী এসে ফের তাড়া দিলেন, 'গা-টা ধুবিনে? কী আবার পড়ছিস বসে বসে?'

'কিছু না মা।'

শীলা তাড়াতাড়ি ভূগোলখানাকে আঁচলের তলায় লুকিয়ে ফেলল। যেন পরম নিষিদ্ধ নভেল। সমস্ত জার্মানী দেশটাকে সে যেন এমনি করে বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখতে পারলে বাঁচে।

দিন দুই বাদে অনিন্দ্য এল খবর নিতে। 'কি, তোমাদের সেই জার্মান অতিথি কি পালিয়েছে না আছে?'

নীলাদ্রি বলল, 'পালাবে কে? পালালে জামিনদার তোমাকে গিয়ে ধরতাম না?'

অনিন্দ্য হাসতে লাগল।

একটু বাদে বলল, 'তুমিতো কলকাতা শহরের কিছুই আর বাকি রাখোনি, ওকে দেখিয়েছ। কিন্তু শহরটাই তো আর দেশ নয়। একটা গ্রাম ওকে দেখিয়ে নিয়ে এসো। এখনো দেশ বলতে গ্রামকেই বোঝায়।'

নীলাদ্রি বলল, 'কিন্তু গ্রাম নিয়ে কি আমরা আর সত্যিই গর্ব করতে পারি? সেই 'স্নেহ সুনীবিড় শান্তির নীড়ের' অস্তিত্ব কি আর আছে? স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা। এখন শুধুই স্মৃতি।'

চা টোস্ট পরিবেশনের পর শীলা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওঁদের আলোচনা শুনতে লাগল।

অনিন্দ্য চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলল, 'যাহোক, তুমিতো আর কণ্ডাকটেড টুরের ভার নাওনি যে, বেছে বেছে শুধু ভালো জিনিসই দেখাব। ওকে সবই

দেখতে দাও! তাহলেই এই দেশ সম্পর্কে একটা মোটামুটি ইমপ্রেশন নিয়ে যেতে পারবে।'

গ্রাম দেখবার প্রস্তাব শুনে ম্যাকস লাফিয়ে উঠল। সে নিশ্চয়ই যাবে। ইণ্ডিয়ায় এসে গ্রাম না দেখলে সে আর কী দেখল। এখানকার সভ্যতাইতো গ্রাম-সভ্যতা।

গ্রামের সঙ্গে তিন পুরুষের মধ্যে কোন যোগাযোগ নেই নীলাদ্রিদের। কিন্তু বাবার এক খুড়তুতো বোন আছেন বর্ধমান জেলার মদনপুরে। সেই পিসিমার সঙ্গে তো যোগাযোগ বন্ধ হয়নি।

গেলে সেখানেই যেতে হয়।

নীলাদ্রি অনিন্দ্যকে বলল, 'তুমি যখন হুজুগটা তুললে তুমিও চল।'

কিন্তু অনিন্দ্যের সময় নেই। তার অনেক কাজ। সে যেতে পারবে না।

যার কাজ নেই, যে যেতে পারে তাকে কেউ বলে না। শেষ পর্যন্ত শীলা নিজেই এসে নীলাদ্রির কাঁধে গাল ঘষল। যেন এক কৃষ্ণসার হরিণী দেবদারু গাছকে আদর করছে।

'আমাকে নিয়ে যাও না ফুলদা।'

নীলাদ্রি বলল, 'তুই যাবি? বড় কষ্ট হবে যে। পারবি সহ্য করতে?'

'তোমরা যা পারবে আমিও তাই পারব।'

উপেনবাবু দোতলা থেকে নেমে এসে বাধা দিলেন। 'না না, কোথায় যাবি! যতসব বাজে হুজুগ।'

তিনি বাড়ি ছেড়ে নিজেও বেরোবেন না, ছেলেমেয়েরা কেউ বেরোতে চাইলেও তার পথ আগলে ধরবেন। এই পাড়াটুকুর বাইরে পৃথিবীর সমস্ত জায়গা তাঁর কাছে অগম্য, বাসের অযোগ্য। সাপ বাঘ বিপদ আপদে ভরা।

কিন্তু সরোজিনী শীলার সহায় হলেন। স্বামীকে ধমক দিয়ে বললেন, 'অমন করছ কেন? একদিনের জন্যে যেতে চাইছে, যাক না। সেখানে ছেলেমেয়ে নিয়ে বিনয়বাবু আছেন, ঠাকুরঝি আছেন অত ভয় কিসের তোমার।'

অনুমতি পেয়ে শীলা উৎফুল্ল হয়ে উঠল। যেন বর্ধমানের এক গ্রামে যাচ্ছে না তারা, বিশ্ব পরিব্রাজকের সঙ্গে সেও পৃথিবী পরিক্রমায় বেরোচ্ছে।

ছোট্ট স্টেশন। লোকজনের ভিড় নেই। প্লাটফর্মের বাইরে এসে নীলাদ্রি দেখল মদনপুরে যাওয়ার বাস আছে, সাইকেল রিক্সা আছে। স্টেশন থেকে

পিসিমার বাড়ি মাইল তিনেক দূরে। এগিয়ে যাওয়ার জন্যে পিসতুতো ভাই সুরেশ্বরও এসেছে।

কিন্তু ঝাপটানো বটগাছটার নীচে একটা গরুর গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। একটু আগে সনের আঁটিগুলি নামিয়ে রেখে গাড়োয়ান বিড়ি টানছে।

ম্যাকস সেদিকে আঙুল বাড়িয়ে বলল—'What's that.'

নীলাদ্রি তাকে বুঝিয়ে বলল, 'এ আমাদের দেশীয় যান, আদি আর অকৃত্রিম।'

ম্যাকস এগিয়ে এসে সেই গাড়িতে উঠে বসল। যেতেই যদি হয় গাড়িতেই সে যাবে। বাসের ব্যবসা তাদের নিজেদেরই আছে। বাস সম্বন্ধে তার আর কোন কৌতূহল নেই। কিন্তু গরুরগাড়ি জীবনে সে এই প্রথম দেখল। তাতে না চড়ে সে ছাড়বে না।

দেরি হবার আশঙ্কা, কষ্টের ভয় দেখিয়েও নীলাদ্রি তাকে নামাতে পারল না। ম্যাকস বলতে লাগল, আর কেউ যদি নাও যায় সে একাই যাবে।

গাড়োয়ান সবিনয়ে বলল, 'কোন কষ্ট হবে না বাবু আসুন। ওপরে ছাপ্পড় আছে। নীচে আমি মোলায়েম বিছানা পেতে দেব, আপনাদের কোন কষ্ট হবে না।'

ম্যাকসকে তো আর একা ছেড়ে দেওয়া যায় না। বাধ্য হয়ে নীলাদ্রি আর শীলাও তার পাশে উঠে বসল।

কৌতূহলী চাষী কামলারা চারিদিকে এসে ভিড় করে দাঁড়াল। তারা যুদ্ধের সময় সাহেব যে দু একজন না দেখেছে তা নয়। কিন্তু গরুর গাড়ির ওপর সাহেবকে এই প্রথম দেখল।

সাহেবও তাদের দিকে উল্লাস আর ঔৎসুক্যভরা দুটি নীল চোখ মেলে রাখল।

ধুলোভরা কাঁচা রাস্তায় কঁ্যাচর কঁ্যাচর করে গরুর গাড়ি আস্তে আস্তে এগিয়ে চলল। রাস্তার দুপাশে দিগন্ত ছোঁয়া মাঠ। মাঠভরা রোদ। নীল আকাশের নীচে মাঝে মাঝে রক্তবর্ণ কৃষ্ণচূড়া।

নীলাদ্রি একবার হাতঘড়িতে চোখ বুলাল। তারপর হেসে বলল, 'ঈস, কী স্পীডেই যাচ্ছি আমরা। আমাদের দেশের অগ্রগতির সিম্বল।'

কিন্তু শীলা সে কথা ভাবছিল না। তার সেই স্বপ্নের জাহাজের কথা মনে পড়ছিল। সেই স্বপ্নের জাহাজ এই গরুর গাড়িতে এসে ঠেকেছে, সেই উত্তাল নীল সমুদ্র রূপ নিয়েছে এসে শূন্য শুকনো মাঠে। আশ্চর্য, তবু স্বপ্ন সফল। এমন পুরোপুরিভাবে কোন স্বপ্নই বোধ হয় আর ফলে না।

অনেকদিন আগে পাঠ্য বই থেকে মুখস্ত করা কবিতার একটি অংশ শীলা মৃদু কণ্ঠে আবৃত্তি করতে লাগল,

'নীলের কোলে শ্যামল সে প্রবাল
দিয়ে ঘেরা
শৈল চূড়ায় নীড় বেঁধেছে সাগর বিহঙ্গরা
নারিকেলের শাখে শাখে ঝোড়ো বাতাস
কেবল ডাকে'

ম্যাকস কান পেতে শুনছিল। হেসে বলল, 'very sweet, don't stop, go on'.

নীলাদ্রি হেসে বলল, 'এই দুপুর রোদে মাঠের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ তোর মনে সমুদ্রের দ্বীপ ভেসে উঠল যে।'

শীলা মুখ নীচু করে বলল, 'এমনিই।'

নীলাদ্রি ম্যাকসের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললে, 'This is from our Tagore's, তারপর লাইন কয়েকটির অনুবাদ করে শোনাল।'

ফেরার পথে শীলারা আর গরুর গাড়িতে ফিরল না। বাসে করেই স্টেশনে এল। কিন্তু যে গ্রামে মাত্র একদিন তারা থাকবে ভেবেছিল, সেখানে তিন দিন কাটিয়ে দিয়ে গেল। বাড়ি ঘর আর বিশ্ব ভ্রমনের কথা সব ভুলে গিয়েছিল ম্যাকস। তিন দিন সে গাঁয়ের ছেলেদের সঙ্গে হৈহৈ করে কাটিয়েছে। পুকুরে সাঁতার কেটেছে। পেয়ারা গাছে উঠে ডাল ভেঙে পড়তে পড়তে কোনক্রমে রক্ষা পেয়েছে। পুরোন শিবমন্দির দেখেছে। দশ মাইল দূরে পঁচিশ বছর আগের মসজিদ দেখতে ছুটেছে সাইকেলে করে।

মাঝখানে একদিন ছিল হোলি উৎসব। পিসিমার ছেলেমেয়েরা প্রথমে ভয়ে কাছে এগোয়নি। কিন্তু পরে একটু ইশারা পেয়ে সবাই এসে ম্যাকসকে রঙ দিয়েছে। আবীরে আবীরে প্রবাল গিরির আকার নিয়েছিল ধবল গিরি। পিসতুতো ভাইবোনদের সঙ্গে শীলাই ছিল দলনেত্রী। ঘোমটা একটু তুলে সাহেবের এই রঙ খেলা দেখে নিয়েছে গাঁয়ের বউরা। ছেলেরাও বিদেশী অতিথির অভ্যর্থনার জন্যে সব সম্পদ এনে জড়ো করেছে। একদিন দেখিয়েছে সাঁওতালদের নাচ, একদিন কীর্তন আর একদিন যাত্রাভিনয়। পালার নাম 'সুভদ্রাহরণ'। আসবার সময় ম্যাকস বলে এসেছে, এমন গ্রাম আর এমন

চমৎকার মানুষ সে আর দেখেনি। গ্রামবাসীরা বলেছে সাহেবের স্বভাবও যে এমন মধুর হয়, তা তাদের জানা ছিল না। ভাষার মিল নেই, চালচলনের মিল নেই, তবু ম্যাকসের মিশবার কোন বাধা ছিল না। তার তুলনায় ফুলদাকেই বরং ওদের কাছে দূরের মানুষ, কলকাতার ফুলবাবু মনে হচ্ছিল শীলার।

আসবার পথে বাসে আর ট্রেনে ওরা অনর্গল কথা বলতে বলতে এল। মাঝখানে ফুলদা। ডানদিকে ম্যাকস, বাঁদিকে শীলা।

নীলাদ্রি হেসে বলল, 'ম্যাকস্ কিছুরই নিন্দা করছে না। বলছে এদেশের সব ভালো।'

শীলা বলল, 'তাহলে একথা ওঁর নিশ্চয়ই মনের কথা নয়। সব দেশেরই সুখ্যাতি করবার জিনিসও থাকে, নিন্দা করবার জিনিসও থাকে। ওঁকে জিজ্ঞেস করোনা ফুলদা, সত্যিই আমাদের দেশের কোন কোন জিনিস ওঁর খারাপ লেগেছে।'

নীলাদ্রি হেসে বলল, 'তুই জিজ্ঞেস করনা। আচ্ছা, আমি তোর দোভাষীর কাজ করে দিচ্ছি। আমাকে টাকা দিতে হবে কিন্তু।'

শীলা বলল, 'বেশ দেব।'

নীলাদ্রি ম্যাকসের সঙ্গে খানিকক্ষণ ইংরেজীতে আলাপ করে শীলাকে তার বঙ্গানুবাদ শোনাল।

'আমি বললাম, হে বিদেশী, শীলাদেবী তোমাকে জিজ্ঞেস করছে এদেশের কোন দোষত্রুটিই কি তোমার চোখে পড়েনি? এদেশের মেয়েদের গায়ের কালো রঙ, কালো চোখ, কালো চুল নতুন বলে তুমি না হয় পছন্দ করতে পারো, কিন্তু এর কালো বাজার, আঁধারের মত কালো কুসংস্কার, দারিদ্র্য অশিক্ষা, স্তরে স্তরে অব্যবস্থা তুমিতো ভালো করে দেখনি। তবে শহরের নোংরা রাস্তা, বস্তীর নোংরা জীবন তো কিছু কিছু দেখেছ। গাঁয়ের খানা ডোবা এঁদো পুকুরের সঙ্গে দীনদরিদ্রের জীবনযাত্রাও কিছু কিছু দেখে গেলে। আমরা চাই তুমি মন খুলেই আমাদের সামনে চাঁদের উল্টোপিঠের সমালোচনা করে যাও।'

শীলা বলল, 'উনি কী জবাব দিলেন।'

নীলাদ্রি হেসে বলল, 'বেশি জবাব আর কী দেবে। ইংরেজীতে ভাষাটা ওকে বেকায়দায় ফেলেছে। ম্যাকস হিটলারের মত দেশের পর দেশ জয় করতে পারে, কিন্তু বিদেশিনী ভাষার পাণিগ্রহণ ওর পক্ষে সহজ নয়। তবু আমাদের বিদেশী বন্ধু মোটামুটি একটা জবাব দিয়েছে। ও বলতে চায়, দুদিনের জন্যে

এসে ওতো আর আমাদের দেশকে তেমন খুঁটে খুঁটে ক্রিটিকের চোখ নিয়ে দেখতে পারেনি। ও রিফর্মারও নয়, পলিটিসিয়ানও নয়। ও সাধারণ টুরিস্ট। ও আমাদের দেশকে দেখেছে পাখির চোখে। আর কিছুটা হয়তো আর্টিস্টের দৃষ্টি নিয়ে। জানিস শীলা, আমার মাঝে মাঝে মনে হয় আমাদের এই টুরিস্ট ম্যাকসও এক ধরনের আর্টিস্ট। সারা পৃথিবীটা ওর সেতার। আর দুটি মুগ্ধ চোখ ওর বাজাবার আঙুল।'

ম্যাকস আরো গল্প করতে করতে চলল। ওর নানা দেশ ভ্রমণের নানা অভিজ্ঞতার কাহিনী। পূর্ব জার্মানী ছাড়া আশেপাশে সব দেশ ও সাইকেলে ঘুরেছে। পায়ে হেঁটে বেড়িয়েছে। পূর্ব জার্মানী ওর এক গোপন দুঃখের স্মৃতির সঙ্গে জড়ানো। এদিক থেকে বাংলা দেশের সঙ্গে ওদের দুর্ভাগা দেশের মিল আছে। দুটি দেশই পুবে-পশ্চিমে দ্বিধা বিভক্ত। ম্যাকস ধনীর ছেলে নয়। আর্থিক অবস্থা মাঝারি ধরনের। তাই এদেশে সে প্লেনে চড়ে আসতে পারেনি। স্টীমারে আর ট্রেনে সব দেশের জল মাটি ছুঁয়ে ছুঁয়ে এসেছে। পথে বিপদ-আপদ কম হয়নি। কিন্তু ওসব ভয় করলে কি আর পথে বেরোন চলে? একবার ফার ইস্টের এক হোটেলওয়ালার মেয়ে তাকে বড় বিপদে ফেলেছিল।

ম্যাকসের মুখে আর এক দেশের মেয়ের নাম শুনে শীলার মনে ঈর্ষার সূঁচ বিঁধল।

'কি রকম বিপদে ফেলেছিল ফুলদা?'

নীলাদ্রি ম্যাকসের কাছ থেকে ঘটনাটা শুনে নিয়ে হেসে বলল, 'টাকা চুরি করেছিল।'

শীলা আশ্বস্ত হয়ে বলল, 'ছি ছি ছি, মেয়েরা আবার চোর হয়?'

নীলাদ্রি হেসে বলল, 'ম্যাকস বলছে হয় বইকি।'

ফুলদা বড় অসভ্য। শীলা জানালার দিকে মুখ করে বসে সবুজ গাছপালার মধ্যে চোখ ডুবিয়ে দিল।

বাড়িতে পা দিতে না দিতেই উপেনবাবু খুব একচোট ধমকে নিলেন। এ কি যাচ্ছেতাই কাণ্ড। একদিনের কথা বলে তিন দিন গিয়ে বাইরে কাটিয়ে আসা। তাদের জন্যে কি ভাববার কেউ নেই? দুশ্চিন্তায় কদিন ধরে তাঁর ঘুম হয়নি।

নীলাদ্রি ফিস ফিস করে মাকে জিজ্ঞাসা করল, 'দিনে না রাত্রে?'

কিন্তু আরো খবর আছে। সরোজিনী একখানা এয়ার মেলের চিঠি ম্যাকসের হাতে দিলেন। কনসলেট অফিস থেকে পাঠিয়ে দিয়েছে। দুদিন ধরে পড়ে আছে চিঠিটা।

চিঠি পড়ে ম্যাকসের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। নীলাদ্রি জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার ম্যাকস ? খবর কি ?'

খবর সুবিধা নয়। ব্যবসায়ে দারুণ লোকসান যাচ্ছে। ম্যাকসের বাবা টাকা আর পাঠাতে পারবেন না। সে যেন অবিলম্বে দেশে চলে যায়। ম্যাকস শুধু বাপের টাকার ভরসায় আসেনি। তবু বাবার বিপদে তারও বিপদ।

ম্যাকস কালই এখান থেকে চলে যাবে। সকালে যদি নাও হয়, কাল সন্ধ্যায় বোম্বে মেল তার ধরা চাইই।

শীলা স্তব্ধ হয়ে গেল। সে কি। এত হঠাৎ ? এমনি তাড়াতাড়ি ?

এই মুহূর্তে সে ভুলে গেল ম্যাকস এসেছিলও এমনি আকস্মিকভাবে।

কিন্তু ঘটনাচক্রের ওপর দারুণ রাগ হতে লাগল শীলার। অবুঝ অভিমানের সঙ্গে সে মনে মনে বলতে লাগল, 'এমন হবে জানলে কিছুতেই বেড়াতে যেতাম না।'

ম্যাকস তার জিনিসপত্র গুছাতে গুছাতে পরদিন সবাইকে বলল, সে গোড়ায় ভেবে এসেছিল তিন দিনে কলকাতা সফর শেষ করে সে বিদায় নেবে। কিন্তু তিন দিনের জায়গায় তিন সপ্তাহেরও বেশি কেটে গেছে, সে যেতে পারেনি। কী করে যে কেটেছে, তা সে টের পায়নি। যদি সময় থাকত আরো তিন মাস সে এই শহরে বাস করে যেত। কিন্তু আরো তিন বছর থাকলেও সাধ মিটত না।

বেলা পড়ে এল। ম্যাকসের গলা আরো করুণ শোনাতে লাগল। ভাঙা ভাঙা ইংরাজীতে সে নীলাদ্রি আর সরোজিনীকে বলতে লাগল, তার পথযাত্রীর জীবনে সে এখানে এসে যা পেয়েছে, তা আর কোথাও তার ভাগ্যে জোটেনি। এখানে এসে সে নিজের বাড়িকে ভুলেছিল। এখানে এসে সে নিজের ঘরকেই ফিরে পেয়েছিল। এমন আদর, এমন যত্ন, এমন সেবা, এমন স্নেহ সে আর কোথাও পায়নি।

ম্যাকসের কথাগুলি নীলাদ্রি তার মাকে অনুবাদ করে করে শোনাতে লাগল।

সরোজিনীর চোখদুটি ছল ছল করে উঠল।

নীলাদ্রি বলল, 'মা, তুমি কিছু বলো।'

সরোজিনী বললেন, 'আমি আর কী বলব বাবা। তুই ওকে বল আমি ওর জন্যে কিছুই করতে পারিনি। আমার কতটুকুই বা সাধ্যি। ও যে ওর মার কাছে ফিরে যাচ্ছে, সেই আমার আনন্দ। ওকে বল, আমি ওর এখানকার মা হয়ে চোখের জল ফেলছি আর সেখানকার মা হয়ে ওর জন্যে দিন গুনছি।'

একথার উত্তরে ম্যাকস নিচু হয়ে সরোজিনীকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করল। শ্রদ্ধা জানাবার এই ভারতীয় পদ্ধতি ম্যাকস এর মধ্যে লক্ষ্য করেছিল।

নীলাদ্রির সঙ্গে ঠিকানা বিনিময়ের পর হঠাৎ তার খেয়াল হল শীলা এখানে নেই। কখন উঠে নিজের ঘরে চলে গেছে। ম্যাকস তার কাছে বিদায় নিতে গেল। এদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে শীলা জানলার শিক ধরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। পাশের বাড়ির পুরোনো প্রকাণ্ড এক দেওয়াল ছাড়া যদিও বাইরে আর কিছুই দেখবার নেই। ম্যাকস তার দোরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। দোভাষী নীলাদ্রি আজ আর তার সঙ্গে গেল না।

খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে একটু হেসে ম্যাকস মৃদু কোমল স্বরে ডাকল: 'Now, Miss No No No !'

শীলা চমকে উঠে ফিরে তাকাল। ওর মুখে হাসি নেই। কিন্তু ম্যাকসের মুখে হাসি দেখে তার মনে হোলো কী নিষ্ঠুর, ওরা কী নিষ্ঠুর। জার্মান জাততো এই সেদিনও ফ্যাসিস্ট ছিল। চিরকালের যোদ্ধার জাততো। নিষ্ঠুর তারা হবেই।

ম্যাকস তেমনি হাসিমুখেই বলতে লাগল: 'Miss No No No, what will you say today ? Please say something. I hope today you will say—yes. If not thrice, once at least.'

শীলা রাগ করে মুখ ফিরিয়ে নিল। আজও ঠাট্টা। সে না হয় ইংরাজী নাই বলতে পারে। কিন্তু ঠাট্টা বোঝবার শক্তি তো তার আছে। কী নিষ্ঠুর। কী নিষ্ঠুর।

ম্যাকস চুপ করে আরো কিছুক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে ভিতরে গিয়ে ঢুকল।

'Sheela :'

শীলা ফিরে দাঁড়াল। বিদেশীর কণ্ঠে ভিন্ন রকমের উচ্চারণে নিজের নাম এই প্রথম শুনতে পেলো শীলা। কিন্তু এই আহ্বানে সে কোন সাড়া দিল

না। শুধু দুটি সজল কালো চোখ আর দুটি নীল ছল ছল চোখের দিকে তাকিয়ে রইল।

একটু বাদে ম্যাকস আবার বলল, 'Sheela : I—I—I can't express me in foreign language. It has become my foe. Please allow me my mother-tongue.'

তারপর ম্যাকস তার নিজের জার্মান ভাষায় একটানা বলে যেতে লাগল। সে কি গদ্য না ওদের ভাষার কবিতা—শীলা বুঝতে পারল না। সে কি ওর নিজের কথা না কি কোন মহাকবির আবৃত্তি—শীলা বুঝতে পারল না। সে কি সাধারণ সৌজন্য নাকি তীব্রতর অন্তর্ভেদী, আগুনের মত, বিদ্যুতের মত প্রণয় ভাষণ—শীলা কিছু বুঝতে পারল না।

শীলার মনে হল, অনেক দিন বাদে অনেক চেষ্টা যত্নের পর যদি জার্মান ভাষা সে কোনদিন শিখতে পারে, তাহলেও কি একবার মাত্র শোনা এই মধুর শব্দগুলি সে ফের খুঁজে বার করতে পারবে? পারবে না, পারবে না। দুর্বোধ্য ভাষার আড়ালে যে প্রেম-সম্ভাষণ আজ রচিত হল, বিস্মৃতির গভীর অতলে তা চিরকালের মত তলিয়ে থাকবে।

একটু বাদে ম্যাকস বেরিয়ে এলো। করকম্পনের আর চেষ্টা করল না। সে ওকে বাক্য দিয়ে ছুঁয়েছে, কাব্য দিয়ে ছুঁয়েছে। অন্তর দিয়ে ছুঁয়েছে। হাত দিয়ে ছোঁয়ার তার দরকার নেই।

দোরের সামনে ট্যাক্সি এসে হর্ন দিতে লাগল। শীলাকে ডাকতে এসে সরোজিনী থমকে দাঁড়ালেন। মেয়ে তার বিছানার ওপর উপুড় হয়ে শুয়েছে। আর সেই প্রথম দিনের মত তার সর্বাঙ্গ দমকে দমকে কেঁপে কেঁপে উঠছে।

এ কম্পন যে কিসের, তা তিনি আর পরখ করবার প্রয়োজন বোধ করলেন না।

ম্যাকসকে হাওড়া স্টেশনে গাড়িতে তুলে দিয়ে নীলাদ্রি তার নিজের ঘরে গিয়ে সেতার নিয়ে বসল।

সরোজিনী তার কাছে এসে দাঁড়ালেন। একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'মেয়েতো উঠলও না, খেলও না। সেই ভাবেই পড়ে আছে।'

নীলাদ্রি কোন কথা না বলে স্মিতমুখে সেতারে আঙুল রাখল।

সরোজিনী ভ্রূ কুঁচকে উদ্বেগের সুরে বলতে লাগলেন, 'তুমি হাসছ। কিন্তু

তুমিই বাপু সব নষ্টের গোড়া। তুমিই শুরু থেকে ঠাট্টা করে করে এই কাণ্ড বাধিয়েছ। এখন এই মেয়ে নিয়ে আমি কী করি।'

নীলাদ্রি মায়ের দিকে তার প্রশান্ত দুটি চোখ মেলে ধরল। তারপর মৃদু স্নিগ্ধ মধুর আশ্বাসের স্বরে বলল, 'কিছু ভেব না মা। দুদিনেই সব ঠিক হয়ে যাবে। জীবনে এর চেয়েও কত বড় বড় কথা তো আমরা ভুলি।'

গোপনে নিঃশ্বাস চেপে মনে মনে বলল, 'জীবনে কত বড় বড় ব্যথাও তো আমাদের ভুলে থাকতে হয়।'

সরোজিনী আর কোন কথা না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। দরজার পাট দুখানি নিঃশব্দে ভেজিয়ে দিয়ে এলেন আসার সময়।

একটু বাদে ফের ধ্বনির তরঙ্গ উঠল; ও-ঘরের একটি হৃদয়যন্ত্রের তালে তালে একটি তার-যন্ত্র সারা বাড়ির আকাশে বাতাসে গৌড়মল্লারে সুরটমল্লারে এক অন্তহীন কূলহীন বিষাদসিন্ধুর ঢেউ সারা রাত ধরে ছড়িয়ে দিতে লাগল।

দোলা

বিয়ে আমি বেশি বয়সেই করেছিলাম। চল্লিশ পার করে দিয়ে। অবশ্য এই বয়সে এসে বিয়ে করবার আমার ইচ্ছা ছিল না। কথাটা শুনে আপনি নিশ্চয়ই মনে মনে হাসছেন। বিশেই হোক আর চল্লিশেই হোক বিয়ের কথায় মন কদমফুলের মত রোমাঞ্চিত হয় না কার। মুখে যতই না না বলুক মনে মনে কে না ভাবে 'আর একবার সাধিলেই খাইব।' কিন্তু বাবা মা যতদিন ছিলেন সাধাসাধি কম করেননি, দাদা বউদিও যথেষ্ট সেধেছেন। কিন্তু আমি মত দিই নি। পরিবারের চেয়ে তার বাইরের জীবনই আমাকে বেশি আকৃষ্ট করত। কোন রকমে গাড়ি ভাড়াটা জোগাড় করতে পারলেই বেরিয়ে পড়তাম। ঘুরে বেড়ানোটা এক সময় আমাকে নেশার মত পেয়ে বসেছিল। তাই বলে শুধু যে ভবঘুরে ছিলাম তাও নয়। দু একটি জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও আমার যোগাযোগ ছিল। তাদের নিয়মিত সদস্য আমি ছিলাম না। ধর্মানুষ্ঠানেও যোগ দিইনি। তবু চাঁদা তোলার কাজে, স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে দুর্ভিক্ষে বন্যায় দুর্গতদের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াতে ভালোবাসতাম। নাম যশের লোভ যে একেবারেই ছিল না সে কথা বললে মিথ্যা বলা হবে। তবে সেই লোভই একমাত্র প্রেরণার বস্তু ছিল না। কিন্তু নিজের কথা নিজে বড় বেশি বলে ফেলছি।

আমার জীবনকাহিনীর এই যে খসড়া আপনাকে পাঠাচ্ছি আপনি ইচ্ছা করলে আপনার গল্পে তার এই প্রথম দিকটা ছেঁটে দিতে পারেন। কারণ আপনার গল্পের সঙ্গে এই অংশের বিশেষ কোন যোগ থাকবে না। আপনার গল্প হবে অষ্টম হেনরীর প্রাইভেট লাইফ, তার পাবলিক লাইফ নয়।

আমি যখন একটা দেশী মার্চেন্ট অফিসে চাকরি নিয়েছি তখন থেকেই গল্পটা আরম্ভ করতে পারেন। একেবারে কনিষ্ঠ কেরানী হতে হয়নি। সহকারী ম্যানেজারের পদই পেয়েছিলাম। ডিগ্রীটা ছিল। বয়সও হয়েছে। তাছাড়া ডিরেক্টর বোর্ড খবরের কাগজে নাম-টামও দেখে থাকবেন। ছবিও হয়তো দু-একবার বেরিয়েছে। দেখবার মত ছবি নয়। দাঁড়কাকের মত চেহারা। তবু লোকে দেখত।

ওই একটু পরিচয়ের জোরেই কাজটা ভালো পেয়েছিলাম। সেই তুলনায় মাইনে অবশ্য ভালো নয়। তবে নিজের মেসের খরচটা চলে যেত আর বই কেনার বিলাসিতাটাও রাখতে পারতাম।

ঝক্কি নেই, ঝামেলা নেই, বেশ ছিলাম। দাদা বউদি ছেলেপুলে নিয়ে এলাহাবাদের বাসিন্দা হয়েছেন। বাড়িও করেছেন সেখানে। দাদা সরকারী চাকুরে। বউদি মহিলা সমিতির নেত্রী। ভাইপো ভাইঝিরা ওখানেই পড়ে, বড়রা চাকরি বাকরি করে। মাঝে মাঝে আমি ছুটিছাটায় যাই আসি। বউদি তখনও ঠাট্টা করেন 'কি ঠাকুরপো' বিয়েটা একেবারেই করলে না? জীবনের একটা দিক একেবারে না দেখেই চলে গেলে?'

তিনিও জানেন, ও প্রশ্নের এখন আর কোন জবাব নেই। কথাটা একেবারেই ঠাট্টা। আমিও তাই জানি।

এর মধ্যে এক কাণ্ড ঘটল। আমাদের অফিসের একাউন্টস ডিপার্টমেণ্টের মতিবাবু, মতিলাল দে মারা গেলেন। মারা যাওয়ার বয়স তাঁর অনেকদিন আগেই হয়েছিল। শতায়ু হও বলে আমরা এখনো আশীর্বাদ করি বটে, কিন্তু সত্তর পর্যন্ত হাত পা চোখ কান নিয়ে টিঁকে থাকতে পারলেই খুশি হই। মতিবাবু প্রায় ওই বয়স অবধি বেঁচেছিলেন: কিন্তু ঠিক হাত পা চোখ কান নিয়ে নয়। রোগে দারিদ্র্যে মরবার দশ পনের বছর আগে থেকেই তিনি অর্ধমৃত হয়েছিলেন। শেষের দিকে অফিসে আসতেন লাঠিতে ভর করে। চোখে চশমা দিয়েও কিছু দেখতে পেতেন না। কান দুটো তো আগে থেকেই গিয়েছিল। হাতের কলমটা পর্যন্ত কাঁপত। ফিগারগুলি সমানে পড়ত না। ওপরে উঠত নিচে নামত, এঁকে বেঁকে যেত। কাজ করবার ক্ষমতা তাঁর আর ছিল না। তবু অফিসেই তিনি ছিলেন। তাঁর চেয়ারখানিতে সেদিন পর্যন্ত তিনি বসে গেছেন। প্রমোশন যেমন হয়নি, তেমনি চাকরিও যায়নি।

এই মতিবাবুর কাছে আমি কিছু কৃতজ্ঞ ছিলাম। ছাত্র জীবনে বার দুই ওঁর আশ্রয়ে বাস করেছি। তার পরেও টুইশন করে আমাকে পড়াশুনো চালাতে হয়েছে। মতিবাবু দুই একটা দুর্লভ টুইশনের সন্ধান দিয়েছেন। দাদার অবস্থা ভালো ছিল না। তাঁর কাছে টাকা চাইতে লজ্জা হত। মতিবাবুর অবস্থা আরো খারাপ ছিল। তবু তাঁর কাছে হাত পেতেছি।

তাই মতিবাবু যখন শয্যা নিলেন আমি সপ্তাহে দু-দিন পারি একদিন পারি তাঁর বাদুড়বাগানের বাসায় যেতে লাগলাম। ভারি দরিদ্র পরিবার। পুরোন

বাড়ির একতালার দু'খানা-ঘরে কোনরকমে মাথা গুঁজে আছেন। আসবাব-পত্রের মধ্যে গোটা কয়েক বাক্স-তোরঙ্গ, তক্তপোষ আর দু-তিনখানা হাতলহীন চেয়ার। আমি সে চেয়ারে বসতাম না। রোগীর বিছানার পাশেই বসতাম। কোন কোনদিন ওঁর স্ত্রী আলাদা আসন পেতে দিতেন। বড়মেয়ে চায়ের কাপটি এনে সামনে ধরত। সে যদি অন্য কাজে ব্যস্ত থাকত আমার পরিচর্যায় এগিয়ে আসত মেজো সেজোরা। পাশে দাঁড়িয়ে তালপাখা নিয়ে বাতাস করত। আমি হেসে বলতাম, 'আমাকে হাওয়া করতে হবে না, তোমার বাবাকে করো।'

ওঁদের মা বলতেন, 'তোমাকে ওরা দেবতার মত দেখে। আমাদের আত্মীও নেই, বন্ধুও নেই। এই বিপদের দিনে তুমিই যা এসে খোঁজখবর নাও।'

আমি কুণ্ঠিত হয়ে বলতাম, 'অমন কথা বলবেন না। উনি আমাদের জন্যে অনেক করেছেন।'

ওঁর স্ত্রী বলতেন, 'সে কথা আর সংসারে কজন মনে রাখে বল।'

রোগের যন্ত্রণার চেয়েও ভবিষ্যতের চিন্তাটাই মতিবাবুর বেশি। তিনি চোখ বুঁজলে স্ত্রী আর চারিটি মেয়ের কী গতি হবে সেই কথাই বার বার বলতেন। এদের আগে আর পরে ওঁদের আরো ছেলেমেয়ে হয়েছে। 'তারা কেউ নেই, আছে শুধু ওই কটি কুফল।'

আমি বলতাম আপনি ওসব ভেবে মন খারাপ করবেন না।

বলতাম বটে কিন্তু আমি নিজেই বিশেষ ভরসা পেতাম না। যাদের থাকে না তাদের কিছুই থাকে না। মতিবাবুরও কোন কুলে কেউ নেই। দূর সম্পর্কের দু'একজন যারা আছে তারা তো কাছেও ঘেঁসে না। হাজার খানেক টাকার লাইফ ইনসিওরেন্স একবার করেছিলেন। প্রিমিয়াম না দিতে পারায় বহুদিন আগেই তা ল্যাপ্স করে গেছে। প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড থেকে ধার নিয়ে নিয়ে তার আর কিছু অবশিষ্ট নেই।

মৃত্যুর পর আরও একটা তথ্য উদ্ঘাটিত হল, এখানে সেখানে কিছু দেনাও করেছেন। মুদির দোকান থেকে শুরু করে, ডাক্তারের ওষুধের দাম, বাড়ি-ওয়ালার ভাড়া পর্যন্ত বাকি।

মতিবাবুর স্ত্রী আমার হাত জড়িয়ে ধরলেন, 'বাবা, এই অবস্থায় তুমি আমাদের ছেড়ে যেয়ো না। মেয়েগুলিকে নিয়ে আমাকে তাহলে পথে দাঁড়াতে হবে।'

পুরোন বন্ধুর খোঁজ নিতে এসে এত বড় দায়িত্ব যে ঘাড়ে চাপবে ভাবিনি। বললাম, 'ভাববেন না, আপনাদের একটা ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত আমি যাব না।'

সদ্য বিধবা তাঁর দু-চারখানা গয়না কোন ট্রাঙ্ক কি ঝাঁপির ভিতর থেকে বের করলেন কে জানে। আমার সামনে এনে ধরে দিয়ে বললেন, 'এছাড়া আমার আর কিছু নেই। এ দিয়ে তুমি ওঁর কাজটুকু করে দাও।'

আমি বললাম, 'ওঁর কাজ আটকাবে না। আপনি ওসব তুলে রাখুন।'

বড়মেয়ের নাম শান্তি। সে বলল, 'মা উনি তো আমাদের পর নন। ওঁর কাছে অত সংকোচ কিসের। উনি এরই মধ্যে আমাদের জন্যে অনেক করেছেন। এই গয়না বিক্রির কটা টাকায় তার যে সিকির সিকিও শোধ হবে না।'

শান্তির বয়স তখন কত আর। আঠারো উনিশ হবে। ও যে দেখতে এত সুন্দর, বোনদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী এর আগে লক্ষ্য করিনি। হাতে দুগাছি প্লাস্টিকের চুড়ি ছাড়া অলঙ্কারের কোথাও কিছু নেই। পরনে আটপৌরে একখানা শাড়ি। কিন্তু তাতে ওর রূপের অসামান্যতা ঢাকা পড়েনি। উজ্জ্বল রঙ, তীক্ষ্ণ নাক মুখ চোখ—আপনাদের গল্পের নায়িকা হবার জন্য যা যা দরকার সবই আছে। কিন্তু এতদিন আমি ভালো করে দেখিনি। হাসবেন না, সত্যিই দেখিনি। কেবল সমস্যার কথাটাই ভেবেছি। বোঝার গুরুভারের কথা ভেবেই ক্লিষ্ট হয়েছি। কিন্তু ওর যে এত রূপ আছে তা দেখিনি। আজ একটি কৃতজ্ঞ তরুণীর মধ্যে নারীর রূপকে আমি প্রথম দেখলাম। কৃতজ্ঞতা যে এত মধুর তা যেন আমি জীবনে এই প্রথম অনুভব করলাম। যে ভারকে অত গুরুতর মনে করেছিলাম তার গৌরব রইল, ভার যেন আর রইল না।

শ্রাদ্ধশান্তি চুকে গেল। মাইনের টাকার বেশির ভাগ আমি মতিবাবুর স্ত্রীর হাতে এনে ধরে দিলাম। তিনি একটু কুণ্ঠিত হয়ে বললেন, 'সব দিলে তোমার চলবে কি করে। তোমারও তো মেস খরচা আছে।' আমি বললাম, 'সে একরকম চলে যাবে। সেজন্যে ভাববেন না।'

তিনি বললেন, 'সে কি হয় বাবা। তুমি আমাদের জন্যে ভাববে, আমাদের জন্যে সব করবে, আর আমরা পোড়া ছাই একটু ভাবতেও পারব না। তুমি এখান থেকেই দুটো ডাল ভাত খেয়ে যাবে।'

শান্তি বলল, 'খেয়েই দেখুন না অতুলদা। কদিন থেকে আমরা বোনেরাই রান্নার ভার নিয়েছি। আপনার মেসের ঠাকুরের চেয়ে খুব খারাপ হবে না।'

আমি বললাম, 'ঠাকুরের চেয়ে ঠাকুরানীরা চিরকালই ভালো রাঁধে।'

এত তরল স্বরে ওর সঙ্গে কোনদিন কথা বলিনি। এই প্রথম বললাম।

শান্তি হেসে বলল, 'সে কথা স্বীকার করেন তাহলে?'

শুধু শান্তি নয়, ওদের চার বোনের মুখেই দেখলাম হাসি ফুটেছে। শান্তি, সুধা, তৃপ্তি, দীপ্তি। বয়সে দেড় বছর থেকে দু-বছরের ব্যবধান। গড়নে প্রায় প্রায় এক। কারিগরের একই ছাঁচে ঢালা মূর্তি। রঙটা ওরই মধ্যে কারো এক পোঁচ বেসি ফর্সা, কারো বা একটু শামলা।

চার মুখে সেই চারটি হাসির রেখা দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। এতদিন আমি ওদের শান্তনা দিয়েছি, প্রবোধ দিয়েছি, আশ্বাস দিয়েছি, উপদেশ দিয়েছি, আজ দেখলাম সবচেয়ে বড় দান হল আনন্দ দান। আমার কথায় যে ওরা হেসেছে এর চেয়ে বড় বিস্ময়কর যেন আর কিছু নেই। আমার একটি মাত্র কথায় যে চারটি হাসির ঝরণা ছুটে বেরোতে পারে তা দেখে সেদিন সত্যিই বড় অবাক লেগেছিল।

প্রথম মাসে আমি শুধু প্রতি রবিবারে আসতাম। ওদের সঙ্গে বসে খেতাম, গল্প করতাম, হাসতাম, হাসাতাম। দ্বিতীয় মাসে ওদের দাবী বাড়ল। তৃতীয় মাসে আমাকে মেস ছেড়ে দিয়ে ওদের দুখানা ঘরের একখানার বাসিন্দা হতে হল। শান্তির মা বললেন, 'তুমি সব দিচ্ছ, ওদেরও কিছু দিতে দাও। ওরা তোমাকে রেঁধে খাওয়াক, সেবা করুক, পরিচর্যা করুক। তাহলে ওদের ভিখিরীর মত নিতে হবে না। আমিও ভাবতে পারব—আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকেই নিচ্ছি। তুমি আর আমাদের পর মনে কোরো না বাবা।'

এদিকে দুটো এস্টাবলিশমেণ্ট চালাতে গিয়ে আমি গলদঘর্ম হয়ে উঠেছি। শুধু মাইনের টাকায় কুলোয় না। ব্যাঙ্কে যে সামান্য কিছু সঞ্চয় আছে তাতেও হাত পড়ে। আমি তাই শান্তিদের কথায় সম্মতি দিলাম।

মির্জাপুরের তিনতলায় একখানা ঘরে আমি একা থাকতাম। পুবের দক্ষিণের দুদিকের জানালাই খোলা ছিল। সেই তুলনায় বাদুড়বাগানের এই অপরিসর ছোট ঘর মোটেই বাসযোগ্য নয়। জানালা একটা আছে তাও পশ্চিমের দিকে। দিনের বেলায় ঘরখানা আধা অন্ধকার হয়ে থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেদিনের সেই বাদুড়বাগান আমার কাছে পৃথিবীর সেরা ফুলবাগান হয়ে উঠল। চার বোনে কোমরে আঁচল জড়িয়ে ঘরখানা ঝেড়েপুছে পরিষ্কার

করল। তক্তপোষ পাতল, বাইরের র‍্যাকটি সাজিয়ে দিল। টিপয়ে রাখল একটি ফুলদানি।

সন্ধ্যার সময় স্যুইচ টিপে আলো জ্বালতে গিয়ে আমি একটু শক খেলাম। বিদ্যুতাঘাত। ছোট তিন বোন তো হেসেই অস্থির।

শান্তি হাসল না। একটু অপ্রতিভভাবে বলল, 'আপনাকে বলা হয়নি, স্যুইচটা খারাপ আছে।'

আমি পরদিনই মিস্ত্রী ডেকে সব ঠিক করে নিলাম। শুধু এ ঘরের নয়, ওঘরেরও। বাড়িওয়ালার ভরসায় আর রইলাম না।

তারপর দু মাস যেতে না যেতেই কথা উঠল, আমি কে, আমার পরিচয় কী। পরিবারের বন্ধু কথাটা নির্ভরযোগ্য নয়। আমাদের সমাজ আত্মীয়তার বন্ধন ছাড়া আর কোন বন্ধন মানে না।'

শান্তির মা বললেন, 'বাবা, আমাকে সবাই ঠাট্টা করে। দোতালার ওরা তো দিনরাত ওই নিয়েই আছে।'

আমি সব বুঝতে পেরে বললাম, 'তাহলে আমি চলে যাই। মেসের সেই ঘরটা না পেলেও একটা সীট নিশ্চয়ই পাব।'

শান্তির মা বললেন, 'না, তা হয় না। তোমাকে আমরা ছাড়তে পারি না।'

আমি বললাম, 'ভাববেন না। দূরে গেলেও আমি আপনাদের কাছেই থাকব। যেটুক করছি, সাধ্যমত তা করতে চেষ্টা করব।'

তিনি বললেন, 'তুমি আর কতদিন তা করবে। ভিখারীর মত আমরাই বা সারাজীবন তা কী করে নেব। যাতে অসংকোচে নিতে পারি, যাতে কেউ আর কোন কথা না বলতে পারে, তুমি তার একটা উপায় করে দাও।'

এ উপায়ও আমাকে করে দিতে হবে। আমি চুপ করে রইলাম। কিন্তু বুকের ভিতরটা আর চুপ ছিল না। তা তোলপাড় করছিল।

আমি ভেবে দেখলাম শান্তির সঙ্গে দূরত্বের ব্যবধান আমার অনেক কমে গেছে। ও আমার বিছানার পাশে এসে বসে, হাসে গল্প করে। র‍্যাকের বাংলা বইগুলি টেনে টেনে নিয়ে পড়ে। আমার র‍্যাকে ওর পড়বার মত বই বেশি ছিল না। ওর ফরমায়েশ মত পাড়ার লাইব্রেরী থেকে আমিই আপনাদের লেখা সব আধুনিক গল্প আর উপন্যাস যোগাড় করে এনে দিই। কিছু কিছু কিনেও আনি।

মাঝে মাঝে এমন কথা শান্তি বলে লঘুগুরুর ব্যবধান মানলে যা যা বলা যায়

না, এমন প্রসঙ্গ তোলে যা এতখানি বয়সের ব্যবধানে উঠবার কথা নয়। এমনভাবে হাসে, এমনভাবে তাকায় যে আমার মনে হয় আপনাদের বর্ণিত পূর্বরাগের লক্ষণগুলির সঙ্গে একেবারে হুবহু মিলে যায়। অবশ্য আপনাদের বর্ণনার ওপরই শুধু আমি সেদিন নির্ভর করিনি। আমাদের নিজের যে বোধশক্তি আছে সেদিন সেও সেই কথা বলেছিল। সে বোধ ছিল বাসনারঞ্জিত।

তবু আমি বললাম, 'কিন্তু শান্তির মত—'।

শান্তির মা একটু হেসে বললেন, 'তার মত আগেই নিয়েছি। সেজন্য তুমি ভেব না।'

অফিসে বেরোবার আগে শান্তির ফের দেখা পেলাম। অন্য দিনের মত সেদিনও পানের খিলিটি হাতে দিতে এসেছে।

আমি তাকে একান্তে পেয়ে বললাম, 'তোমার মার কথা শুনেছ? তোমার কি মত?'

যদিও জানি মেয়েরা এসব কথা স্পষ্ট করে বলে না, ঠিক ওইরকমই ঘুরিয়ে বলে, ফিরিয়ে বলে, হাসিতে বলে, আভাসে বলে, তবু আমি ফের জিজ্ঞসা করলাম, 'তুমি কি সব ভেবে দেখেছ? তোমার মতটা শুনতে চাই।'

শান্তি তেমনি হেসে বলল, 'আমি আবার কি ভাবব। এতক্ষণ মার কাছ থেকে শুনলেন, তাতে বুঝি হল না?'

তাতেই হল। পাঁজিতে শুভদিন দেখে বিয়ে করে ফেললাম শান্তিকে। ঘটাপটা কিছুই করলাম না। ওদের তো একপয়সাও ব্যয় করবার শক্তি নেই। যা করবার আমাকেই করতে হবে। ওদের আত্মীয়স্বজন বলতে কেউ ছিল না। তাদের কাউকেই নিমন্ত্রণ করতে দিলেন না আমার শাশুড়ী। তিনি বললেন, 'বিপদের দিনেই যখন কাউকে পেলাম না, এখন আমার কাউকে দরকার নেই।'

অমিও দু একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছাড়া বিশেষ কাউকে বললাম না। তারা শান্তিকে দেখে আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বলল, 'সাবাস। তোমার সবুরে মেওয়া ফলেছে।'

তাড়াহুড়োতে আমি প্রথমে নতুন বাড়ি ঠিক করতে পারিনি। বাদুড়বাগানের ওই পুরোন বাসাতেই এক বছর ছিলাম। বাইরের দিক থেকে শান্তির বিশেষ কিছুই বদলাল না। যা বাপের বাড়ি ছিল তাই হঠাৎ স্বামীর ঘর হয়ে দাঁড়াল। শান্তির সিঁথিতে সিঁন্দুর উঠল, হাতে শাঁখা। শাড়িটা দামী হল, রঙটা প্রগাঢ়। কিছু গয়না গাটিও করে দিলাম। অবশ্য একেবারে গা-ভরে

দিতে পারলাম না। ওর যে আরো তিন বোন আছে। তাদের গা যে একেবারে খালি। ওদের দু-খানা এক খানা করে গড়িয়ে দিলাম। তাতে আমার শাশুড়ীরও আপত্তি শুক্লিকাদেরও। সুধা বলল, 'বাঃরে আমাদের কেন দিচ্ছেন। আমাদের তো আর বিয়ে করেন নি।'

আমি বললাম, 'ভবিষ্যতে করতেও তো পারি।' তা শুনে ওরা চারজনেই খুব একচোট হাসল।

তৃপ্তি বলল, 'যেটিকে বিয়ে করেছেন সেটিকে আগে সামলান। তারপর আমাদের দিকে চোখ দেবেন।'

আমি ওর বেণী ধরে কাছে টেনে এনে বললাম, 'তবেরে দু-নম্বর ফাউ—।'

ওদের প্রত্যেকেরই বাড়ন্ত গড়ন, ফুটন্ত যৌবন। বিয়ে ওদের একজনেরই হয়েছে। কিন্তু হাওয়া লেগেছে সবাইর গায়ে, গায়ে-হলুদের রঙ বসে গেছে সবাইর মনে।

আমাদের মধ্যে যে ব্যবধান ছিল তা আমি তুলে দিলাম। এর জন্যে বেশি কিছু চেষ্টা করতে হল না। আমাদের মধ্যে যে দাতা গ্রহীতার সম্পর্ক ছিল তা আগেই ঘুচে গেছে। শ্রদ্ধার, ভয়ের কোন দুস্তর ব্যবধানই আর নেই। বয়সের বোঝা নামিয়ে দিয়ে আমি ওদের সমস্তরে নেমে এসেছি। বড় সুখের এই অবতরণ।

মাইনের টাকাটা শাশুড়ীর হাতে দিতে গেলে শাশুড়ীও একটু রসিকতা করে বললেন, 'এখন তো বাড়ির গিন্নী হল শান্তি।'

শান্তি হেসে বলল, 'মা, তুমি যদি অমন কথায় কথায় খোঁচা দাও ভালো হবে না কিন্তু।' বহুদিন পরে যেন সংসারে সুখের বান ডেকেছে।

টাকা শান্তি নিজের কাছে রাখল না, হিসাব নিকাশ, সংসারের আর পাঁচটা ব্যবস্থা বন্দোবস্তের ভারও আমার শাশুড়ীর হাতেই রইল। কিন্তু, শান্তি মনে মনে জানল সে-ই কর্ত্রী, তার জন্যেই সব। যে ছিল দাতা, শান্তির জন্যেই সে গ্রহীতা বনে গেছে। তার এই মনোভাব গোপন রইল না। চাল চলনে ফুটে বেরোতে লাগল। নিজের যৌবন দিয়ে সে যে আর চারটি জীবনকে রক্ষা করেছে এ গর্ব তার যাবে কোথায়।

বাইরের দিক থেকে সংসারের আর কোন পরিবর্তন হয়নি। শুধু বৃদ্ধ মতিলালের জায়গায় প্রৌঢ় অতুলচন্দ্র এসে বসেছে। কিন্তু ভিতরের যে পরিবর্তন হয়েছে তাকে প্রায় বৈপ্লবিক বলা চলে।

আমিও বদলাতে লাগলাম। এতদিন সমাজসেবা করেছি তার সঙ্গে অর্থ-নীতির বিশেষ যোগ ছিল না। টাকাকড়ি যা হাতে আসত তা দীন দুর্গতদের জন্যেই ব্যয় করতাম। ইস্কুল টিস্কুলও দু-একটা করেছি। কিন্তু এখন সব ছাড়িয়ে একটি পরিবারের জন্যে অর্থচিন্তাই আমার প্রবল হয়ে উঠল। এই পরিবারটিকে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে রাখা, শ্যালিকাদের পড়াশুনোর ব্যবস্থা করার জন্যে আমার আগেকার অভিজ্ঞতা বিশেষ কোন কাজে লাগল না। অফিসের যে মাইনে পাই তাতে ওইটুকু স্বাচ্ছন্দ্য আনাও সম্ভব নয়। তাতে বাদুড়বাগান থেকে নড়বার কথা ভাবতে পারি না। অথচ নড়তেই হবে। শুধু শান্তির বোনদের জন্যেই নয়, ভবিষ্যতে ছেলেপুলেও তো হবে তার জন্যে তৈরী হওয়া চাই। বিয়ের পর বয়স আমি পাঁচজনের কাছে কিছু কমিয়ে বললেও তা তো আর সত্যি সত্যি কমছে না। আর যৌবনে ধন উপার্জন করতে না পারলে যে হাল হয় তাতো আমি আমার শ্বশুরকে দেখেই বুঝতে পেরেছি।

তাই আমি প্রথম দিকে গোটা দুই পার্টটাইম কাজ নিলাম। তাতে রাত এগারটা বারটা হয়ে যায় বাড়ি ফিরতে। চারবোনের কেউ ঘুমোয় না, কিন্তু সবাই ঝিমোয়। আমি রাগ করে বলি, 'তোমরা খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়লেই পার।'

শান্তি বলে, 'বাজে বোকো না। তাই কেউ পারে নাকি? আচ্ছা, দিন নেই রাত নেই, ভূতের মত এমন খাটছ কেন বলতো?'

আমি গলা নামিয়ে বলি, 'একটি পরীর জন্যে।'

আমার সেই নিচুগলার কথাও কি করে সুধাদের কানে যায়। সে ফস করে বলে বসে, 'তাই নাকি অতুলদা? মাত্র একটি পরী? আপনার সঙ্গে তাহলে আমাদের কথা বন্ধ।'

আমি তাড়াতাড়ি ভুল শুধরে নিয়ে বলি, 'শ্রীবিষ্ণু শ্রীবিষ্ণু। একটি নয় চারটি। উর্বশী, মেনকা, তিলোত্তমা, রম্ভা। আমার চারটি অপসরী।'

আমি ওদের তিনজনকে পাড়ার স্কুলে ভর্তি করে দিলাম।

আমার শাশুড়ী বললেন, 'ইস্কুল টিস্কুল আবার কেন। এখন দেখে শুনে বিয়ে থা দিয়ে দাও। একটি একটি করে পার কর। তোমার ঘাড়ের বোঝা নামুক।'

সুধাকে ডেকে বললাম, 'তোমারও তাই ইচ্ছা নাকি?'

সুধা হেসে বলল, 'দোষ কি।'

আমি মাথা নেড়ে বললাম, 'উঁহু', আজেকাল শুধু রূপসী হলে হয় না। বিদুষী না হলে ভালো বর জোটা শক্ত।'

আমার ইচ্ছা সত্যি ওদের তিন বোনকে বেশ একটু দেখে শুনে বিয়ে দিই। ওরা পড়তে থাকুক। আর ইতিমধ্যে আমি তৈরী হই। পণ যৌতুকের টাকা জোগাড় করি।

শান্তি বলে, 'নিজের শরীরের দিকে যে একেবারেই তাকাও না।'

আমি জবাব দিই, 'এতদিনে তাকাবার লোক পেয়েছি। নিজের দিকে তাকানো মানে নিজের আয়নার দিকে তাকানো। সে হল নিজের ছায়া। যখন নিজেকে ছেড়ে আর একজনের দিকে তাকাই তখনই ছায়ার বদলে কায়াকে পাই।'

শান্তি অত তত্ত্বকথা শুনতে চায় না। সে বসে বসে পিঠের ঘামাচি মারে, আর দু একগাছি করে পাকা চুল তোলে।

একদিন বলল, 'আর তোলবার কিছু নেই। তুলতে গেলে কাঁচা ক'গাছিকেই তুলতে হয়। তার চেয়ে কলপ কিনে আন।'

আমার বুকের মধ্যে কিসের একটা খোঁচা লাগে। একটু বাড়িয়ে বলছে শান্তি। আমার চুলগুলি পাকতে শুরু করলেও অত পাকেনি। অত বুড়ো হইনি আমি।

ওর চিত্তচাঞ্চল্যের কারণটা আমার অজানা নেই। দোতলায় বাড়িওয়ালার মেয়ে মল্লিকা ওর সখি। তার সেদিন বিয়ে হয়ে গেল। বরের বয়স পঁচিশের নিচে। দেখতেও কার্তিকের মত। গানবাজনাও জানে। কিন্তু কার্তিকের বদলে বুড়ো শিবকে তো শান্তি জেনে শুনেই বরণ করেছে।

আমি চুলের জন্যে কলপ কিনলাম না। ভাবলাম পারি যদি কীর্তির কলপ পরব।

তিনটে চাকরি করে আর পারিনে। তাতে খাটুনিই সার। সংসারের হাল যে কিছু ফিরেছে তা নয়। জীবিকা পালটাবার জন্যে আমি কিছুদিন আগে থেকেই চেষ্টা করছিলাম। সেটুকু চেষ্টা এবার কাজে লাগল। আমার কয়েকজন জেলখাটা বন্ধু এখানেওখানে বেগার খাটছিলেন। তাদের নিয়ে, তাদের সাহায্যে শহরের বাইরে আমি ছোট একটা এগ্রিকালচারাল ফার্ম দাঁড় করালাম। পোলট্রি, ডেয়ারি আস্তে আস্তে সবই হল। ঘুরে ঘুরে শেয়ারও কম বিক্রি করলাম না। অফিস করলাম শহরেই। আর দোতলার চারখানা ঘর নিয়ে নিজেদের থাকবার ব্যবস্থা করে নিলাম। ঠিক চারবোনের জন্যে চারখানা ঘর

দিতে পারলাম না। তবে ওদের শোবার বসবার পড়বার জায়গা আর বেড়াবার জন্যে ছাদের ব্যবস্থা ঠিকই হয়ে গেল। ডেয়ারি ফার্ম খুলে বন্ধুবান্ধব এবং তাদের পুত্র ভ্রাতুষ্পুত্র ভাগ্নেদের দু-চারটে চাকুরির ব্যবস্থাও আমরা করতে পারলাম। যারা একেবারে অনাত্মীয় যোগ্যতা অনুযায়ী তারাও যে কাজকর্ম না পেলেন তা নয়। অনেক বেকার ছেলের বাপমায়ের আশীর্বাদ পেলাম। বহু পরিবার আমার কাছে কৃতজ্ঞ হয়ে রইল, যেমন একটি পরিবার হয়েছিল। কৃতিত্বটা আমার একার নয় তা আমি জানি। আমার বন্ধুদেরও যথেষ্ট অংশ এতে আছে তবু তারা বলতে লাগলেন, 'তোমার জন্যেই এত বড় কাজটা হয়েছে।' নিজেকে কোনদিনই তেমন একটা কাজের লোক মনে করিনি। কিন্তু তাঁরা বললেন, আমি না এগিয়ে এলে কিছুই হত না। আমি জোর করে আমার সেই বন্ধুদের টেনে না তুললে তাঁরা আমরণ অবসর শয্যাতেই পড়ে থাকতেন। কিছুদিনের মধ্যে আমাদের ডেয়ারির কাজ ভালোই চলতে লাগলো। মুনাফাও মন্দ হল না।

গল্পের মত শোনাচ্ছে, না? আপনারা গল্পকাররাও সত্য ঘটনাকে ভয় করেন। কারণ সত্য হল গল্পের চেয়েও বিস্ময়কর। কিন্তু সেই বিস্ময়কে আস্তে আস্তে সইয়ে আনাই তো আপনাদের কাজ। আপনার কাজ আপনি করবেন। আমার সে শক্তি নেই, সময়ও নেই।

সবাই বলতে শুরু করল তিন চার বছরের মধ্যে আমি অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিয়েছি। তা নাকি প্রায়ই আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের মত।

আমি স্ত্রীকে ডেকে বললাম, 'সে প্রদীপ কোথায় জ্বলছে জান?'

শান্তি মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'হয়েছে।'

ওর মুখে যে জবাবটি প্রত্যাশা করেছিলাম তা পেলাম না। ওর মুখে প্রদীপের যে আলোটি নতুন শিখায় জ্বলে উঠবে ভেবেছিলাম তা জ্বলতে দেখলাম না।

কিন্তু তা নিয়ে বেশিক্ষণ ভাববার কি হা-হুতাশ করবার আমার সময় ছিল না। তার একটু আগে প্রণব দত্ত অফিসের একটা জরুরী কাজ নিয়ে ঘরে ঢুকেছিল। বড় একটা কনট্রাকট হাতে প্রায় এসে পড়েছে। তাতে হাজার খানেক টাকা আসবে। আমি অফিস আর ফার্মের ব্যাপার নিয়েই তার সঙ্গে আলাপ করতে লাগলাম। স্ত্রীকে একটু দেখাতে চাই যে তার খুশী হওয়াটাই আমার একমাত্র কাম্যবস্তু নয়। পুরুষের আরো অনেক কাজ আছে, কীর্তির

আলাদা ক্ষেত্র আছে। প্রণব দত্ত অফিসের সেক্রেটারী আর আমার প্রাইভেট সেক্রেটারী, ইকনমিকসের এম এ। বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ। স্বাস্থ্যবান, সুদর্শন ছেলে। বুদ্ধিশুদ্ধি বেশ রাখে। আমি ওকে সুধার জন্যে মনোনীত করে রেখেছি। আমার শাশুড়ীরও তাই পছন্দ। তাই আমার সামান্য ইশারায় শুধু বাড়ির দোরগুলি নয়, জানলাগুলিও ওর জন্যে খুলে গেছে। বাড়ির সব জায়গায় সবাইর কাছেই ও অবারিত। ওর ভূমিকাও অনেক। ও তিন বোনের কলেজের পড়া দেখিয়ে দেয়। চার বোনেরই চিত্তবিনোদন করে। কখনো সিনেমায় নিয়ে যায়, কখনো লেকে, কখনো বোটানিক্যাল গার্ডেনে। শ্যালিকারা আর তাদের দিদি সবাই তার সান্নিধ্যে সুখী। আমি মাঝে মাঝে যে তাতে একটু চমকে না উঠি, খোঁচা না খাই তা নয়। কিন্তু গৃহলক্ষ্মীকে আমি সব সময় চোখে চোখে রাখব তার সময় কই। এতদিনে বাণিজ্যলক্ষ্মীর সঙ্গেও আমার শুভদৃষ্টি হয়েছে। সে দৃষ্টির মাদকতা তো কম নয়।

সারা দিন রাত আমি ব্যস্ত থাকি। অনেক রাত্রে ফিরে এসে শান্তিকে ঠিক আগের মত আর পাইনে। কখনো শুনি সে সিনেমা থেকে এখনো ফেরেনি। কখনো শুনি বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে গেছে। তার এত বন্ধু আছে নাকি? অসম্ভব নয়। অবস্থা ফেরার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বন্ধুবান্ধবের সংখ্যাও বেড়ে চলেছে।

যেদিন বাড়িতে থাকে সেদিনও মিলনটা নিষ্কণ্টক হয় না। কথায় কথায় কেন যে খিটিমিটি লেগে যায় বুঝে উঠতে পারিনে। বুঝতে পারিনে কার দোষ বেশী। নানা কারণে আমার মেজাজও ভাল থাকে না। ব্যবসা চালাবার ঝামেলা অনেক। নানারকম লোককে নিয়ে কারবার।

তাই মাঝে মাঝে আমার মুখ থেকে বেরিয়ে যায়, 'তোমার কি। তুমি তো সেজেগুজে পটের বিবিটি হয়ে বেশ ঘুরে বেড়াচ্ছ। একখানা হেলিকপ্‌টার কিনে দিলে উড়েও বেড়াতে পার।'

শান্তি বলে, 'দেখ, দিতে হয় দাও, না দিতে হয় না দাও। আমি দিনরাত অত খোঁটা আর সইতে পারব না।'

ঝগড়া লাগে। প্রায় প্রতি রাত্রে ঝগড়া লাগে। কারণে অকারণে সামান্য কারণে। খিটিমিটি বাধে। কেন এমন হয় আমি ঠিক বুঝতে পারিনে।

ঝগড়াঝাটির পর ও যখন পাশ ফিরে ঘুমোয় আমি ওকে চেয়ে চেয়ে দেখি। আমার শান্তি, আমার সেই শান্তি। ওর জন্যেই তো সব। ওর জন্যেই তো

আমার এত বিভব প্রতিপত্তি, আমার এই নব যৌবন লাভ। যে যৌবনকে আমি শুধু ঘরের কাজে লাগাইনি, যে যৌবন দিয়ে আমি একটি প্রতিষ্ঠানকে গড়ে তুলেছি, আরো দশজনের অন্নের সংস্থান করেছি। আমার আসল শক্তি যে কোথায় তা তো আমি জানি, আমার আসল অন্নপূর্ণা যে কে তা তো আমার অজানা নেই। তবু কেন আমি ওকে পাইনে। ওর জন্যে এত পেলাম, কিন্তু ওকে পেলাম না কেন।

একদিন আমি জোর করে ওর ঘুম ভাঙালাম, মান ভাঙালাম। জড়িয়ে ধরলাম বুকের মধ্যে। ও হঠাৎ বলে বসল, 'ছাড়ো ছাড়ো।' আমার এক ডেন্টিস্ট বন্ধুর পরামর্শে সব দাঁত ফেলে দিয়ে দু-পাটি দাঁতই বাঁধিয়ে নিয়েছিলাম। দামী সেট। আমি একটু অপ্রস্তুত হলাম। শান্তি বলল, 'তা ছাড়া তোমার মুখে কিসের একটা গন্ধ। দাঁতগুলি পরে শুলেই পার!'

বললাম, 'আমি নতুন করে নেশাভাঙও করিনে, কিছুই করিনে। যা ছিলাম তাই আছি। যখন খেতে পেতে না তখন কিন্তু আর গন্ধটন্ধ কিছু ছিল না।'

শান্তি বলল, 'ফের সেই খোঁটা?'

আমি বললাম, 'কেনইবা নয়? তুমি কি ভাব আমি কিছুই টের পাইনে? আমার গায়ের বাতাসটুকু পর্যন্ত তোমার আর পছন্দ হয় না। এমন অকৃতজ্ঞ নেমকহারাম আমি আর দুটি দেখিনি। একবার ভেবে দেখ তখন যদি না দেখতাম, কোথায় ভেসে যেতে।'

শান্তি বলল, 'সেই ভেসে যাওয়াই ভালো ছিল। এর চেয়ে মরণ ভালো ছিল আমার।'

এমনি চলল রাতের পর রাত।

মাঝে মাঝে থামে। তখন একেবারে কথা বন্ধ।

কিন্তু সেই অসহযোগও তো আমার কাম্য নয়।

কী যে আমি ওর কাছে চাই, আর কী যে পাইনে তা বুঝিয়ে বলা শক্ত। সব সময়েই যে ঝগড়াঝাটি চলে তা নয়। শান্তি কোন কোনদিন আগের মতই স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। হাসেও, কথাও বলে। কিন্তু আমার যেন মনে হয় আগে যা ছিল আসল, এখন তার অভিনয় চলে। বাইরের দিক থেকে সম্পর্কটা ঠিকই আছে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে আবার যে পরিবর্তনটা ঘটেছে তার নামও বিপ্লব।

তারপর যা ঘটবার তা ঘটল। শান্তি মৃত্যু কামনা করলেও মরল না। মৃত্যুর ওপর দিয়ে গেল। সঙ্গে নিয়ে গেল প্রণবকে।

এই আশ্চর্য কাণ্ড কী করে ঘটল আমি তার বিস্তৃত বিবরণ দেব না। সেটা আমার পক্ষে রুচিকরও নয়, সুখকরও নয়। ও সব ব্যাপার আপনি নিজেই অনুমান করে নিতে পারবেন। ঘটনার পর ঘটনা সাজিয়ে ফাঁকে ফাঁকে তিনটি নরনারীর মনোবিশ্লেষণ দিয়ে আপনি শ'দেড়েক দুই পাতা দিব্যি পারবেন ভরে ফেলতে। বউ পালানোর গল্প তো আপনি আর কম লেখেননি। পড়েছেন আরও বেশী। দেশে বিদেশে ও কাহিনীর তো আর অভাব নেই। কিন্তু দেখেছেন কখনো? আমিও পড়েছি, শুনেছি কিন্তু দেখিনি। স্ত্রী কারো সঙ্গে পালিয়ে যাবার পর স্বামীর দশা যে কি রকম হয় কোনদিন তা চাক্ষুষ দেখা ছিল না। এবার হয়ে দেখলাম।

স্বামী পালিয়ে গেলে কি সন্ন্যাসী হয়ে গেলে তার স্ত্রীর ওপর সহানুভূতি দেখাবার লোক পাওয়া যায়। কিন্তু পলাতকার স্বামীকেও পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হয়। বন্ধুদের কাছ থেকে আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে নিজের অধস্তন কর্মচারীদের কাছ থেকেও পালাতে হয়। তার আর মুখ দেখাবার জো থাকে না। কারো সহানুভূতি পর্যন্ত অসহ্য হয়। কারণ বন্ধুদের সমবেদনার তলায় যে চাপা বিদ্রূপ আর পরিহাস লুকিয়ে আছে তা কি আব তার টের পেতে বাকি থাকে? কুলের কালি দেখা যায় না, কিন্তু স্বামীর মুখের কালি সকলেরই চোখে পড়ে।

প্রথমে ভাবলাম সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে কোথাও চলে যাই। না দাদা বউদির কাছে নয়, এ মুখ নিয়ে তাঁদের সামনে দাঁড়াতে পারব না। অন্য কোথাও গিয়ে কিছু দিন পালিয়ে থাকতে হবে।

কিন্তু বেরোবার জো রইল না।

আমার শাশুড়ী এসে আমার সামনে কেঁদে পড়লেন, 'বাবা, তুমি আমাদের ছেড়ে যেতে পারবে না।' তাঁর সেই কান্নায় গলবার মত মনের অবস্থা আমার নয়। তবু বিরক্তি চেপে শান্তভাবেই বললাম, 'আমি তো আর একেবারে চলে যাচ্ছিনে।'

তিনি বললেন, 'না, এখন তোমার কোথাও যাওয়া হবে না। এই অবস্থায় আমি তোমাকে কিছুতেই ছেড়ে দিতে পারি না। যে মুখপুড়ী গেছে সে তার কপাল নিয়ে গেছে। তার সব পুড়ুক, সব ছারখার হয়ে যাক। তার কুষ্ঠ হোক, মহারোগ হোক তার। কিন্তু তোমার মনের যা গতিক তাতে তোমাকে তো ছাড়তে পারি না। তোমার জীবনের যে অনেক দাম।'

তাঁর চোখের জল আমার কাছে নির্মল বলে মনে হল। মাতৃস্নেহের স্বাদ

পেলাম তাঁর কথায়, ব্যবহারে। সেই মুহূর্তে ওইটুকু আশ্রয়ই বা আমার আর কোথায় জুটত ?

শুধু তিনিই নন, সুধারা তিন বোনেও এসে আমাকে ঘিরে ধরল।

সুধা বলল, 'অতুলদা, আপনি যেতে পারবেন না। একজনের অকৃতজ্ঞতা, একজনের পাপের শাস্তি আপনি আমাদের সবাইর ওপর চাপিয়ে দেবেন কেন ?'

ওরা তিনজনে এখনো কলেজের ছাত্রী। এখনো কেউই রোজগার করে না। ওরা কি আমাকে শুধু সেই ভয়েই ধরে রাখতে চায় ? সেই অনাহারের ভয়ে ?

কিন্তু ওদের দিদির কাছ থেকে অত বড় ঘা খেয়েও আমি ওদের অতখানি অবিশ্বাস করতে পারলাম না। আর তা না করে তৃপ্তিই পেলাম। সত্যিই তো এতদিন ধরে ওদের কাছ থেকেও তো কম শ্রদ্ধাপ্রীতি পাইনি, কম সেবাশুশ্রূষা নিইনি।

আমি কোথাও গেলাম না। শুধু অফিস আর বাড়ি আলাদা করে দিলাম। নতুন একটা ফ্ল্যাটে এনে তুললাম ওদের।

অবিশ্বাসিনী স্ত্রীর মা আর বোনেরা আমার অন্নাশ্রিত হয়েই রইল। আমি থাকতে চাইলাম তাদের হৃদয়ের আশ্রয়ে।

আশ্চর্য, শান্তির মুখের আদল ওদের সব কটির মুখে। একই রকমের গলা, একই রকমের উচ্চারণের ভঙ্গি। হাঁটা চলার ধরণও একই রকম। সেই একজনের প্রতিচ্ছায়া আমি ওদের প্রত্যেকের মধ্যে দেখতে পেলাম, যে আমাকে সব দিয়েছিল, আবার সব কেড়ে নিয়েছে।

বন্ধুবান্ধব কেউ এসে শান্তির কথা জিজ্ঞাসা করলে তার মা আর বোনেরা সবাই বলে দেয় সে মরে গেছে। হঠাৎ হার্ট ফেল করে মরে গেছে। হৃদয়ের পরীক্ষায় সে ফেল করেছে না পাস করেছে কে জানে ? বোধহয় পাসই করেছে। ফেল করবার দুর্ভাগ্য একা আমার।

ওরা বলে সে মরে গেছে। কিন্তু স্মৃতি কি অত সহজে মরে ? জ্বালা কি অত অল্পে জুড়োয় ?

আমার দগ্ধ ঘায়ে প্রলেপ দেওয়ার জন্যে ওদের কিন্তু চেষ্টার ত্রুটি নেই।

ইলেকট্রিক ফ্যান আছে, তালপাখার হাওয়ার আর দরকার হয় না। রাঁধুনী আছে, হাত পুড়িয়ে কাউকে আর রাঁধতে হয় না। কিন্তু খাওয়ার কাছে আমার শাশুড়ী এসে রোজ বসেন। শ্যালিকারা আমার ঘর আর টেবিল গুছিয়ে দেয়, ফুলদানি ফুলে ভরে রাখে, সন্ধ্যায় ফিরে এলে কাছে বসে গল্প করে।

সবাই আছে শুধু একজন নেই। সে মরে যায়নি, সরে গেছে।

দিদির নাম ওরা কেউ মুখেও আনে না। সুধার রাগ সবচেয়ে বেশী। কারণ শাস্তি তো শুধু আমাকেই ঠকিয়ে যায়নি, ওকেও বঞ্চিত করে গেছে।

বছর ঘুরে এল। আমার শাশুড়ী সেদিন রাত্রে আমার ঘরে এসে বসলেন। আমার স্বাস্থ্যের কথা জিজ্ঞাসা করলেন, কারবারের কথা জানতে চাইলেন। আরও কিছুক্ষণ ভূমিকার পর বললেন, 'ওদের তো একটি একটি করে এবার পার করা দরকার।'

আমি বললাম, 'আমারও তাই ইচ্ছা। সুধা বলে এম এ না পাস করে ও বিয়ে করবে না। চিরকুমারী থেকে দিদির পাপে প্রায়শ্চিত্ত করবে। সঙ্গে সঙ্গে তৃপ্তি আর দীপ্তিও নাকি সেই পণ করেছে। যত সব ছেলেমানুষি।'

শাশুড়ী বললেন, 'ছেলেমানুষি ছাড়া কি। কিন্তু এরই মধ্যে অনেকে অনেক কথা বলতে শুরু করেছে। এভাবে থাকলে ওদের তিনজনের নামেই বদনাম রটবে। কারোরই বিয়ে হবে না। তার চেয়ে বরং সুধাকে—।'

আমি ধমক দিয়ে বললাম, 'ছিঃ কী বলছেন আপনি।' শাশুড়ী তখনকার মত চুপ করে গেলেন।

শুয়ে শুয়ে অন্ধকারে আমি নিজের মনেই হাসলাম। মৃতা স্ত্রীর বোনকে বিয়ে করার রেওয়াজ আছে। কিন্তু যে স্ত্রী ঘর ছেড়ে গেছে তার বোনকে নিয়ে ফের ঘর বাঁধবার সাধ থাকলেও সাহস আছে কার? একই দুবার রক্তের ধারা তো তারও শিরায়।

পরদিন সুধা কলেজে বেরোচ্ছিল আমি ওকে ডেকে হেসে বললাম, 'আরে, শুনেছ নাকি তোমার মার কথা? তিনি তোমাকে তোমার দিদির আসন পাকাপাকিভাবে দখল করতে বলছেন। তার আর ফিরে আসার লক্ষণ নেই।'

আমি কথাটা হেসেই বলেছিলাম। স্ত্রীর বোনের সঙ্গে এ সব রসিকতা কে না করে। আগেও তো কত করেছি। সুধা কিন্তু হাসল না। সে যেন হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল। মুখখানা একেবারে শ্বেতপাথরের মূর্তির মুখ।

সুধা বলল, 'আপনি তাও পারেন।'

তারপর মুখ ফিরিয়ে জুতোর শব্দ তুলে চলে গেল।

কেন জানি না, আমার হাত দুটি আপনিই মুষ্টিবদ্ধ হল। বাঁধানো দু পাটি দাঁত আক্রমণ করল পরস্পরকে। আমি নিজের মনেই বললাম, পারি বই কি,

আমি সব পারি। অবাধ্য একগুঁয়ে মেয়ে, ইচ্ছা করলে আমি না পারি কি? যে ঘা আমি খেয়েছি তার চতুর্গুণ কি আমি ফিরিয়ে দিতে পারি না?

কিন্তু খানিকক্ষণ বাদেই আমার কাণ্ডজ্ঞান ফিরে এল। ধিক্কার দিলাম নিজেকে, ছি ছি ছি। ছি ছি ছি! গাড়িতে করে ডেয়ারির কাজ দেখতে চলে গেলাম।

ফিরে এলাম অনেক রাত্রে। দেখি সুধা তখনো জেগে আছে। আমার সঙ্গে গোপন কথা বলবে বলে।

সেই রাত্রে আমার ঘরে একা চলে এল সুধা। গম্ভীর, শান্ত মুখ।

মৃদুস্বরে বলল, 'অতুলদা, আপনি কি রাগ করেছেন?'

আমি বললাম, 'না না, রাগ করব কেন।'

সুধা বলল, 'আমি বড়ই দুর্ব্যবহার করেছি। দিদি যা করে গেছে সে অন্যায় তো কিছুতেই মুছবে না। এর পর আমরাও যদি—। ছি ছি ছি। আমাকে মাপ করুন অতুলদা।'

সুধা আমার পায়ের কাছে বসে পড়ল।

আমি বললাম, 'মাপ করবার কি আছে। তুমি তো কোন দোষ করনি, শুধু বুঝতে ভুল করেছ। আমি তোমাকে ঠাট্টা করছিলাম সুধা। সেটুকু করবার অধিকারও কি আমার নেই?'

বলে আমি ওর হাত ধরে তুলতে গেলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে সে তার হাতখানাকে সরিয়ে নিল। যে সুধাকে আমি বেণী ধরে টেনেছি, হাত ধরে টেনেছি, গাল টিপে দিয়েছি, আজ সে আমার সামান্য স্নেহস্পর্শটুকু সহ্য করতে পারে না, আমি আজ এতই অস্পৃশ্য। এত বড় স্পর্ধা এত দুঃসাহস ওর। আমি যদি ওকে এই মুহূর্তে বুকে তুলে নিই, ও কী করতে পারে।

কিন্তু আমি কিছুই করলাম না। শুধু একমুহূর্ত সময় নিয়ে বললাম, 'আমি তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করছিলাম।'

সুধা বলল, 'কিন্তু মা যা বলেছেন, তাই হয়তো ঠিক। আপনি যদি তাই চান, আমার—আমার কোন আপত্তি নেই।'

বলে মুখ নিচু করল সুধা। জানি না হাসল কিনা।

আমি হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠে বললাম, 'আমি কাউকে চাই না, তোমাদের কাউকে চাই না। চলে যাও এ-ঘর থেকে।'

সুইচ অফ করে দিয়ে আমি শুয়ে পড়লাম। সুধার ব্যবহারের কথা ভেবে নিজের মনেই হাসলাম। আমাকে কী ভেবেছে ওরা?

আমি কি বকরাক্ষস যে ওরা একটির পর একটি পালা করে আত্মদান করবে? একবার তো এক ভীমের হাতে হত হয়েছি, আর কতবার নিহত হব?

তার পরদিন সব স্বাভাবিক হয়ে গেল। আমাদের চালচলন কথাবার্তা শান্ত সংযত ঠিক আগের মত।

ইতিমধ্যে আমি আরো কয়েকবার চলে যেতে চেয়েছিলাম। বলেছিলাম, তোমরা তো আর নাবালিকা নও। নিজেরাই বেশ থাকতে পারবে। আমি আলাদা জায়গায় গিয়ে থাকি। খরচপত্রের জন্যে ভেব না। তা যেমন আসছে, তেমনি আসবে।

সুধা বলল, 'অতুলদা, আপনি একথা মুখে আনছেন কি করে? আপনার চেয়ে আপনার টাকাটাই কি বড়? আপনি নিশ্চয়ই সেদিনের রাগ ভুলতে পারেননি।'

ওর চোখ দুটি ছলছল করে উঠেছিল।

ও-চোখ আমি আগেও দেখেছি। সেই জল। তারপর প্রচণ্ড জ্বালা।

সুধা এম এ পাস করেছে। কিন্তু বিয়ে করেনি।

তৃপ্তি দীপ্তিও ইউনিভার্সিটিতে ঢুকল। সব খরচ আমিই চালাচ্ছি। তার বদলে ওদের সেবাশুশ্রূষা আর কৃতজ্ঞতা পাচ্ছি।

সুধার মা তাঁর সেই প্রস্তাব তুলে নেননি। সুধাও আরো দু একবার বলেছে তার কোন আপত্তি নেই।

আমি যদি চাই তা হলেই পাই।

কিন্তু সে পাওয়ার মানে যে কী তা কি আর আমি জানিনে? আমি আর চাইব কোন ভরসায়?

মুখেও বলি, নিজের মনেও বলি, চাইনে চাইনে চাইনে। এই জীবনের কাছ থেকে আমি আর কিছু চাইনে। আমার চাইতে নেই।

আমি দিন রাত কাজকর্মে ডুবে থাকি। বিশেষ করে শহরের বাইরেই আমার বেশি সময় কাটে। আমি সেখানেই শান্তি পাই। সেই কাঁচা ঘাস, সাদা দুধ আর সবুজ গাছপালার রাজ্যে আমি মাঝে মাঝে দু চোখ মেলে দিয়ে বসে থাকি।

কিন্তু সেই চোখই যদি একমাত্র চোখ হত, তাহলে আর কোন দুঃখ ছিল না।

ওরা তিনজন সুধা তৃপ্তি দীপ্তিরাও কেউ থেমে নেই। তিন সমান্তরাল রেখায় তিনটি জীবন ধারা ছুটে চলেছে। মাঝে মাঝে আমি সেদিকেও তাকাই।

একজনের চলে যাওয়ায় লজ্জাকে ওরা ভুলেছে, দুঃখকে মনে করে রাখেনি। নিজেদের কৃতিত্ব দিয়ে গৌরব আর গর্ব দিয়ে ওরাও যার যার নিজের স্বতন্ত্র পৃথিবীকে গড়ে নিচ্ছে। দিনের পর দিন ওদের গুণগ্রাহী বন্ধুদের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। আমি এক একদিন চেয়ে চেয়ে দেখি। তারা আসে যায়, হাসে, ঠাট্টা-তামাসা করে কিন্তু আমি হঠাৎ ওদের মধ্যে গিয়ে পড়লেই ওরা যেন কেমন সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। সুর কেটে যায়, তাল ভঙ্গ হয়। আমি কি এতই অপয়া? আমাকে দেখলেই কি ওদের সব কথা মনে পড়ে? সব ব্যথা নতুন হয়?

বন্ধুদের ফেলে ওরা সঙ্গে সঙ্গে উঠে আসে।

সুধা বলে, 'অতুলদা, আপনি কদিন ধরে কাসছেন। একটা ওষুধটষুধ খান।'

আমি বলি, 'ভয় পেয়ো না। সামান্য কাসি। টি বি নয়।' সঙ্গে সঙ্গে সুধার হাসি মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে যায়।

আমি নিজেও বড় অপ্রস্তুত হয়ে পড়ি।

তৃপ্তি বলে, 'আপনার খাবারটা এখন এনে দিই অতুলদা।'

আমি ব্যস্ত হয়ে বলি, 'না না, এখন থাক।'

দীপ্তি বলে, 'অন্তত এক কাপ দুধ খেয়ে যান।'

আমি বলি, 'তোমরা খাও। গোয়ালা কি আর দুধ খায়?'

ওরা স্তব্ধ হয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। তিনটি তরুণীর মূর্তি। শ্বেতপাথর দিয়ে গড়া। তিনটি চঞ্চল ঝরণা হঠাৎ যেন এক প্রচণ্ড শাপে বরফের স্তূপ হয়ে রয়েছে।

আমি তো তা চাইনি।

আমি চাইনে ওরা আমার চোখের দিকে চেয়ে ভয় পাক, আমি চাইনে আমার মুখের কথায় ওদের মুখের হাসি শুকিয়ে যাক।

আমি ওদের কাছে দুর্ভাগ্য আর দুঃস্বপ্নের প্রতীক হয়ে থাকতে চাইনে।

তবু ওরা আমার চোখে কী দেখে ওরাই জানে।

সহযাত্রিণী

আজও বাসে মেয়েটির সঙ্গে সুব্রতর দেখা হয়ে গেল। ঠিক দেখা হওয়া বলা চলে না, দেখল সুব্রত। একতরফা দেখল। ও তো আর কোনদিকে চোখ তুলে তাকায় না। লেডীজ সীটে জানালার ধারে নির্দিষ্ট জায়গাটিতে বসে চোখের সামনে বই কি মাসিক পত্র-টত্র একখানি খুলে ধরে। শীতের দিনে জাম্পার-টাম্পার কিছু একটা বোনে। এইভাবে সারাটা পথ কিছু না দেখে না শুনে কারো দিকে না তাকিয়ে ও একেবারে অফিসের সামনে গিয়ে নামে। একটু এগিয়ে গিয়ে স্ট্যাণ্ড থেকে ওঠে বলে ওই জায়গাটি ওর বেশি হাতছাড়া হয় না। সীটটি যেন ওর রিজার্ভ করা আছে।

প্রায়ই দেখা হয় সুব্রতর সঙ্গে, প্রায়ই দেখা হয়। দেখা তো হবেই। এই বাসটা তারও অফিসের বাস। এর পরের বাসে গেলে তাকে লেট হতে হয়। যেদিন ওকে দেখে না সুব্রত সেদিন কেমন যেন একটু অস্বস্তি বোধ করে। মনে মনে ভাবে আজ কি কামাই করল, অসুখ বিসুখ হল ? না কি অন্য বাসে চলে গেল। আবার এই একতরফা দেখার মধ্যেও অস্বস্তি বড় কম নেই। বিশেষ করে কোন চেনা মেয়েকে যদি এইভাবে দূর থেকে দেখতে হয়, কোন পরিচিতা মেয়ে যদি এমন করে সম্পূর্ণ অপরিচিতা হয়ে যায়। তাহলে তার দিকে চোখ পড়লে নিজেরই সম্ভ্রমবোধে লাগে, একটু অপমানের খোঁচা মনে গিয়ে পৌঁছায়। সুব্রত চেষ্টা করে, না দেখবার না তাকাবার। বেশির ভাগ দিনই সফল হয়। ট্রামে বাসে সে অবশ্য বই কি কাগজ পড়াটা পছন্দ করে না। তার মধ্যে একটু যেন লোক-দেখানো অধ্যয়নশীলতা আছে! সে যে অফিসে কি বাড়িতে খুবই কর্মব্যস্ত এই কথাটি ওই অভ্যাসের মধ্যে উচ্চারিত হয়। আসলে অত ব্যস্ততা সুব্রতর নেই। ইচ্ছা করলে সে বাড়িতে পড়বার সময় পায়। কারো সঙ্গে বাজার দর খেলার মাঠ কি রাজনীতির বাম দক্ষিণ পন্থা নিয়ে ট্রামে-বাসে আলোচনা করতেও তার রুচি হয় না। চেনাপরিচিত কেউ এসে পাশে বসলে কি কেউ পাশে বসতে দিলে তার সঙ্গে বড় জোর কুশল বিনিময়টুকু চলে। তারপর তাকে নীরব হতে দেখে সঙ্গীকেও চুপ করতে হয়। তাই এক-হিসেবে ওই মেয়েটির মত সুব্রত বোসও বালিগঞ্জ থেকে ডালহৌসী স্কোয়ার পর্যন্ত এই দীর্ঘ পথ নিঃসঙ্গভাবে

যায় আসে। কিন্তু মন কি সবদিন অতখানি অবিচল, নির্বিকল্প আর সঙ্গহীন থাকে।

ওই মেয়েটি—ওই শ্যামলী দত্তের সঙ্গে বছর পাঁচেক আগে এই বাসেই একদিন আলাপ হয়েছিল। তখন দামী শাড়ী ছিল ওর পরনে। হাতের আংটিতে কানের ফুলে দামী পাথর বসানো ছিল। ও যে ধনীর ঘরের মেয়ে তা অতি উচ্চারিত না হলেও ওর চেহারায় ওর বসবার ভঙ্গিতে বোঝা যাচ্ছিল। মুখের কমনীয় কান্তিতে সুখ আর স্বাচ্ছন্দ্য লাবণ্যের মতই মিশে ছিল।

এখন অবশ্য সে অবস্থা ওদের আর নেই। অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সুখ আর দুঃখ গাড়ির চাকার মত ঘোরে ওপর নিচ করে, একথা ওদের বেলায় বড় বেশিরকম খেটে গেছে। আজ আর সেই দামী দামী শাড়ি-গয়না নেই। সাধারণ একখানা তাঁতের শাড়ি পরেই বেরিয়েছে শ্যামলী। এক হাতে ঘড়ি আর এক হাতে একটি বালা পরেছে আর কোথাও কোন ভূষণ রাখে নি। চেহারার মধ্যেও কেমন যেন একটু শুষ্কতা এসে গেছে। সে কি শুধু পাঁচ বছর বয়স বেড়েছে বলেই? অবশ্য সেই সঙ্গে ওর চেহারার তীক্ষ্ণতাও বেড়েছে। বাইরের প্রতিকূল পৃথিবীর সঙ্গে বেশিরকম যুঝতে হলে মুখ চোখের যে তীব্রতা বাড়ে সেই তীব্রতা এসেছে ওর শরীরে। হয়তো বা মনেও। মুখ ত মনেরই প্রতিচ্ছবি।

তখনকার সঙ্গে এখনকার তুলনটা বড় চোখে পড়ে, বড় বেশিরকম মনে হয় সুব্রতর। হওয়াটা যদিও উচিত নয়, অশোভনও। বাসভরতি এতগুলি যাত্রীর আর কারোরই বোধহয় সে সব দিনের কথা এমন করে মনে পড়ে না। আর সবাই সে কথা ভুলে গিয়ে বেঁচে গেছে। শহরের জীবনের কালস্রোত, ঘটনার স্রোত বড় প্রখর। সেই স্রোতে কে কবে হাবুডুবু খেয়েছে, কে কোথায় তলিয়ে গেছে, সে কথা বেশিদিন কে আর মনে করে রাখে। এমন কি পাড়াপড়শীতেও রাখে না। কিন্তু আশ্চর্য, সুব্রত অমন করে ব্যাপারটা ভুলে যেতে পারেনি। আর ওই শ্যামলী—সেও নিশ্চয়ই মনে করে রেখেছে। মনে রেখেছে বলেই সুব্রতর দিকে ও তাকায় না। বাসে ওঠা নামার সময় কি পথে-টথে কোথাও দেখা হয়ে গেলে, চোখে চোখ পড়লে মুখ নামিয়ে নেয়, কি ফিরিয়ে নেয়। চোখে কি ঠোঁটে একটুও হাসি ফোটে না। অথচ হাসলে ওকে কী চমৎকার দেখাত। পাতলা ঠোঁট, সুন্দর সুষম দাঁতের সারি। হাসলে এখনো নিশ্চয়ই ওকে সুন্দর দেখায়। সেবার এই বাসেই শ্যামলীর সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়েছিল সুব্রতর। সে

যথারীতি তার অফিসে বেরিয়েছিল। আর শ্যামলী যাচ্ছিল ইউনিভারসিটিতে। ওর হাতে ছিল সরু একটা নীল রঙের খাতা আর সেই সঙ্গে মোটা একখানা মনস্তত্ত্বের বই। সুব্রত যাচ্ছিল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, ও বসেছিল একটি লেডীজ সীটের আধখানায়। বাইরে টিপটিপ করে বৃষ্টি হচ্ছিল।

শ্যামলী আরো একটু সরে গিয়ে সুব্রতর দিকে চেয়ে বলেছিল, 'বসুন।'

কালো চোখের সেই তাকাবার ভঙ্গি বড় ভালো লেগেছিল সুব্রতর, গলাটুকু বড় মিষ্টি শুনিয়েছিল। অবশ্য এই ধ্বনিটুকু শুনবার কথা ছিল না, ও শুধু চোখের ইশারায় বসতে বললেই পারত। এমন কি না তাকিয়ে, কিছু না বলেও বসতে বলা যেত। কিন্তু যেজন্যেই হোক সেদিন ওর মনে প্রচুর দাক্ষিণ্য ছিল।

সুব্রত পাশে বসে ইংরেজীতে ধন্যবাদ জানিয়েছিল। চোখে আর একটু কৃতজ্ঞতা জানাতে গিয়ে দেখে, মুখখানা শুধু সুন্দরই নয়, চেনাও। চেনা মানে অনেকবার দেখা। এই পাড়ারই মেয়ে। দেখেছে পার্কে, লেকের ধারে, স্টেশনারি স্টোর্সের সামনে। আজ আরও কাছে বসে দেখা হল। সুব্রতর বিস্ময় দেখে মেয়েটি কি একটু হেসেছিল? যদি হেসে থাকে সে হাসি একটি চেনা মুখকে দেখতে পাওয়ার হাসি, যার সঙ্গে আলাপ ছিল না তার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার স্বাচ্ছন্দ্যের হাসি। সুব্রতর চেহারাও তো একেবারে না চেয়ে দেখবার মত নয়।

তবু সেদিন শুধু স্মিত দৃষ্টি আর বিস্মিত দৃষ্টির বিনিময়ই হয়েছিল। কথাবার্তা আর এগোয়নি। সুব্রত ইচ্ছা করলে যে আলাপকে আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে না পারত তা নয়, কিন্তু নাগরিক রীতিতে বাধত।

তারপর আরো কিছুদিন শুধু পথেটথেই দেখাশোনা হল। সেই হাসি আর দৃষ্টির বিনিময়। কিন্তু তা শুধু একটি নিমেষের মধ্যেই শেষ হয় না। আড়ালে এসে তার মাধুর্য যেন আরও বেড়ে যায়। কিসের একটা মৃদু অস্পষ্ট প্রত্যাশা ভবিষ্যৎকালের মধ্যে পথের রেখা এঁকে দিতে দিতে এগোতে থাকে।

ততদিনে মেয়েটি কোন্ বাড়িতে থাকে, কোন্ বাড়ি থেকে বেরোয় সুব্রত তা লক্ষ্য করে দেখেছে। ইঞ্জিনীয়ার আর কে দত্তের বাড়ি। দোতলা, দুগ্ধধবল রঙ। সামনে বাগান। তাতে অজস্র মরসুমী ফুল। বাঁদিকে গ্যারেজ আছে। যে গ্যারেজ প্রায় শূন্যই থাকত। অতি ব্যস্ত মিঃ দত্তকে নিয়ে গাড়ি সব সময় ঘোরাফেরা করত। তবু ওঁদের ওই গাড়িতে উঠবার একদিন সুযোগ হয়েছিল সুব্রতর। অনেকদিন বাদে এলিটে ইংরেজী ছবি দেখতে গিয়েছিল, একটি

বন্ধুর আসবার কথা ছিল। সে কথা রাখেনি। সেখানেও এই প্রতিবেশিনীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। নাটকের আগেই এই নাটকীয় ঘটনাটুকু ঘটে যাওয়ায় সুব্রত অতিমাত্রায় খুশী হয়েছিল। নিশ্চয়ই সে তা চেপে রাখতে পারে নি। শ্যামলীর সঙ্গে তার এক ছোট ভাই ছিল প্রণব। বছর পনের যোল বয়স। শ্যামলী যে কোন বন্ধুর সঙ্গে না এসে তার ভাইয়ের সঙ্গে এসেছে, তার জন্যে মনে মনে কৃতজ্ঞ হয়েছিল সুব্রত। ছবি আরম্ভ হওয়ার সামান্য দেরি ছিল। লবীতে বসে খানিকক্ষণ গল্প চলেছিল তিনজনের মধ্যে। সে গল্পের কোন মাথামুণ্ডু ছিল না। তবু সুব্রতর মনে হয়েছিল ভিতরে গিয়ে আর দরকার নেই। ভিতরে গিয়ে এর চেয়ে বেশী কী আর দেখবে, এর চেয়ে মধুরতর কী আর শুনবে। বিশেষ করে যখন পাশাপাশি বসা যাবে না, শ্যামলীদের টিকিটের নম্বর আর সুব্রতর টিকেটের নম্বরের মধ্যে যখন অনেক গাণিতিক ব্যবধান, আর সে টিকেট বদলে নেওয়ারও এখন উপায় নেই, তখন আর ভিতরে গিয়ে লাভ কি।

তবু তাদের ভিতরে যেতে হয়েছিল। শ্যামলী বলেছিল, 'বেরিয়ে এসে কিন্তু দাঁড়াবেন। এক সঙ্গে ফিরব।'

ছবিটা বাজে লাগছিল, বেরিয়ে আসবার জন্যেই বড় বেশি চঞ্চল হয়ে উঠেছিল সুব্রতর মন।

সেদিন বাসে কি ট্যাকসিতে আসতে হয়নি, শ্যামলীদের গাড়ি ছিল সঙ্গে। প্রণব বুদ্ধিমান ছেলে, দিদির পাশে না বসে ড্রাইভারের পাশে গিয়ে বসেছিল।

আর সারা পথ শ্যামলীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে আসতে পেরেছিল সুব্রত। ছবি শ্যামলীরও ভালো লাগে নি। কিন্তু এই যৌথযাত্রা যে, সব ক্ষতি পুষিয়ে দিয়েছে সে কথা অনুচ্চারিত থাকলেও অপ্রকাশিত ছিল না।

কথায় কথায় সুব্রত জিজ্ঞাসা করেছিল, 'সেদিন দেখলাম আপনি সেতার নিয়ে যাচ্ছেন। কতদিন প্র্যাকটিস করছেন?'

শ্যামলী বলেছিল, 'বছর খানেক হল।'

'এক বছর! আপনি তাহলে আমার চেয়ে সাত মাসের সিনিয়র।'

শ্যামলী হেসে বলেছিল, 'আপনারও এসব আছে বুঝি? কতদিন বাজাচ্ছেন?'

সুব্রত বলেছিল, 'বাজানো ওকে বলে না। অফিস থেকে ফিরে এসে যেদিন খেয়াল হয় একটু টুংটাং করি। নির্মলবাবু ধমকান। বলেন, 'আপনার মশাই একেবারেই মন নেই।'

শ্যামলী বলেছিল, 'নির্মলবাবু কে? নির্মল গুহঠাকুরতা?'

'হ্যাঁ। আপনি কী করে জানলেন?'

শ্যামলী বলেছিল, 'আমি যাঁর কাছে শিখি তিনি ওঁর বন্ধু। ইস্তাক হোসেন।'

সুব্রত বলেছিল, 'বাঃ চমৎকার তো। এক বন্ধুর ছাত্রী আর এক বন্ধুর ছাত্র, আমাদের মধ্যে তাহলে কী সম্পর্ক হল বলুন তো।'

শ্যামলী হেসে বলেছিল, 'আমি অত হিসেব করতে জানি নে। আপনি বসে বসে ভাবুন।'

ভাববার চেয়ে সেদিন নির্ভাবনায় কথা বলতে ভালো লাগছিল সুব্রতর। জিজ্ঞাসা করেছিল, 'আপনি কি খুব রেয়াজ করেন?'

শ্যামলী বলেছিল, 'কই আর তেমন করতে পারি। সেতার নিয়ে বসতে দেখলেই বাবা ধমকান। ভয় দেখিয়ে বলেন, তুই ফেল করবি। আগে পড়াশুনোটা সেরে নে, তারপর যা খুশি তাই করিস।'

'আপনি বুঝি আপনার বাবার খুব বাধ্য মেয়ে?'

'অবাধ্য হবার কি জো আছে? বাবা আমাকে বড্ড ভালোবাসেন। আমাকে ছাড়া ওঁর এক মুহূর্ত চলে না। এই নিয়ে পিন্টুদের কী হিংসে।'

এই বেসুরো প্রসঙ্গটা সুব্রত বেশিক্ষণ চলতে দেয়নি। তাড়াতাড়ি ফের রাগরাগিণীর প্রসঙ্গ এনে ফেলেছিল।

চৌরঙ্গী থেকে বালিগঞ্জের পথটা সেদিন বড়ই ছোট হয়ে গিয়েছিল। ভদ্রতা আছে শ্যামলীদের। লেক টেম্পল রোডে সুব্রতদের বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে তাকে নামিয়ে দিয়ে গিয়েছিল।

সুব্রত বলেছিল, 'ভিতরে আসবেন না?'

শ্যামলী বলেছিল, 'না না আজ থাক, আজ বড় রাত হয়ে গেছে। আর একদিন আসব। কিন্তু তার আগে আপনার একদিন আসা উচিত।'

সুব্রত বলেছিল, 'বেশ তো যাব। কিন্তু একটি শর্ত আছে। আপনার বাজনা শোনাবেন।'

শ্যামলী বলেছিল, 'ওরে বাবা। আগে শিখে নি, তারপরে শোনাব। ওসব শর্ত টর্ত থাকলে আপনাকে অনন্তকাল অপেক্ষা করতে হবে।'

'একেবারে অনন্তকাল! অমন করে হতাশ করবেন না। ধৈর্যের অমন শক্ত পরীক্ষা নেবেন না।'

শ্যামলী মৃদু হেসেছিল, কোন কথা বলেনি।

তারপর সুব্রতর আর ওদের বাড়িতে যাওয়া হল না। ঘটনা অন্যদিকে মোড় নিল। শ্যামলীর সঙ্গে আলাপ পরিচয়ের কথা সুব্রতর মা কী করে টের পেয়েছিলেন জানা যায় না। বোধ হয় কোন বিশ্বস্ত বন্ধু বিশ্বাসঘাতকতা করে থাকবে। তার অনেকদিন আগে থেকেই মা 'বিয়ে কর বিয়ে কর' বলে সুব্রতকে উত্যক্ত করে তুলছিলেন। বিয়ে করবে না এমন ধনুর্ভঙ্গ পণ তার ছিল না। কিন্তু যাকে দেখবে তাকেই ঘরে তুলবে অত উদারতার অভাব ছিল। ইনকাম ট্যাক্স অফিসার গ্রেডে চাকুরিটা পাকা সুব্রতর। পৈতৃক দোতলা বাড়িটির একাই উত্তরাধিকারী। বোনের বিয়ে বাবাই দিয়ে গেছেন। ছেলের ওপর কোন দায় চাপিয়ে যাননি। এমন নির্ঝঞ্ঝাট সংসার সুলভ নয়। তাই ভালো ভালো সম্বন্ধই আসছিল। অনূঢ়া তরুণী মেয়েদের যে পরিমাণ ফোটো জমেছিল তা দিয়ে এক প্রদর্শনী খোলা যেত। কিন্তু দেখে শুনে সুব্রতর তেমন আগ্রহ হচ্ছিল না।

মা কেবল ধমকাচ্ছিলেন, 'তুই কী চাস বলতো? অপ্সরী কিন্নরী না পটে আঁকা ছবি?'

সুব্রত বলেছিল, 'না পটে আঁকা দিয়ে কী হবে। যে হেঁটে চলে বেড়াতে পারবে, ঘরের কাজকর্মে তোমাকে সাহায্য করতে পারবে, সেবাশুশ্রূষা করতে পারবে, তেমন একজনকে আনা ভালো।'

কী করে মা দত্তদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন তিনিই জানেন। খবর পাঠালেন ভবানীপুরে সুব্রতর কাকাকে। বাবার জ্যেঠতুতো ভাই। আলাদা অন্ন হলেও প্রায়ই এসে খোঁজখবর নেন। এসব বিয়েচুড়োর ব্যাপারে যথেষ্ট উৎসাহ। কাকা এলেন, কাকীমা এলেন, খুড়তুতো বোন ইলা এল সঙ্গে। দল বল নিয়ে ওরা গিয়ে মেয়ে দেখে এলেন। সুব্রতকেও দলে টানবার চেষ্টা করেছিলেন কাকীমা কিন্তু সে রাজী হল না। ইলা বলল, 'দাদা আর কী দেখবে। দাদার তো অনেকবার দেখা মেয়ে।'

সুব্রত বলেছিল, 'কে বলল তোকে।'

ইলা বলেছিল, 'অনেক গুপ্তচর আছে আমাদের। তোমরা একসঙ্গে সিনেমা দেখেছ। ট্রামে বেড়িয়েছ, ট্যাক্সিতে বেড়িয়েছ, কারে বেড়িয়েছ এখন শুধু প্লেনে আর রকেটে ভ্রমণ বাকি।'

সুব্রত বলেছিল, 'বিয়ের পর তুই বড় মুখরা হয়েছিস।'

ইলা জবাব দিয়েছিল, 'তুমি ঠিক উল্টোটি হবে দাদা, আমিও আগেই বলে রাখলাম। উপযুক্ত হাতে পড়লে আচ্ছা জব্দ হবে।'

মেয়ে দেখে সবারই পছন্দ হয়ে গেল। সুব্রত আগেই বলে দিয়েছিল, 'মা, কোনরকম দাবিদাওয়ার কথা যেন তোলা না হয়। ওসব আমি পছন্দ করিনা।'

মা বললেন, 'বুঝেছি বাপু। আমাকে আর বেশি বলতে হবে না। দাবিদাওয়া তো ভালো, তোমার যা অবস্থা, ঘর থেকে টাকা খরচ করতে হলেও তুমি এখন রাজী আছ।'

ওপক্ষেরও ছেলে দেখে অপছন্দ হল না। শ্যামলীর মা বাবা দুজনেই এলেন চায়ের নিমন্ত্রণে। বাবা গুরুগম্ভীর রাশভারি মানুষ। খুবই ব্যস্ত। আধ-ঘণ্টার বেশি সময় দিতে পারলেন না। আধ কাপ চা খেলেন। ডায়বেটিস আছে বলে মিষ্টিটিষ্টি কিছু খেলেন না। ওই সময়টুকুর মধ্যেই জিজ্ঞাসা করে নিলেন, অফিসে সুব্রতর কতদিনের চাকরি, কী রকম প্রসপেক্ট, বাবার ওকালতি পেশা কেন নিল না সুব্রত, ব্যবসা ট্যবসার দিকে ঝোঁক আছে কিনা, কোন কোন কোম্পানীর শেয়ার কেনা আছে।

শ্যামলীর মা দোহারা চেহারার লজ্জাবতী মহিলা। তিনি সুব্রতর সঙ্গে প্রায় কোন কথাই বললেন না। একটু আড়ালে বসে মার সঙ্গে গল্প করলেন আর পানদোক্তা খেলেন।

ওঁরা চলে গেলে সুব্রত মাকে জিজ্ঞাসা করল, 'কী মনে হল মা। ইণ্টারভিউতে উতরে গিয়েছি তো?'

মা হেসে বললেন, 'আমার খোকার কি দুশ্চিন্তা! এত চিন্তা তো কলেজের পরীক্ষাগুলির সময় দেখিনি, চাকরির ইণ্টারভিউর সময়তেও দেখিনি। মনে তো হয় পাশ করেছ। চিন্তা তো ওঁদেরও আছে। অনেকগুলি ছেলেমেয়ে, দুটির বিয়ে দিয়েছেন। আরো দুটি বাকি। ছেলেও বুঝি গুটি তিনেক। সবই ছোট ছোট। শ্যামলীর মা বলছিলেন, ওঁদের হাতে আরো নাকি ভাল সম্বন্ধ ছিল। কিন্তু মেয়ে তার ভাইবোন বন্ধুদের কাছে যা বলেছে—।'

কী বলেছে সে কথাটুকু না বলে মা ফের আর একটু হাসলেন।

শুধু দিনক্ষণ ঠিক হওয়াই বাকী রইল। ওদের গুরুদেব গেছেন কাশীতে। তিনি ফিরে এলে পঞ্জিকা দেখবেন। হয় সামনের মাঘ ফাল্গুনে না হয় শ্যামলীর পরীক্ষার পর—।

কিন্তু শুভদিন আসবার আগেই অপ্রত্যাশিত অশুভ দিন এসে গেল। আর কে দত্তের বাড়িতে পুলিস এসে হানা দিল। তাঁর বিরুদ্ধে গুরুতর সব অভিযোগ। বিশ্বাসভঙ্গ, জালিয়াতি, প্রতারণা, ষড়যন্ত্র। সরকারী কণ্ট্রাক্ট নিয়ে যে সব কাজ তিনি করেছেন তাতে অনেক ফাঁকি ধরা পড়েছে। হিসাবের গরমিল হয়েছে লাখ খানেক টাকার।

সুব্রতর মা বললেন, 'কী বিশ্রী সব ব্যাপার বল তো।' সুব্রত গম্ভীরভাবে বলেছিল, 'বিশ্রী বইকি।'

মামলা চলল বছর তিনেক ধরে। প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্ট থেকে সেসনে, সেসন থেকে হাইকোর্টে। আপীলে সুবিধে হল না। কয়েকজনের গুরুতর রকমের শাস্তি হল। আর কে দত্ত পেলেন আড়াই বছরের আর আই।

সবাই স্তম্ভিত। এ কী ব্যাপার। অবশ্য অনেকে কানাঘুষো করতে লাগল, এ ব্যাপার নতুন নয়, এবারই ধরা পড়েছেন।

সুব্রতদের সঙ্গে তো তেমন আলাপ নেই। এই সব গোলমালের মধ্যে দেখা-সাক্ষাতের চেষ্টা করলে ওঁরা কীভাবে নেবেন বলা শক্ত। তবু গোড়ার দিকে একবার খোঁজ নিতে গিয়েছিল সুব্রত। গেটে বলেছিল, দেখা করবার হুকুম নেই। তখন ভিতরে যাচ্ছেন শুধু বড় বড় উকিল ব্যারিস্টার আর ওঁদের নিতান্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজন। সুব্রত তাঁদের মধ্যে পড়ে না।

শ্যামলীর নামটা মুখে আনি আনি করেও আনতে পারেনি। সংকোচ বোধ করেছে।

এই সব দুর্যোগের মধ্যে কোন শুভকাজের কথা উঠতেই পারে না। তবু পরোক্ষভাবে অস্ফুট স্বরে উঠেছিল। শ্যামলীর সম্পর্কিত এক মামা এসে বলেছিলেন, 'কথাবার্তা যখন ঠিক হয়েই আছে তখন একটা দিনটিন দেখে—। অবশ্য খরচপত্রের জন্যে ভাবনা নেই। মেয়ের বিয়ের টাকা ওঁরা আলাদা করে তুলে রেখেছেন।'

কিন্তু টাকাই তো সব নয়। এমন কি রূপবতী স্ত্রীও সব নয়। সামাজিক মানুষকে কুলশীল মানমর্যাদার কথাও ভাবতে হয়।

তাই প্রস্তাবটা আর এগোয় নি। সুব্রতর মা বলেছেন, 'অত ব্যস্ত হবার কী আছে। ওঁদের বিপদ আপদটা কাটুক তারপর সব দেখা যাবে। এই সব ঝামেলা ঝঞ্ঝাট অশান্তির মধ্যে কারোরই তো মনের অবস্থা—।'

বিপদ আপদ কাটেনি। কনভিকসনের ছ মাস পরেই মিঃ দত্ত হার্টফেল

করে মারা গেলেন। ব্লাড প্রেসার নাকি আগে থেকেই ছিল। অবশ্য তাঁর এই আকস্মিক মৃত্যু স্বাভাবিক কিনা তা নিয়েও বেশ কিছুদিন ধরে আলাপ আলোচনা আর গবেষণা হয়েছিল পাড়ায়।

তারপর আস্তে আস্তে সব থেমে গেল।

শোনা গেল ওদের গাড়িটা বিক্রি হয়ে গেছে। মামলার খরচ মেটাবার জন্যে সমস্ত সঞ্চয়ই শেষ হয়েছে। কে যেন বলল বাড়িটাও পুরোপুরি দায়মুক্ত নয়। সবই অবশ্য বাইরে থেকে শোনা। ওদের কারো সঙ্গেই আর দেখাসাক্ষাৎ হয় না সুব্রতর। শুধু সুব্রতর কেন তার জানাশুনা কারো সঙ্গেই হয় না। ওরা যেন ওই বাড়িখানির মধ্যেই শেষ আশ্রয় খুঁজে নিয়েছে। পাড়ার কাউকে ওরা ডাকে না, কারো বাড়িতেও ওরা যায় না। রাস্তায় কারো সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হলে নিজেরাই মুখ ফিরিয়ে চলে যায়।

সুব্রতর এক বন্ধু শিবতোষ ওদের বাড়ির উল্টোদিকে থাকে। শিবুদের বাড়ি থেকে সবই দেখা যায়। মানে আগে যেত। এখন আর যায় না। শিবু বলে, ওদের জানালা দরজা সব বন্ধ। যেন এক অবরুদ্ধ দুর্গ বানিয়ে রেখেছে। দুর্গই বটে।

একটি পার্শী পরিবার ওদের দোতলাটি ভাড়া নিলেন। শুধু বুড়োবুড়ি। আর কেউ নেই, আর কোন ঝামেলা নেই। বোধহয় এইরকমই ওরা চেয়েছিল। নিজেরা নেমে এসেছে একতলার দু-তিনখানা ঘরে। আর কে দত্তের আশ্রিতের সংখ্যা কম ছিল না। তারা সব বিদায় নিয়েছে। শুধু যাদের আর কোথাও যাবার যো নেই, তারাই আছে। পাঁচটি ছেলেমেয়ে আর তাদের মা। ভাইবোনদের মধ্যে শ্যামলীই এখন বড়।

শিবু বলত, মেয়েটা বড় টাচি হয়ে গেছে।

সুব্রত জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কী রকম?'

'কেউ সামান্য কিছু বললে ওর মুখ কালো হয়ে যায়, শক্ত হয়ে যায়। ওদের বাবার কোন দোষ ছিল বলে কেউ স্বীকার তো করেই না, বোধহয় বিশ্বাসও করে না। যারা ওদের বাবাকে সম্মান করতে পারবে না, তাদের সঙ্গে কথা বলতে পর্যন্ত ওরা অনিচ্ছুক। ফলে পাড়ায় ওদের কথা বলবার মত কেউ নেই।

নেই যে তা সুব্রত জানে।

শিবু বলে 'যাই বল, একটা গোটা পরিবার অদ্ভুত আর অস্বাভাবিক হয়ে গেল। একটা কমপ্লেক্স ঢুকে গেছে ওদের মধ্যে। কোত্থেকে—কার কোন

একটু কথা হাসি কি তাকাবার ধরণ কি অন্য কোন ব্যবহারের ভিতর দিয়ে কোন নির্মম বিদ্রূপ, উপহাস, শ্লেষ, অপমান শেলের মত ছুটে আসবে, ওরা যেন সেই ভয়েই সব সময় অস্থির। ওদের দিকে ভয়ে আমি তাকাই না। ভয়টা সংক্রামক, কী বলো? ওদের এই ভয়, আমাকে মাঝে মাঝে বড্ড ভয় পাইয়ে দেয়।'

সুব্রত নিজের ড্রয়িংরুমে বসে গম্ভীর হয়ে শোনে, সিগারেট টানে, বন্ধুর সিগারেট ধরিয়ে দেয়।

সিগারেটের ধোঁয়ায় শিবুর কবিত্বের উদ্রেক হয়, উপমা দিয়ে বলে, 'সারা বাড়িটা যেন এক শবাধার হয়ে রয়েছে।'

তারপর শিবুর বিশ্লেষণ আর খবর সরবরাহও একদিন থেমে যায়। ছুটিছাটার দিনে এসে সে অন্য কথা পাড়ে। ক্রিকেট, ফুটবল, সাহিত্য, সিনেমা রাজনীতি নানা বিষয়ে এই সবজান্তা বন্ধুটির উৎসাহ আছে। শুধু শিবুই নয়, রবিবারের সকালে আড্ডা দিতে আরো অনেকেই আসে। কেউ আর শ্যামলীদের কথা তোলে না। ওদের বাড়ির অত বড় মুখরোচক ঘটনা, ওদের অদ্ভুত জীবনযাত্রা সবই অতীতের, বহু কথিত জীর্ণ বস্তু। নতুন বিষয় আপনিই এসে পড়ে, পুরোন কাসুন্দি আপনিই চাপা পড়ে।

সবচেয়ে আশ্চর্য সুব্রত নিজেই সব ভুলে গেল। কবে কোন মেয়ের সঙ্গে তার ক'টি কথা হয়েছিল, কবে ভদ্রতা করে তাকে লিফট দিয়েছিল সে চিত্র চিরজীবন চোখের সামনে টাঙিয়ে রাখবার মত নয়। রাখতে চাইলেও রাখা যায় না।

তাই মা কাকীমা যখন বিয়ের জন্যে ফের পীড়াপীড়ি শুরু করলেন, সুব্রত একসময় রাজীও হয়ে গেল। নন্দিতাও স্বচ্ছল ঘরের মেয়ে, দেখতে সুশ্রী, গ্রাজুয়েট। রবীন্দ্রসঙ্গীত জানে।

নিমন্ত্রণের চিঠি বিলি করবার সময় মা একবার বলেছিলেন, 'আচ্ছা ওদের কি একখানা চিঠি—।'

সুব্রত মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'ওদের মানে?'

মা আরো অস্পষ্টভাবে, আরো দ্বিধাজড়িত গলায় বলেছিলেন, 'ওই ওদের কথা বলছি।'

সুব্রত ধমক দিয়ে বলেছিল, 'ছিঃ।'

তারপর কয়েকবার আর একটি মেয়ের কথা সুব্রতর মনে পড়েছিল।

সম্বন্ধের কথা উঠবার পরেও একদিন বাস স্টপে শ্যামলীর সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল সুব্রতর। সেদিন আর ভালো করে তাকাতে পারেনি, কথাও বলেনি, শুধু সলজ্জ ভঙ্গিতে একটু হেসে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল।

শ্যামলীর সঙ্গে সুব্রতর সেই শেষ শুভদৃষ্টি।

তারপর প্রায় বছরখানেক বাদে সুব্রত একদিন আবিষ্কার করল শ্যামলী তার সঙ্গে একই বাসে অফিসে যাচ্ছে। চেনা মেয়ে, পরিচিত মেয়ে। সহজ সৌজন্যে সুব্রত হাসি হাসি মুখে তার দিকে তাকিয়েছিল, কিন্তু সে হাসির বিনিময় তো মিললই না—শ্যামলী অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। নিজের বোকা বোকা সেই হাসিটুকু নিয়ে সুব্রত যে কী করবে ভেবে পেল না। প্রথমেই ভয় হল তার সেই নিরর্থক হাসি পাছে বাসের প্যাসেঞ্জারদের আর কেউ দেখে থাকে। কিন্তু ভয় পাওয়ার কিছু ছিল না। সেই মূঢ় হাসিটুকু ঠোঁটের ওপর ভেসে উঠবার সঙ্গে সঙ্গেই মিলিয়ে গেছে। তারপর আর ওর দিকে তাকিয়ে কোনদিন হাসেনি সুব্রত। হাসবার সাহস পায়নি এমন কি সরাসরি তাকাবার সাহসও তার নেই। কিসের একটা অপরাধবোধ তাকে ভিতরে ভিতরে দুর্বল করে দিয়েছে।

তবু চোখ দুটি সব সময় নিষেধ মানে না। আশ্চর্য নির্লজ্জতা। অপমানের ভয় নেই, সম্ভ্রম হারাবার ভয় নেই দুটি লজ্জাহীন চোখের।

একখানি বিমুখ মুখের দিকেও তারা মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকায়। তীব্রতায়, সংগ্রামে, সংঘাতে ও মুখ আরো এত সুন্দর হল কী করে!

শ্যামলী চাকরি করবার জন্যে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে বটে, কিন্তু এক দুর্ভেদ্য অদৃশ্য বর্ম নিজের চারিদিকে এঁটে নিয়েছে। কারো কোন চোখের দৃষ্টিই আর ওকে গিয়ে বিঁধবে না। সে দৃষ্টি সহানুভূতিরই হোক, অনুকম্পারই হোক, করুণারই হোক, কামনারই হোক। সুব্রতর একমাত্র সান্ত্বনা, ও শুধু তাকেই অস্বীকার করছে না, আশেপাশের কাউকেই কোন কিছুকেই স্বীকৃতি দেবার ওর গরজ নেই।

দেখেশুনে সুব্রত ভাবে, এই ক' বছরের মধ্যে কত বিচিত্র বিস্ময়কর বড় বড় ঘটনাই তো ঘটে গেল, এর পর ছোট একটু সামান্য কোন ঘটনা কি ঘটতে পারে না যাতে তাদের মধ্যে ফের সহজ প্রতিবেশীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। প্রেম নয়, ভালবাসা নয়, এমন কি বন্ধুত্বও নয়। একই বাসে যেতে হলে দুটি

পরিচিত নারী পুরুষের মধ্যে যে সাধারণ স্বীকৃতিটুকু দরকার; শুধু সেইটুকু। যে মেয়ে জীবনযাত্রার সঙ্গিনী হতে পারত, সারাটা পথ তার সঙ্গে একই বাসে গিয়েও সে সহযাত্রিণী হয় না। সুব্রত চেষ্টা করেও তা করতে পারে না। নিজের এই ব্যর্থতায় সুব্রত কোনদিন ওর ওপর রাগ করে, কোনদিন বা নিজের ওপর। পর মুহূর্তে এই নিষ্ফল অসহায় আক্রোশের জন্যে তার লজ্জাও হয়। কোনদিন বা সুব্রত ভাবে যখন ওর সিঁথিতেও সিঁদুর উঠবে, স্বচ্ছল সংসারে সুস্থ সুন্দর স্বামীর ভালবাসায় ধন্য হবে, সন্তানের মা হবে তখন—হয়তো তখন এই ঊষর ধূসর মরুভূমি ফের তার সেই শ্যামলী হয়ে উঠলেও উঠতে পারে।

শুভার্থী

হেমাঙ্গ রায়ের বৈঠকখানায় রবিবারের আড্ডা জমেছিল। জনতিনেক বন্ধু এসে জমায়েত হয়েছিলেন, আরও দুএকজন আসবেন এমন প্রত্যাশা ছিল। যুবাদের নয় প্রৌঢ়দের আড্ডা। ঘর সংসার, স্ত্রীপুত্র, নাতি নাতনির কথা প্রায়ই উঠে পড়ছিল। সেই সঙ্গে চোখের ছানি, দাঁতের যন্ত্রণা, ব্লাড প্রেসার, থ্রম্বসিসের প্রসঙ্গকেও পথ ছেড়ে দিতে হয়েছিল। আগন্তুকদের মধ্যে কেমিস্ট্রির প্রফেসার ভবেশ দত্তগুপ্ত, ইঞ্জিনীয়ার শীতাংশু চৌধুরী এবং ভেটেরিনারি কলেজের রিটায়ার্ড সার্জন শৈলেন সেহানবীশ তাঁদের পদমর্যাদায় এবং হেমাঙ্গের সঙ্গে বহুদিনের সৌহার্দ্যের জোরে ঘরের দুটো ইজিচেয়ার আর তক্তপোশের তাকিয়াটা দখল করে বসেছিলেন। এছাড়াও আরো দুচারজন ছিলেন। তবে তাঁদের কথা এখানে উল্লেখ না করলেও চলবে। তাঁরা নীরব শ্রোতা, কি বিশেষ কেউ-না-গোছের ব্যক্তি। বলবার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তাঁরা কোন সুযোগ পাচ্ছিলেন না। হেমাঙ্গবাবুর তিন বন্ধু বিশেষ করে অধ্যাপক আর শল্যচিকিৎসক আসর মাত করে রেখেছেন।

অতিথিবৎসল বন্ধু হিসাবে হেমাঙ্গ রায়ের সুনাম আছে। দামি চা এবং গরম সিঙ্গাড়া তিনি অকৃপণভাবেই বিলিয়ে যাচ্ছিলেন এবং বন্ধুদের কথা বলতে দিয়ে নিজে মৃদু ও মিতভাষীর ভূমিকা নিয়েছিলেন।

বউবাজার অঞ্চলে হেমাঙ্গবাবুর ছোট একটি প্রেস আছে। তার আয়ে সংসার মোটামুটি চলে যায়। বন্ধুদের ধারণা, বিনা আয়েও চলত। কারণ হেমাঙ্গের সংসার খুবই সংক্ষিপ্ত। বছর দশেক হল স্ত্রী মারা গেছেন। ছেলে মেয়ে দুজনেরই বিয়ে হয়ে গেছে। মেয়ের শ্বশুরবাড়ি এলাহাবাদে, ছেলের কর্মস্থল দিল্লীর সেক্রেটারিয়েটে। কলকাতা ছেড়ে দুজনের কারো কাছেই থাকেন না হেমাঙ্গবাবু। পুরোন চাকর শম্ভুই তাঁর এখানে সহায় ও সম্বল।

হেমাঙ্গবাবু আদর্শবাদী মানুষ। পান বিড়ি সিগারেট খান না। বিয়ে শ্রাদ্ধ অন্নপ্রাশন কি জন্মদিনের নিমন্ত্রণ রাখতে যান, সেখানে গিয়ে বাড়ির লোকের মত অভ্যাগতদের আপ্যায়ন করেন কি দরকার হলে পোলাও মাংস রসগোল্লা সন্দেশ পরিবেশনও করেন, কিন্তু হাজার মাথা কাটলেও এক কাপ

চা ছাড়া কিছু মুখে দেন না। পঞ্চাশের ওপারে পৌঁছেও হেমাঙ্গবাবু নিয়মিত ডন বৈঠক করেন, অবশ্য কাউকে দেখিয়ে নয়, এমন কি শম্ভুরও চোখের আড়ালে। নিমের দাঁতন দিয়ে দাঁত যেমন কাউকে দেখিয়ে মাজেন না, তেমনি অনেক নিত্যকর্মই তিনি গোপনে সারতে ভালোবাসেন। বন্ধুদের ধারণা, এই সংযমের জন্যেই উত্তর পঞ্চাশে হেমাঙ্গের দেহে ভুঁড়ির আভাস দেখা যায় না। দাঁত আর চোখও তিনি অক্ষত রাখতে পেরেছেন। হেমাঙ্গ সুপুরুষ নন, তবে স্বাস্থ্য ভালো। নিজের বয়সকে অন্তত বছর দশেক কমিয়ে বলতে পারেন, যদিও তা বলেন না। কারণ হেমাঙ্গ যেমন ছেলেবেলায় পড়া স্বাস্থ্যসুধা শুধু মুখস্থ করেননি, তাকে অনুসরণ করেছেন, তেমনি বর্ণপরিচয়ের প্রথম আর দ্বিতীয় ভাগে মুদ্রিত নীতিশাস্ত্রের মূল আর মোট কথাগুলিও অসংশয়ে মেনে নিয়েছেন। বন্ধুরা এই নিয়ে আগে আগে হেমাঙ্গকে ঠাট্টা করেছেন, এখন গোপনে গোপনে ঈর্ষা করেন। ভবেশবাবু বলেন, 'হেমাঙ্গের অর্ধাঙ্গ নেই, তবু কী সুখে আছে তাই দেখ।'

শৈলেনবাবু বলেন, 'নেই বলেই আছে। দেখ না বিধবারা কিরকম স্বাস্থ্যবতী হয় আর বাঁচেও বহুদিন। আমাদের অর্ধেক খায় স্ত্রী, বাকি অর্ধেক পরস্ত্রী। আমাদের গজভুক্ত কপিত্থ না হয়ে কি জো আছে?'

এর আগে শৈলেনবাবু বলতেন, হেমাঙ্গ হিস্ট্রিতে এম এ পাশ করলেও আসলে ওর বিদ্যা দ্বিতীয় ভাগের বেশি এগোয়নি। ওর যে সুখ তা শিশুর সুখ, মূর্খের সুখ। ওর কেবল বয়সই বেড়েছে, অভিজ্ঞতা বাড়েনি। নাতিনাতনিকে শোনাবার মত একটি গল্পও জীবনে করতে পারবে না।

আজকাল আর অত জোরে হেমাঙ্গকে পরিহাস করতে পারেন না শৈলেনবাবু। ঠাট্টা বিদ্রূপের ধারটা কমে আসছে। বাড়ছে থ্রম্বসিসের ভয়। তবু শৈলেনবাবু এখনও সভায় পতিত্ব করেন। ভাঙলেও মচকান না।

আজকের তর্কটা উঠেছিল পতিতাবৃত্তি নিয়ে। ভারত সরকার আইন করে যে একে বন্ধ করেছেন, এতে ভালো হয়েছে কি হয়নি তাই নিয়ে ভবেশবাবু আর শৈলেনবাবুর মধ্যে জোর কথা কাটাকাটি চলছিল।

ভবেশবাবুর বক্তব্য, ইণ্ডিয়া গভর্নমেণ্ট যে দুতিনটা ভালো কাজ করেছেন তার মধ্যে একটি হ'ল এই প্রস্টিটিউশন নিষিদ্ধকরণ। এতে অধঃপতন থেকে পুরুষরাও বাঁচবে, মেয়েরাও বাঁচবে। এ জাতের জন্যে এই ধরনের মোহমুদ্গরই দরকার। যারা শত শত বছর ধরে পাঁজির শাসন মেনে এসেছে,

মনুর অনুশাসন মুখস্থ করেছে, রাতারাতি নিজেদের বুদ্ধি বিবেচনার ওপর তাদের ছেড়ে দিলে হয় কুফল ফলে, না হয় কোন ফলই ফলে না। আইন আর অর্ডিন্যান্সের গদা হাতে জাঁদরেল ডিক্টেটর এদেশের পক্ষে এখন দরকার। এই সব নাবালকদের মানুষ করতে হলে শাসনই একমাত্র পথ। আইন করে ছোট বড় সব কু-অভ্যাস বন্ধ করতে হবে। তবে আইনের প্রয়োগটা যেন যথাযথ হয়। নইলে সর্ষের মধ্যে ভূত ঢুকে বসে থাকবে। যেমন ঢুকে বসেছে ওষুধের মধ্যে জল, দুধের মধ্যে জল, চালের মধ্যে কাঁকর, জেলখাটা দেশসেবকের মধ্যে কামিনীকাঞ্চন আর পদাধিকারের লোভ। মুগুর নিয়ে শুধু মোহকে ভাঙলে হবে না, লোভকেও চুরমার করা চাই। ভবেশবাবুর দুঃখ এই যে, সরকার মদ্যপান আর লাম্পট্যকে যতখানি চোখ রাঙিয়েছেন, চুরি, জোচ্চুরি, রাহাজানি, শোষণকে ততখানি শায়েস্তা করবার দিকে ঝোঁকেননি। অথচ দ্বিতীয় শ্রেণীর অপরাধ বেশি ছাড়া কম গুরুতর নয়। তবু যতটুকু পাওয়া যায় ততটুকুই লাভ। পতিতাবৃত্তি নিষিদ্ধ করে সরকার যে সমাজের স্বাস্থ্য রক্ষা করবার চেষ্টা করেছেন, তাতেই ভবেশবাবু খুশি।

শৈলেনবাবু একটার পর একটা সিঙ্গাড়া চালাতে চালাতে বললেন, 'দুনিয়াটাকে তোমরা হেমাঙ্গের মতই বড় সহজ সরল করে দেখছ হে ভবেশ। দুনিয়াটা আর যাই হোক দ্বিতীয়ভাগের পাতা নয়। কি পুরুষ কি মেয়ে প্রত্যেকের মনেই বহুভোগের বাসনা প্রবল। এটা যুগযুগান্তরের সংস্কার। একে আইনের ভয় দেখিয়ে মেরে ফেলতে পারবে না। এইসব সাপ সাপিনীরা তাড়া খেয়ে ইঁদুরের গর্তে লুকোবে, তার ফল আরো খারাপ হবে। আইন করে বন্ধ কোরো না, শিখিয়ে পড়িয়ে বুঝিয়ে শুনিয়ে শোধরাও। যারা দেহ বিক্রি করে তাদের অন্য পণ্যের সন্ধান দাও। যারা দেহ কিনতে যায় তাদের সাহিত্যশিল্প সম্ভোগ করতে শেখাও। সমাজের সব স্তরে অবাধ মেলামেশার ব্যবস্থা কর। যখন ছুঁলে আর জাত যাবে না, তখনই একটুকু ছোঁয়াচ লাগার মাহাত্ম্যটা সবাই বুঝতে পারবে। আমি মরে গেলেও স্বৈরাচারকে তক্তে বসাব না। মানুষ নিজেই নিজেকে শোধরাবে। তাতে যদি হাজার বছরও লাগে লাগুক।'

ভবেশবাবু এবার উত্তেজিত হয়ে আরও তর্ক জুড়ে দিলেন। তিনি বললেন, 'তোমার এই উদারতার মানে হল সুবিধাবাদ। তুমি কোন গণতন্ত্রের যুক্তিতে গণিকাতন্ত্রকে সমর্থন করছ আমি জানিনে। তুমি তোমার নিজের শাস্টকে

ভালোবাসতে পার, তার সাফাই গাওয়ার জন্যে দিনকে রাত করতে পার কিন্তু আমি আমার লাভের ফিউচার চাই।'

শৈলেনবাবু হেসে বললেন, 'তার মানে একদল মাস্টার আর একদল পুলিসই তোমাকে সেই স্বর্গের সিঁড়ি বাঁধিয়ে দেবে। বেত, চকখড়ি আর হাতখড়ি। কি বল ?'

কোঁদলটা বেশ জোরাল হয়ে উঠছে, আমরা নিরাপদ দূরত্ব থেকে কবির লড়াই দিব্যি উপভোগ করছি, হঠাৎ হেমাঙ্গবাবু মাঝখানে পড়ে সব মাটি করে দিলেন। তিনি হেসে বললেন, 'আরে থামো থামো অত মাথা গরম করছ কেন ? ছেলেরা রয়েছে। ওরা কী ভাববে। তার চেয়ে আমি একটা গল্প বলি, ঠাণ্ডা হয়ে শোন।'

শৈলেনবাবু বললেন, 'তুমি আবার গল্পের কি জানো। জীবনে স্ত্রী ছাড়া কারোর মুখ দেখনি। স্ত্রী চলে যাওয়ার পর হিন্দু বিধবার মত একাদশী সম্বল করেছ। তোমার গল্প মানে তো হিতোপদেশের গল্প। ও গল্প ভবেশকে শোনাও যে চিরকাল নাবালক হয়ে রইল। আমি উঠি।'

কিন্তু হেমাঙ্গবাবু তাঁর হাত চেপে ধরলেন, 'আরে বসো বসো। এই বয়সে অত অস্থিরতা কি মানায় ? তোমাদের তর্ক শুনে আমার অনেকদিনের পুরনো একটা গল্প মনে পড়ে গেল। ইণ্ডিয়া গভর্নমেণ্ট যা আজ করছেন, আমি তা বিশ বছর আগে করতে চেষ্টা করেছিলাম।'

ভবেশবাবু বিস্মিত হয়ে বললেন, 'বল কি।'

শৈলেনবাবু নিঃশব্দে চুরুট টানতে লাগলেন।

হেমাঙ্গবাবু একবার ঘরের অন্য দুতিনজনের দিকে চোখ বুলিয়ে নিলেন, তারপর বন্ধুদের ছাড়া আর সবাইর অস্তিত্ব উপেক্ষা করে বলতে শুরু করলেন।

'তুমি ভুল করছ শৈলেন, আমার এ গল্পে কোন উপদেশ নেই। হিত আছে কিনা তা জানিনে। তবে এ গল্প তোমার পক্ষেও যাবে না, ভবেশের পক্ষেও না। তোমাদের কারো পক্ষে ওকালতি করবার জন্যে এ গল্প বলছিনে। তোমাদের আলাপ আলোচনায় আমার নিজের জীবনের একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল তাই তোমাদের শোনাচ্ছি। গল্পচ্ছলে উপদেশ দেওয়ার আমার মোটেই ইচ্ছা নেই। কারণ সেও এক ছলনা। তাতে না জমে গল্প, না জোর পায় উপদেশ। তাছাড়া তোমার নির্দেশ শোনার বয়স পার হয়ে গেছে।

আমার তখন নিজের প্রেস ছিল না। আর একজনের প্রেসের ম্যানেজার

ছিলাম। মাইনে বেশি পেতাম না তবে মানসম্মানটা ছিল। ঘরের স্ত্রী যেমন শ্রদ্ধা করতেন কি ভালোবাসতেন, অফিসের মালিক আর কর্মচারীরাও তেমনি আমার কথা শুনতেন। তোমরা যতই ঠাট্টা কর, দুনিয়াটা যার যার নিজের অভিজ্ঞতায় গড়া। আমার জীবন আমাকে যে গণ্ডীর মধ্যে রেখেছে তার বাইরে আমার যাওয়ার জো নেই। যে মদ খায় সে তার সুখও জানে দুঃখও জানে। যে খায়না সে অনেকখানি কল্পনা করে নেয়, কিন্তু সবটুকু জানা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে একথা ভাবাও ভুল, জীবনে যত জটিলতা যত গভীরতা ওই মদের স্বাদের মধ্যেই রয়েছে। মেয়েদের সম্বন্ধেও সেই কথা। সংসারে অনেক মানুষ আছে যাদের মা বোন স্ত্রী মেয়ে ছাড়া আর কোন নারীর কাছাকাছি যাওয়ার সুযোগ হয় না। কেউ বা ভয় পেয়ে প্রবৃত্তিকে দমায়, কারো বা প্রবৃত্তি আপনিই দমে থাকে। কিন্তু তাই বলে তার জীবন যে অজটিল কি অগভীর হয় তা নয়। মেয়েরা হয়তো জটিলতার আধার। কিন্তু একমাত্র আধার বলা কি ঠিক? মানে আমি বলতে চাই শৈলেনের ধরনের অভিজ্ঞতা আমার না থাকলেও আমি জীবনে নানা দুঃখ পেয়েছি, আঘাত পেয়েছি, নিজের অনেক ক্ষুদ্রতা দুর্বলতার সঙ্গে লড়াই করেছি, কখনো হেরেছি, কখনো জিতেছি। শৈলেনের আফশোস আমি অনেক অভিজ্ঞতার স্বাদ না পেয়েই মরব। আমি শুধু শিশুপাঠ আর ধারাপাত বগলে করেই সংসার থেকে বিদায় নেব। আমি ভাবি যেসব অভিজ্ঞতার বড়াই শৈলেন করে সেগুলি না হলেও ওর কোন ক্ষতি ছিল না। জীবনের স্বাদ-বিস্বাদের সঙ্গে পরিচয় তার অন্যপথেও আসতে পারত।

প্রথম যৌবনে অবশ্য আমি এমন নরম সুরে কথা বলতাম না। গোঁড়ামিটা পুরোমাত্রায় ছিল। প্রেসের কর্মচারীদের ত্রুটিবিচ্যুতি সহ্য করতে পারতাম না। বকে ধমকে ফাইন করে তাদের অস্থির করে তুলতাম। মালিক এতে খুশি হতেন। তিনি ভাবতেন, আমি তাঁর পক্ষে। আমি ভাবতাম আমি ন্যায়ের পক্ষে, যুক্তির পক্ষে। আমি সুবঅর্ডিনেটদের বোঝাতাম, কাজে ফাঁকি দিলে মালিকের ক্ষতির চেয়ে তোমাদের ক্ষতি হবে বেশি। তোমরাই অলস হবে, অযোগ্য হবে, চরিত্র হারাবে। মন দিয়ে কাজ করবার শক্তিই তোমাদের চলে যাবে। এখানে যদি না পোষায় তোমরা বরং অন্য কোথাও যাও, অন্য কোন কাজ করো। কিন্তু অনিচ্ছায় আধা ইচ্ছায় ষোল আনার জায়গায়, শক্তিসামর্থ্যের মাত্র চার আনা দিয়ে নিজেদের অমন করে নষ্ট কোরো না। তারা খুশি হত না। আমাকে ভাবত মনিবের পক্ষের দালাল। মালিককে বলতাম

গরু ঘোড়ার কাছ থেকে যথেষ্ট কাজ পেতে হলে উপযুক্ত দানাপানি দেওয়া দরকার। মানুষের জন্যে তো দানাপানির চাইতেও অনেক বেশি কিছু চাই। মালিক মুখ ভার করতেন।

আমার এসিস্ট্যাণ্ট ছিল অনিল বিশ্বাস। একসঙ্গে কিছুদিন কলেজে পড়েছিলাম। তাকে আমি চাকুরি দিয়ে আনি। তার কৃতজ্ঞতাও ছিল বন্ধুপ্রীতিও ছিল। কিন্তু বুদ্ধিশুদ্ধি তেমন ছিল না। একদিন তার বউ আমার বাড়িতে এসে কেঁদে পড়ল। কী ব্যাপার? না, অনিল মাইনের সব টাকা সংসারে দেয় না। বীডন স্ট্রীট অঞ্চলে আর একটি মেয়ের কাছে যায়। সেখানেই অর্ধেক টাকা খরচ করে আসে। এদিকে ছেলেমেয়ে হয়েছে, তাদের সমানে যত্ন করতে পারে না, স্ত্রীর সাধআহ্লাদ মেটাবার শক্তি নেই। এ কী বদখেয়াল!

আমার স্ত্রী বললেন, 'তোমার কথা তো সবাই শোনে। তোমার হাতে ক্ষমতাও অনেক। তুমি অনিলবাবুকে রক্ষা কর। ভদ্রলোককে ওই রক্ষিতার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এসো। নাহলে একটা পরিবার ধ্বংস হয়ে যাবে।'

আমার শক্তির ওপর আমার স্ত্রীর এই গভীর বিশ্বাস দেখে আমি খুব খুশি হলাম। আমার বিদ্যাবুদ্ধি বিশেষ নেই, প্রচুর অর্থোপার্জনের ক্ষমতা নেই। সহিংস অহিংস দুরকমের রাজনীতিই কিছু কিছু করেছি কিন্তু কোন দল কি উপদলের নেতৃত্ব আমার হাতে আসেনি। তবু আমি আমার নিজের রাজ্যে একেশ্বর হয়েই ছিলাম।

শৈলেনবাবু হেসে বললেন, 'আর স্ত্রীর হৃদয়েশ্বর সে-কথাও বল।'

হেমাঙ্গবাবু বলতে লাগলেন, 'আমি আমার স্ত্রীকে ভরসা দিলাম। অনিলের স্ত্রীকে আশ্বাস দিয়ে বললাম, অপনার কোন ভয় নেই। আমি যেমন করেই পারি ওর এই বদখেয়াল ছাড়াব।'

তারপর অফিসে গিয়ে অনিলকে নিজের চেম্বারে ডেকে নিয়ে সামনের চেয়ারে বসিয়ে খানিকক্ষণ পারিবারিক কর্তব্য দাম্পত্যজীবনের একনিষ্ঠার মহিমা নিয়ে বেশ একটু ভূমিকা বিস্তার করলাম। তারপর বললাম, 'অনিল, তোমার চালচলন সম্বন্ধে আমার আপত্তি আছে। একটা বদঅভ্যাস তোমাকে ছাড়তে হবে।'

অনিল হেসে বলল, 'তুমি কি আমার নস্যি নেওয়ার কথা বলছ হেমাঙ্গদা?'

আমি গম্ভীরভাবে বললাম, 'নস্যি নেওয়াটা আমি পছন্দ করিনে। কিন্তু আমি যে সে কথা বলছিনে তা বুঝতে তোমার নিশ্চয়ই বাকি নেই।'

অনিল বলল, 'তবে কি সিগারেটের কথা বলছ ? কিন্তু সিগারেট তো আমি বেশি খাইনে। বিড়ির ওপর দিয়েই তো চালিয়ে দিই।'

আমি বললাম, 'কেন কথা বাড়াচ্ছ ? আমি সে কথাও বলছিনে।'

অনিল হেসে বলল, তোমার কঠিন দৃষ্টি একেবারে তরল পদার্থটার ওপর গিয়ে পড়েছে বুঝতে পারছি। কিন্তু তাও তো আমি খুব খাইনে। পয়সা কোথায় যে খাব ? মাসে দু-একবারের বেশি জোটে না। তাও নিতান্ত ওষুধের মাত্রায়।'

আমি বললাম, 'তোমার রোগের উপযুক্ত ওষুধই বেছে নিয়েছ। কিন্তু চিকিৎসার ভার নিজের ওপর না রেখে আমার হাতে ছেড়ে দাও। আমার কথা শোন, যে স্ত্রীলোকটির কাছে তুমি যাতায়াত কর, সেখানে আর যেয়ো না।'

অনিল প্রথমে খুব চটে উঠল। বলল, 'এসব তোমাকে কে বলেছে ? যত সব বাজে কথা।'

আমি বললাম, 'মোটেই বাজে কথা নয়। দুশ্চরিত্রদের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা তারা সত্য কথা বলতে ভয় পায়।

অপমানটা অনিলকে খুব লাগল। তার গৌরবর্ণ মুখ রাগে টকটক করতে লাগল। একটু চুপ করে থেকে সে বলল, 'বেশতো ব্যাপারটা যদি সত্যিই হয়, তাতে তোমার তো কোন ক্ষতি নেই। তুমি দেখবে, আমি অফিসের কাজকর্ম ঠিকমত করে যাচ্ছি কিনা, তুমি দেখবে নিচুওয়ালা কি ওপরওয়ালা কারো সঙ্গে আমি কোন খারাপ ব্যবহার করেছি কি না। তা যদি না করি, আমার প্রাইভেট লাইফে উঁকিঝুঁকি মারবার তোমার অধিকার কিসের ? আমি নস্যিই নাকে গুঁজি কি কোন নটীকে বুকে তুলি সে খোঁজে তোমার দরকার কিসের ?'

আমি বললাম, 'অনিল, দরকার আছে। তুমি আমার বন্ধু। তোমার ভালোমন্দ দেখবার দায়িত্ব আমার ওপর আপনিই এসে পড়ে, আমার স্ত্রী কি ছেলেমেয়ের অসুখবিসুখে তুমি যেমন ছুটে যাও তেমনি আমাকেও ছুটে আসতে হয়। কারণ এও একধরনের অসুখ।'

অনিল বলল, 'অসুখ !'

আমি বললাম, 'অসুখ ছাড়া কি।'

অনিল বলল, 'কিন্তু এইসব নেশা যদি আমাকে ইম্পেটাস দেয়, আমার কাজকর্মের দ্বিগুণ উৎসাহ আর শক্তি জোগায়, তাহলে এইসব অভ্যাসকে তুমি অসুখ বলবে কেন ?'

আমি বললাম, 'প্রথমে এই ধরনের নেশায় শক্তিসামর্থ্য বাড়ে বলে তোমাদের যে ধারণা আছে তা ভুল। দাদ থাকলে তা চুলকিয়ে আরাম পাওয়া যায় তাই বলে দাদ পুষে রাখাটা শরীরের পক্ষে ভালো নয়। মলম দিয়ে তা সারিয়ে ফেলাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। এইসব ডিসিপেশন তেমনি সভ্যতা সংস্কৃতির দাদ। এগুলিকে মূলশুদ্ধ উপড়ে ফেলতে পারলেই সভ্যতা এগোয়। তুমি কিছুতেই কতকগুলি বদঅভ্যাসকে সদঅভ্যাস, কি তোমার জীবনযাত্রার পক্ষে অপরিহার্য বলে প্রমাণ করতে পার না। তা যদি পারতে তাহলে অন্ধদের রাতকে দিন বলে চালিয়ে দিতে পারতে। কিন্তু যত গায়ের জোর গলার জোরই আমাদের থাকুক না সে ক্ষমতা আমাদের হাতে নেই।'

অনিল গম্ভীর মুখে উঠে চলে গেল। দিনকয়েক আমার ধার দিয়েও ঘেঁষল না। দেখা হলে চোখে চোখে তাকায় না, মুখ ফিরিয়ে নেয়। সামনাসামনি পড়লে পাশ কাটিয়ে যায়। আগে আগে আমাদের বাড়িতে সপ্তাহে দু-একদিন যেত। আমার স্ত্রী আর ছেলেমেয়েদের নিয়ে হৈ-হুল্লোড় করত। এখন সে সব বন্ধ। আমি বুঝতে পারলাম বন্ধুকে হারাতে বসেছি। বন্ধুত্বরক্ষার একটা বড় শর্ত হল তার দোষগুলি উপেক্ষা করে গুণগুলিকে দ্বিগুণ করে বলা। হিত কথার চেয়ে মনোহর কথা বলতে জানা। কুর্বন্নপি ব্যলিকানি যঃ প্রিয়ঃ প্রিয়ঃ এব সঃ। যাকে ভালোবাস তার ভুলো দোষ গুণ ধর। কি দোষগুলি শুদ্ধ ভালোবাসো। কিন্তু এই রীতিনীতি আমি মানতে পারিনি। তার ফলে অনেক বন্ধুবিয়োগ হয়েছে। অনিলের সঙ্গেও আমার চায়ের টেবিলের বন্ধুত্ব ছিল না। আমি ভাবলাম ওর যদি ভালোই না করতে পারলাম, ওকে ভালোবাসলাম কী করে।

অনিল আমার কাছে এল না কিন্তু আমিই ওকে ফের একদিন পাকড়াও করলাম। বললাম, 'অনিল, ছেড়েছ ওসব ?'

অনিল বলল, 'তুমি কি আমার বন্ধু না জ্যেঠামশাই ?'

আমি বললাম, 'বন্ধুকেও কোন কোন সময় জ্যেঠামশাই হতে হয় যেমন স্ত্রী মাঝে মাঝে দিদি কি মায়ের রোল নেয়। দেখ সম্পর্কটা শুধু সম্বোধনের মধ্যে নেই। তুমি আমার কুটুম্ব না বন্ধু না আত্মীয়, ভাইপো না বেয়াই না মেসোমশাই সেটা বড় কথা নয়। সবচেয়ে বড় সম্পর্ক হচ্ছে ভালোবাসার সম্পর্ক। মুখের সম্বোধনটা যাই হোক না কেন। সেই ভালোবাসার দায়িত্ব হল ভালো চাওয়া, ভালো করা। স্ত্রী ছাড়া অন্য যে মেয়েটাকে তুমি ভালোবাস

তা তোমার স্পর্শসুখ ছাড়া কিছু নয়। তার অনুভূতি চামড়ার ওপরে, চামড়ার নিচে তা পৌঁছোয় না।'

অনিল প্রতিবাদ করে বলল, 'তুমি তা কী করে জানলে? আর যদি তাই হয় তাতেই বা ক্ষতি কি? শরীরের পক্ষে অস্থি মেদ মজ্জা যেমন দরকার, চামড়াটাও তেমনি। আমার চামড়া তোমার কোন কাজে লাগবে না। হরিণ কি বাঘের চামড়া নয় যে পেতে তুমি যোগাসনে বসতে পারবে। কিন্তু তাই বলে আমার চামড়ার দাম আমার কাছে কম নয়।'

আমি বললাম, 'কিন্তু তার চেয়ে তোমার স্ত্রীর হৃদয় মনের দাম বেশি।'

অনিল বলল, 'আমি তো তাকে বঞ্চিত করছিনে। তার যা প্রাপ্য আমি তো তাকে দিয়েই যাচ্ছি। আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করে দেখ আমার সাধ্যমত আমি শুধু তার ভাতকাপড়ই যোগাইনে, সাবান স্নো থেকে শুরু করে বছরে দু-একখানা গয়নাগাঁটিও দিই। অন্তরের ভালোবাসাও যে কম দিই তা নয়। মালতীর ওখানে যাই নিতান্তই একঘেয়েমি কাটাবার জন্যে। এমন নয় যে, মালতীকে আমি বিয়ে করে ঘরসংসার পেতেছি কি তার কোলে ছেলেমেয়ে এনে দিয়েছি। কোনক্রমেই মালতী আমার স্ত্রীর সতীন নয়। তার এত দুশ্চিন্তা, এত হিংসা-দ্বেষ কিসের?'

আমি বললাম, 'তোমার মত জ্ঞানপাপী আর দুটি নেই। মালতীকে ভালো না বেসেও তুমি তার কাছে যাও। আর স্ত্রীকে ঠকিয়েও তুমি তা স্বীকার করতে চাও না। ভালোবাসাটা কি ফ্রাকশন আর ডেসিমেলের অঙ্ক যে তুমি একে খানিকটা ওকে খানিকটা তাকে খানিকটা দেবে?'

অনিল বলল, 'একটু চিন্তা করে করে দেখ সংসারে দেওয়া নেওয়ার ধরণটাই তাই। আমরা অংশকেই সদর্পে পূর্ণ আর অখণ্ড বলে ঘোষণা করি। আসলে পুরোপুরি একজন আর একজনকে দিতেও পারে না, নিতেও পারে না, যদি পারত দু-চারদিনের বেশি অখণ্ডতাকে সহ্য করতে পারত না।'

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, 'তুমি যত তর্কই কর, মালতী না মল্লিকা ওকে তোমার ছাড়তেই হবে।'

আরও বললাম, 'যদি না ছাড়, এখানকার চাকরি ছেড়ে চলে যেতে হবে।'

অনিল একটু চমকে উঠে গম্ভীর হয়ে গেল। ওকে চাকরি থেকে ছাড়াবার ক্ষমতা যে আমার আছে তা ও জানে।

একটু চুপ করে থেকে অনিল বলল, 'বেশ, আমাকে কয়েকদিন সময় দাও, আমি ভেবে দেখি।'

আমি হঠাৎ অনিলের হাত চেপে ধরে বললাম, 'অনিল, ভাববার কিছু নেই। তুমি আমার কথা শুনে চল, তোমার ভালোই হবে। দু-চারদিন একটু কষ্ট হতে পারে তারপর আর এসব কথা মনে পড়বে না। তুমি নিজের মুখেই স্বীকার করেছ ব্যাপারটা একটা অভ্যাস ছাড়া কিছু নয়। মালতীর সঙ্গে তোমার ভালবাসার সম্পর্ক নেই, যা আছে তা নিতান্তই নস্যি সিগারেটের নেশা। একজন বন্ধুর অনুরোধে তুমি কি সেই নেশা ছাড়তে পার না?'

অনিল বলল, 'এসব অস্থায়ী সম্পর্কে ছাড়াছাড়ি তো অনিবার্য। তুমি আমাকে এই নিয়ে পীড়াপীড়ি না করে আমাকে আমার বুদ্ধিবিবেচনার ওপর নির্ভর করতে দাও।'

অনিল আর আমার কাছে মিথ্যা কথা বলে না দেখে আমি খুসি হলাম। ও সেখানে গিয়েও বলতে পারত, 'যাইনে। তার সঙ্গে আমার আর কোন সম্পর্ক নেই।'

কিন্তু তা না করে ও যে আমার কাছে সব স্বীকার করে আমার সঙ্গে তর্ক করে তাতে আমি খানিকটা আশ্বস্ত হলাম। কারণ আমি বেশ বুঝতে পেরেছিলাম, ও যত তর্কবিতর্কই করুক আমার কথাগুলি উড়িয়ে দিচ্ছেনা, ভেবে দেখছে। আমিও যেমন অবসর সময় ওর কথাগুনি নিজের মনে নাড়াচাড়া করে বুঝতে চেষ্টা করি অনিলও কি আর তা করে না? আমি যে ওর শত্রু নই, হিতাকাঙ্ক্ষী তা তো অনিল বোঝে।

শুধু কাজের ফাঁকে আমার অফিসের চেম্বারে নয়, পার্কে কি গঙ্গার ধারে বেড়াতে বেড়াতে, রেস্টুরেণ্টে চায়ের কাপ সামনে নিয়ে আমি ওকে বোঝাতে লাগলাম। তোমরা জিজ্ঞাসা করবে আমার কি অন্য কোন কাজকর্ম ছিল না? নিশ্চয়ই ছিল! চাকরিবাকরির ব্যস্ততা, সাংসারিক চিন্তাভাবনা ছাড়াও কিছু দায়দায়িত্ব সবসময় জড়িয়ে থাকত। কারণ দল উপদলের মায়া তখনও একেবারে ছাড়তে পারিনি। তাছাড়া পাড়ার নাইট স্কুল, লাইব্রেরী আর দু-একটা অনাথ আশ্রমের সঙ্গেও একেবারে সম্পর্কহীন ছিলাম তা নয়। তবু এসব করেও সময় পেতাম। কী করে পেতাম তা এখন ভাবতে অবাক লাগে। একটা জেদ যেন আমাকে পেয়ে বসেছিল। যেমন করেই হোক অনিলকে আনতে হবে। আমি কিছুতেই ওর কাছে হার মানব না। আমার সমস্ত

মানসম্মান যেন এই হারজিতের মধ্যে ধরা রয়েছে। তোমরা প্যাশনের কথা বল। প্যাশনের কেন্দ্র শুধু যে সবসময় একটি মেয়েই হবে তার কোন কথা নেই। আরো অনেক বস্তু ব্যক্তি আইডিয়া কি আইডিয়াল তার স্থান নিতে পারে।

কিন্তু এত করেও আমি যখন শুনলাম, অনিল অন্য জায়গায় চাকরির চেষ্টা করছে আর সে কাজ প্রায় ঠিক করে এনেছে, আমি মরিয়া হয়ে উঠলাম।

অনিলকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি নাকি আমার হাত এড়াবার চেষ্টা করছ?'

অনিল বলল, 'তোমার তো একজোড়া হাত নয়, দশজোড়া হাত। এড়িয়ে যাব কোথায়? কিন্তু আমি যদি অন্য কোথাও একটা ভালো চান্স পাই, বন্ধু হয়ে তোমার কি তাতে আপত্তি করা উচিত?'

আমি বললাম, 'তোমার যেখানে খুশি যেতে পার আমি আপত্তি করব কেন? তবে সেই মেয়েটিকে না ছাড়লে তুমি আমার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে না।'

অনিল বলল, 'তোমার ছেলেমানুষি আর গেল না। আচ্ছা এক পিউরিট্যানের পাল্লায় পড়া গেছে। ধর যদি নাই ছাড়ি তুমি কী করবে শুনি?'

আমি হেসে বললাম, 'কী করব? আমার চেহারাখানা তো দেখেছ। তাছাড়া আমার কিছু চেলাচামুণ্ডাও আছে। তারা তোমাকে আচ্ছা করে মার লাগাবে। দেহের সুখ যাদের খুব প্রিয় দেহের দুঃখকেও তারাই সবচেয়ে বেশি ভয় করে। শরীরের কষ্ট সন্ন্যাসীরাই সইতে পারে, ভোগীরা পারে না।'

হাসতে গিয়ে অনিল গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, 'তোমরা সব পার, তোমাদের অসাধ্য কিছু নেই। নীতির নামে, ভগবানের নামে মানুষের ওপর তোমরা যত নির্যাতন করেছ দুর্নীতি তার দশভাগের একভাগও পারেনি।'

আমি শুধু বন্ধুকে মারের ভয় দেখিয়েই নিরস্ত রইলাম না, আমার এক চেলাকে ওর পিছনে লেলিয়ে দিলাম। এর আগে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করেও মালতীর ঠিকানা জোগাড় করতে পারিনি। কিন্তু আমার গোয়েন্দা গিয়ে গলির নাম নম্বর ঠিক নিয়ে এল।

তারপর আমি নিজেই গেলাম। দুপুরে নয়, রাত্রেও নয়, বিকেল বেলায়। অফিস থেকে একটু আগেই সেদিন বেরিয়ে পড়েছিলাম। ও-পাড়ায় আমি যে ঠিক প্রথম গেলাম তা নয়। আমাদের এক কর্মী পুলিসের ভয়ে ওই ধরনেরই একটা বাড়িতে কিছুদিন লুকিয়েছিল, তার খোঁজখবর নেওয়ার জন্যে আমি গিয়েছি। পাড়ার এক ধুরন্ধর আমার চেনা এক ভদ্রঘরের মেয়েকে

ফুসলিয়ে নিয়ে ওই অঞ্চলে রেখেছিল। মামলা মোকদ্দমা হয়েছিল তা নিয়ে। সেই উপলক্ষেও দু-একবার যাতায়াত করতে হয়েছে। তবু বাড়িটার মধ্যে ঢুকতেই কেমন একটা অস্বস্তি বোধ হল।

দোতলা বাড়িটায় যেন বিয়েবাড়ির উৎসব লেগেছে। সাজসজ্জা প্রসাধনের পালা চলছে তখন। মালতীর নাম বলতে দোতলায় ওর ঘরখানা একজন লোক আমাকে দেখিয়ে দিল। ও তখন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল বাঁধছিল। আমার নাম শুনে দরজা খুলে সামনে এসে দাঁড়াল। আঠের উনিশ বছর বয়স। কি সামান্য কিছু বেশিও হতে পারে। শামলা রং। কিন্তু দেহের পরিপুষ্ট গড়নে, চোখের দৃষ্টিতে, মুখের ডৌলে শুধু রূপ নয়, এমন এক লাবণ্য আছে যা ওপাড়ার কোন মেয়ের মধ্যে আশাই করতে পারিনি। তোমরা জানো রূপ যারা ভাঙিয়ে খায় তাদের রূপ বেশিদিন থাকে না, যৌবনও তাড়াতাড়ি পালায়। বুঝতে পারলাম মালতী অল্পদিন এসেছে। ঝরবার সময় আজও হয়নি। বুঝতে পারলাম অনিল একেবারে অকারণে মজেনি।

মালতী বিস্মিত হয়ে আমার দিকে তাকিয়েছিল। আমার গায়ে এখনকার মতই গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবি, পরনে মোটা সাদা ধুতি। পায়ে কেম্বিসের জুতো। চেহারার দৈর্ঘ্যটা অন্যের শ্রদ্ধা আর সমীহা আকর্ষণের কাজে লাগে।

আমি বললাম, 'আমার নাম হেমাঙ্গশঙ্কর রায়।'

মালতীর মুখ একটু যেন বিবর্ণ হয়ে গেল। গলাটা কেঁপে গেল যেন। কিন্তু কাঁপা গলাও কী মিষ্টি শোনায়।

মালতী বলল, 'আমিও তাই ভেবেছিলাম।' একটু এগিয়ে এসে সে আমার জুতো ছুঁয়ে প্রণাম করল।

ওর বেণীটি আমি লক্ষ্য না করে পারলাম না। সেই বেণী ওর দেহের মতই সুদীর্ঘ।

আমি বললাম, 'তুমি আমার নাম তাহলে অনিলের মুখে শুনেছ ?'

অনিলের নাম আমার মুখে শুনে ও লজ্জা পেল। আস্তে আস্তে বলল, 'শুনেছি।'

আমি বললাম, 'তাহলে এও শুনেছ আমি তাকে এখান থেকে সরিয়ে নিতে চেয়েছি।'

মেয়েটি বলল, 'তিনি আজকাল আর বেশি আসেন না।'

আমি বললাম, 'আমি চাই যাতে একেবারেই না আসে। সেই কথা বলতেই আজ আমি এসেছি।'

আরও দু চারটি মেয়ে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল, তাদের চাপা হাসির শব্দও বেশ শুনতে পাচ্ছিলাম।

মালতী তা লক্ষ্য করে বলল, 'ওরা গোলমাল করছে। আপনি ভিতরে এসে বসুন।'

জানালার ফাঁক দিয়ে গদিওয়ালা খাট, ফুলদানি, বইয়ের তাক আর একটা হারমনিয়ম দেখা যাচ্ছিল।

বললাম, 'না, আমি ঘরে যাব না। তোমার যা বলবার আছে ওখানে দাঁড়িয়েই বল।'

মালতী বলল, 'আমি আর কী বলব।'

বললাম, 'তাহলে আমি বলছি শোন। এখানে যখন কথা বলবার সুবিধে হচ্ছে না, তুমি কাল আমাদের বাড়িতে এসো।'

মেয়েটি বলতে পারত, 'আপনি যখন আমার ঘরে এলেন না, আমি কেন আপনার বাড়িতে যাব?'

কিন্তু অতটা সাহস তখনো তার হয়নি, অতটা প্রগলভ হওয়ার বয়সও তার ছিল না।

মালতী বিস্মিত হয়ে বলল, 'আপনার বাড়িতে? কিন্তু কেউ যদি কিছু মনে করেন?'

আমি একটু হেসে বললাম, 'কেউ মানে তো আমার স্ত্রী? না, তিনি কিছু মনে করবেন না। তুমি তো তার কোন ক্ষতি করনি। ক্ষতি করেছ আর একটি পরিবারের। আচ্ছা চল, তোমার ঘরেই চল। ঘরে গিয়েই সব বলছি।'

আমি নিজেই ভেজানো দরজা ঠেলে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। আমার কোন সংকোচও নেই, কুণ্ঠাও নেই। কারণ আমি সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছি। কিন্তু সবাই তা মানতে রাজী নয়। মোটা বাড়িওয়ালী মালতীকে বাইরে ডেকে নিয়ে আমাকে শুনিয়ে শুনিয়েই বলল, 'এ কি ব্যাভার তোর? ঘরে লোক নিলি, আমার সঙ্গে কথা কইলি না যে।'

মালতী ফিস ফিস করে বলল, 'চুপ কর মাসী। উনি সেজন্যে আসেননি। উনি স্বদেশী নেতা। দেশের কাজে এসেছেন। দু মিনিট বাদেই চলে যাবেন।'

বাড়িওয়ালী বলল, 'আর হাসাসনি বাছা। কত ঢঙই দেখলাম। স্বদেশী বিদেশী ফকির সন্ন্যেসী চিনতে আর কাউকে বাকি রইল না।'

তারপর আর কোন কথা কানে গেল না। মালতী বোধ হয় মাসীর মুখ চেপে ধরে থাকবে।

খানিক বাদে মালতী ফিরে এল। আমি গদি আঁটা চেয়ারটায় ততক্ষণে বসে পড়েছি। কিন্তু কিছুতেই আরাম পাচ্ছিনে। দুটো কান ঝাঁ ঝাঁ করছে।

একটু বাদে মালতীর দিকে চেয়ে আমি বললাম, 'তুমি একটি পরিবারের দারুণ ক্ষতি করেছ। অনিলের স্ত্রী ভাবনায় চিন্তায় শুকিয়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে। ওর দুটি বাচ্চার দিকে তাকানো যায় না।'

আমি একটু বাড়িয়েই বললাম অবশ্য। সৎ উদ্দেশ্যে একটু আধটু মিথ্যার আশ্রয় নিতে ক্ষতি নেই।

মালতী চুপ করে রইল।

আমি গলায় যতখানি আবেগ ঢালতে পারি ঢেলে বলতে লাগলাম, 'একটা পরিবার ধ্বংস হয়ে যেতে বসেছে। তুমি তো জানো অনিল রাজাও নয়, মহারাজাও নয়, সামান্য একজন কেরানী। ও যদি বাজেভাবে টাকা নষ্ট করে, ওর স্ত্রীপুত্র না খেয়ে মরবে। অফিসে জানাজানি হলে ওর চাকরি চলে যাবে। তখন কোথাও ওর ঠাঁই হবে না।'

মালতী বলল, 'কিন্তু আমি তো তাঁকে ডেকে আনিনি। তিনি নিজেই এসেছেন।'

আমি বললাম, 'তাকে ফেরাবার ক্ষমতা তোমার হাতেই আছে।'

মালতী বলল, 'আমার হাতে?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ তোমার হাতে। একমাত্র তুমিই পার ওর বউ ছেলেকে রক্ষা করতে। মানসম্মান স্বাস্থ্যসম্পদ নিয়ে ওকে বাঁচতে দেওয়ার ক্ষমতাও তোমারই আছে। আবার তুমি ওকে রসাতলে টেনে নামাতেও পার।'

মালতী বলল, 'আমি তা চাইনে।'

আমি বললাম, 'আমি জানি, তুমি তা চাইতে পার না। তুমি যদি ওকে ভালোবেসে থাক তুমি ওর ভালোই চাইবে।'

মালতী বলল, 'ভালো আমরা কী করে বাসব বলুন। তবে আপনি যা বলেছেন তা করব।'

আমি বললাম, 'মালতী, তোমার মুখ দেখে, তোমার মুখের কথা শুনে আমার মনে হচ্ছে তুমি ভদ্রঘর থেকে এসেছ, লেখাপড়াও কিছু জানো। আর তুমি যে ওকে ভালোবাস তাতেও আমার সন্দেহ নেই। কিন্তু সত্যি সত্যি যে ভালো-

বাসে সে নিজেও ভালো হয়, আর একজনকেও ভালো হতে দেয়। আমি বামুনের ছেলে, তুমি আমার পায়ে হাত দিয়ে প্রতিজ্ঞা কর, তুমি তোমার কথা রাখবে। তুমি আর ওকে আসতে দেবে না।'

সেদিন অমন অহংকার কী করে করতে পারলাম আজ ভেবে অবাক হয়ে যাই। যাত্রা থিয়েটারের মত অমন নাটকীয় ভাষাভঙ্গীই বা কোত্থেকে এসেছিল তা ভেবে আজ হাসি পায়, লজ্জা হয়, বিস্ময় লাগে। কিন্তু বুক ফুলিয়ে নিজেকে একবার জাহির করতে পারলে তাতে সাময়িক ফল পাওয়া যায়। আমিও পেলাম। মালতী সত্যিই আমার পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করল। প্রতিজ্ঞা সে রেখেছিল।

অনিল দিন কয়েক খুব আস্ফালন করে বেড়াল আমাকে দেখে নেবে। কিন্তু আমার দলবল দেখে শেষ পর্যন্ত চুপ করে গেল। চেষ্টা চরিত্র করে বিলিতি এক মার্চেণ্ট অফিসে ভালো চাকরিই পেল অনিল। আমার নামে যা তা কুৎসা রটাতে বাকি রাখল না। বন্ধু হল শত্রু। তবে আজকাল আর সেই দ্বেষ নেই। মাঝে মাঝে দেখা সাক্ষাৎ হলে আমরা হেসে কথা বলি। একজন আর এক-জনের স্বাস্থ্য, ছেলেমেয়ে, নাতি নাতনির খোঁজখবর নিই। বুড়ো বয়সে নখ আর দাঁত সবই ভোঁতা হয়। কিন্তু নেশা অনিল আজও ছাড়তে পারেনি। কিছু কিছু যা ছেড়েছে তা বয়স আর ডাক্তারের শাসনে। তবে অনিলকে আমি আর তত দোষ দিইনি। কোন একটা অভ্যাস অর্জনই হোক আর বদলানোই হোক, তা যে প্রায় জন্মান্তর নেওয়ার সামিল, সে বোধ আমার হয়েছে। এই জ্ঞান কেবল যে সংসারে দেখে দেখেই আমার হয়েছে তা নয়, ঠেকেও হয়েছে।

এবার মালতীর কথাটা বলি। অনিলের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটাবার পরেও তার সঙ্গে আমার আরো কিছুদিন যোগাযোগ ছিল।

একদিন সেই আমাকে খবর দিল, আমার সঙ্গে সে একবার দেখা করতে চায়। আমি তাকে ঠিকানা দিয়ে এসেছিলাম। চিঠিপত্র লেখারও অনুমতি দিয়েছিলাম। ইচ্ছা ছিল মেয়েটির কিছু উপকার করব। ওর যেমন মুখের গ্রাস আমি কেড়ে নিলাম তার বদলে ওকে কিছু না দিতে পারলে যেন বিবেকে বাধে।

আমি ওকে জানালাম, ওর সেই ঘরে গিয়ে দেখা করবার আমার আর ইচ্ছা নেই। বাড়িওয়ালীর যা মূর্তি দেখে এসেছি তাতে বিনা দর্শনীতে ফের ওদিকে

ঘেঁষা নিরাপদ নয়। দরকার হলে আমার বাড়িতে কি অন্য কোথাও সে দেখা করতে পারে।

মালতী তাতেই রাজী হল। ক্যাম্বেল হাসপাতালে ওর কোন এক আত্মীয়ের অপারেশন হয়েছে। তাকে মাঝে মাঝে দেখতে যায়। মালতী জানাল, আমি যদি ছুটির পরে দয়া করে সেখানে যাই দেখা হতে পারে।

ভারি অদ্ভুত লাগল। রাজনৈতিক কারণে এ ধরনের গোপন দেখা-সাক্ষাৎ আমার আরো দু একটি মেয়ের সঙ্গে হয়েছে, কিন্তু নৈতিক কারণে এই প্রথম। আমি রাজী হলাম। বেকার ওয়ার্ড থেকে বেরিয়ে ও আমার পাশে পাশে হাঁটতে লাগল। বিকেলের হাসপাতালে রোগীদের আত্মীয়-স্বজনের ভিড় জমেছে। পুকুরের জলে সূর্যাস্তের রঙ। পথের দুধারে আমগাছের সারি। বাতাসে কিসের একটা ওষুধের গন্ধ। আমরা হাঁটতে হাঁটতে কথা বলতে লাগলাম।

মালতী বলল, 'এবার আমার একটা ব্যবস্থা করে দিন। ওখানে থাকতে আমার আর ভালো লাগে না। যা করছি আমি আর তা করতে চাইনে।'

আমি উৎসাহ পেয়ে বললাম, 'মালতী, এই তো চাই। তোমরাও ভালো হবে, সুন্দর হবে, দেশের দশের কাজে লাগবে, আমরাও তাই চাই। তোমরা চিরকাল সভ্যতার কলঙ্ক হয়ে থাকবে কেন?'

আমার এত উচ্ছ্বাসের উত্তরে মালতী শুধু বলল, 'আমাকে কাজ দিন, আমি কাজ করব। যাতে আমি স্বাধীনভাবে থাকতে পারি তার একটা ব্যবস্থা করে দিন।'

মাথায় সাদা রুমাল জড়ানো মালতীর বয়সী দুটি নার্স আমাদের পাশ দিয়ে চলে গেল। আঁটসাট পোশাকে ব্যস্ত সেবিকা মূর্তি বেশ লাগল দেখতে।

মালতীকে বললাম, 'কাজ জোগাড় করে দিলে তুমি তা করবে?'

মালতী বলল, 'করব। ওই নরক থেকে কে না বেরোতে চায়।'

বাড়ি গিয়ে স্ত্রীকে আমি সব কথা খুলে বললাম। তাঁর কাছে আমি কিছুই গোপন করতাম না। দলের দু একটা গুপ্ত কাজকর্ম ছাড়া আমি সব বিষয় নিয়েই তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতাম। কোথায় কোন মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছে, কার জন্যে কোন কাজ করে দিয়েছি, সব বললাম। তবু মালতীর কথা শুনে তাঁর মুখখানা গম্ভীর হয়ে গেল। তিনি একটু হাসবার চেষ্টা করে বললেন, 'ডুবে ডুবে কোথায় জল খাচ্ছ কে জানে।'

আমি বললাম, 'ছিঃ।'

তিনি বললেন, 'এখানে সেখানে দেখা না করে তাকে বাড়িতে নিয়ে এলেই পার। কতজনেই তো আসে।'

আমি বললাম, 'আমি তাকে বাড়িতেই আসতে বলেছিলাম। সে রাজী হয়নি। একটা সংকোচ তো আছে। ভালো কোন কাজকর্ম যদি জুটিয়ে দিতে পারি তাহলে হয়তো আসতে আর কোন লজ্জা থাকবে না।'

আমার স্ত্রী বললেন, 'তুমি ওকে কাজ জুটিয়ে দেওয়ার কথা বলেছ বুঝি? এত লোকের কাজ জুটিয়ে দিচ্ছ, আমাকে তো কিছুই দিলে না?'

আমি হাসতে লাগলাম। ভালোবাসার ফুল ঈর্ষার কাঁটা দিয়ে ঘেরা। প্রেম নিষ্কণ্টক হলে তার কি চেহারা হবে কে জানে। তবে কাঁটা তো শুধু কাঁটাই থাকে না। তা কখনো ছুরি হয়, কখনো বর্শা। বুক আর পিঠ এফোঁড় ওফোঁড় করে দেয়। কিন্তু আমি কোনদিন কাঁটাকে বাড়তে দিইনি। সযত্নে তা তুলে ফেলতেই চেষ্টা করেছি।

মাস্টারি করবার বিদ্যা মালতীর নেই। ওর জন্যে আমি নার্সের কাজই জোটাতে চেষ্টা করলাম। শুধু কাজ নয়, আমার মনে হল নার্সের পোষাকটাও মালতীকে চমৎকার মানাবে।

ওই ক্যাম্বেলেই একজন ডাক্তারের সঙ্গে আমার জানাশোনা ছিল। হাসপাতালে খ্যাতি আর প্রতিপত্তি দুই-ই তাঁর আছে। আমি তাঁকে গিয়ে ধরে পড়লাম। তিনি সব শুনে রাজী হলেন। শেষে হেসে বললেন, 'দেখো যেন বিপদে টিপদে না পড়ি। আমার ছাত্রদের মাথা টাথা না ঘুরে যায়।'

আমি বললাম, 'ছাত্রদের মাথা ঠিকই থাকবে, মাস্টারদের নিয়েই যা ভাবনা।'

সব ঠিক হয়ে গেল। প্রথমে কিছুদিন ট্রেনিং-এ থাকতে হবে। কোয়ার্টার আর ভাতার ব্যবস্থা আছে। তারপরে স্থায়ী চাকরি। আজকাল একটি মেয়েকে ঢোকানো শক্ত। অনেক হাঁটাহাঁটি ঘোরাঘুরি করতে হয়, বিদ্যাবুদ্ধির উঁচু বেড়াও খাড়া করা হয়েছে। কিন্তু বিশ পঁচিশ বছর আগে অত কড়াকড়ি ছিল না। তবু সব ব্যবস্থা ট্যাবস্থা করতে মাসখানেক সময় কেটে গেল। আমি একটি ছেলেকে পাঠিয়ে দিলাম। মালতীর চাকরি হয়েছে এই কথা সে তাকে জানিয়ে আসবে। বাড়িওয়ালীকে না ঘাঁটিয়ে কালীঘাট টালিঘাটের কিছু একটা অজুহাত দিয়ে মালতী যেন সেখান থেকে বেরিয়ে আসে। তারপর আর তাকে কিছু ভাবতে হবে না। চিঠিতে আমি সব কথাই লিখে দিয়েছিলাম। ছেলেটি বিশ্বাসী ছিল। মালতীকেও আমার অবিশ্বাসের কোন কারণ ছিল না।

চিঠির জবাবে মালতী আমাকে খুব শ্রদ্ধা জানাল। আমি যে কষ্ট করে তার জন্যে এতখানি করেছি তাতে তার কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। সারাজীবনেও এই ঋণ সে শোধ করতে পারবে না। ওখান থেকে চলে আসবার তারিখটা দিনতিনেক বাদেই সে ঠিক করল। এ কদিন তার গোছগাছ করতে সময় লাগবে।

আমি খুশী হয়ে ডক্টর মিত্রকে সব জানিয়ে রাখলাম। বুধবার আসবার কথা। বেশ মনে আছে অন্য সব কাজকর্ম ফেলে আমি হাসপাতালে তার খোঁজ নিতে গেলাম। অবাক হলাম, মালতী আসেনি। পরদিন না, তারপরদিনও না। তবে কি কোন অসুখ বিসুখ হল? না কি বাড়িওয়ালী বুড়ী পথ আটকাল? আমি সেখানে খোঁজ নিতে পাঠালাম। আমার লোকজন ফিরে এসে বলল, মালতী মঙ্গলবার থেকে নিরুদ্দেশ। বাড়িওয়ালী গালাগাল করছে। তার নাকি ছ' মাসের ভাড়া মেরে দিয়ে চলে গেছে মেয়েটা। গয়না গাঁটি আসবাব-পত্র সবই আস্তে আস্তে সরিয়েছে। কিছুই আর ধরবার জো নেই।

আমি শুনে স্তম্ভিত হয়ে রইলাম। প্রথমে আমার মনে হল ব্যাপারটা অনিলেরই কীর্তি। সেই আগে থেকে টের পেয়ে মেয়েটাকে সরিয়ে এনেছে। কিন্তু অনিল একথা শুনে খাপ্পা হয়ে উঠল। তার স্ত্রীও স্বামীর এই অপরাধের কথা কিছুতেই স্বীকার করলেন না। অনিল নাকি নিজের ছেলের মাথায় হাত দিয়ে দিব্যি করে বলেছে, মালতীর সঙ্গে তার আর কোন সম্পর্ক নেই।

ডক্টর মিত্র নিজেই একদিন ফোন করে খবর নিলেন, 'কী হে, তোমার মালতীর কী হল? তার জন্যে যে সব ঠিক ঠাক করে রেখেছি।'

আমি তাঁর কাছে লজ্জা আর দুঃখ জানালাম।

ডক্টর মিত্র ফোনের মধ্যে হেসে উঠলেন, 'আরে আমি তখনই বুঝেছিলাম। ওসব ফুল কি আর আমাদের হাসপাতালের বাগানে ফোটে। আমরা কি আর তেমন মালী? যাকগে, পালিয়েছে বাঁচা গেছে। তোমার আর আমার স্ত্রীর বহু ভাগ্য যে, আমাদের দুজনের কাউকেই সঙ্গে নেয়নি। তাঁদের শাঁখা সিঁদুর অক্ষয় হোক।'

আমাদের দুজনের স্ত্রীই শাখা সিঁদুর নিয়ে যেতে পেরেছেন। আমার সেই ডাক্তার বন্ধুটিও আর নেই। তারপর কতকাল গেল। সে কি আজকের কথা। তারপর সংসারের কত কি বদলাল। দিনকাল হালচালের কত কি পরিবর্তন হল। কিন্তু সেই মেয়েটার কথা আজও আমার মাঝে মাঝে মনে পড়ে।'

শৈলেনবাবু চুরুটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন, 'বল কি হে? এই

তোমায় পত্নীব্রত ? তোমার শোবার ঘরে তোমরে স্ত্রীর দামি অয়েল পেইন্টিং-খানা এখনো ঝুলছে যে।'

বন্ধুদের ঠাট্টা গায়ে না মেখে হেমাঙ্গবাবু বলতে লাগলেন, 'এখনো কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে মনে পড়ে যায় সেই মেয়েটাকে। বিশেষ করে যখন রাত্রে নিজের ঘরে চুপচাপ একা একা কাটাই। বইপত্র বন্ধ করে ছাদে গিয়ে অন্ধকারে বসি। জীবনের খাতাটাকে স্মৃতির হাতে ছেড়ে দিই। সে কমবয়সী অবুঝ মেয়ের মত এলোমেলোভাবে পাতাগুলি উলটায় পালটায়। ছেঁড়ে আর জোড়া দেয়।

ভাবি মেয়েটা পালাল কেন ? কার ভয়ে ? কখনো মনে হয় সে কাজকেই ভয় করেছে। ভেবেছে কেন এত খাটব ? ক'টা টাকাই বা আসবে তাতে ? বিনা খাটুনিতে সুখে থাকতে পারলে কে আর খাটতে চায় ? কিন্তু এ ব্যাখ্যা আমার মনঃপুত হয়নি। হয়তো কাজকে সে ভয় করেনি। ভয় করেছে নিজেকে, ভয় করেছে নিজের উপকারী বন্ধুকে। অপকারের লোভকে ভয় করেছে।

তারপর আমি তাকে অনেকবার অনেক রকম খুঁজেছি। কোথাও পাইনি। আর না পাওয়ায় ফলেই হয়তো তার সম্বন্ধে নানা বিচিত্র কল্পনায় আমার মন ভরে উঠেছে। আমি কখনো ভেবেছি সে কলকাতার বাইরের কোন হাসপাতালে নার্সের চাকরি নিয়েছে। কখনো মনে হয়েছে সে ওই বিকৃত জীবনের হাত এড়িয়ে স্বামী সন্তান নিয়ে ঘরসংসার করছে। আমার কল্পনা কিছুতেই তাকে এই ব্রথেলের ক্লেদ ব্যর্থতা বন্ধ্যাত্বের মধ্যে চিরদিনের জন্যে ডুবে থাকতে দেয়নি। কিন্তু আমার বাস্তববোধ সেই আশঙ্কার কথাই আমাকে মনে করিয়ে দেয়। সে হয়তো আছে, ওইসব জায়গাতেই আছে। যাতায়াতের পথে ওসব পাড়ার কাছাকাছি গিয়ে পড়লে আমি তাকে ওসব অঞ্চলেও খুঁজি। নিজের কাছে লজ্জার আর গ্লানির সীমা থাকে না। তবু তাকে একবার দেখতে চাই। আমি যার ভালো করতে চেয়েছিলাম, যার মনে ভালো হবার ইচ্ছাকে জাগিয়ে তুলেছিলাম, একটি সুন্দর উন্মেষ, সার্থক সম্ভাবনা উদ্রেক করে দিয়েছিলাম তার পরিণতিকে প্রত্যক্ষ করবার বাসনা আমি আজও ছাড়তে পারিনি।'

হেমাঙ্গবাবু থামলেন।

ভবেশবাবু নীরব আর নিশ্চল হয়ে রইলেন।

শৈলেনবাবু ছাইদানিটি নিজের কোলের কাছে টেনে নিলেন। হেমাঙ্গবাবু বিড়ি-সিগারেট খান না। তাঁর পুরোন আধখানা ভাঙা একটা ফুলদানিতেই বন্ধুদের ছাইদানির কাজ চলে।

সোহাগিনী

চণ্ডীপুরের মাঠে রায়দের জমির ধান কাটতে নেমেছিল মতি মিঞা, মবছুল শেখ আর বিহারী মণ্ডল। মাঠ তো নয়, সমুদ্র। এবার কার্তিকের শুরুতেই লক্ষ্মীদীঘা ধান পেকেছে। কিন্তু মাঠে জল এখনো তেমনি ঠায় দাঁড়িয়ে। কোমর জলে নেমে তিনজনে ধান কাটছিল। বিঘা তিনেকের ছোট জমি। কতই বা ধান হবে। তাই বেশি কৃষাণ ওরা নেয়নি। অযথা ভাগীদার বাড়িয়ে লাভ কি। একেই তো কর্তাদের অর্ধেক বরাদ্দ বাঁধা আছে। সামনেই লম্বাটে ডিঙি নৌকো। ধান কেটে কেটে তাতেই রাখছিল তিনজনে। আশেপাশে এমন ডিঙি নৌকো অনেক আছে। আরো কয়েকখানা জমির ধানও পেকেছে। কাজী আর শিকদারদের জমিতেও ধান কাটা শুরু হয়েছে। কাজ করতে করতে নিজেদের মধ্যে গল্প-গুজব করছিল চাষীরা। বেলা দুপুর গড়িয়ে গেছে। মাথার ওপর সূর্য জ্বলছে, পেটে ক্ষিদের আগুন। তবু কারো হাত কামাই নেই, মুখ কামাই নেই। দু বছর বাদে এবার ধানের খন্দ ভালো হয়েছে। কেটে ঝেড়ে তুলতে না পারলে বউ ছেলে খাবে কি। খাওয়া-পরায় বড় কষ্ট। তিনজনের মধ্যে মতি মিঞার হাতই বেশি বড় ছিল। গোছে গোছে ধান কেটে রাখছিল নৌকায়। ধান তো নয়, সোনা। কোথায় লাগে এর কাছে বাবু ভুঁইয়াদের পরিবারের গলার সোনা, কানের সোনা। মতি মিঞার বয়স পঞ্চাশ ছাড়িয়েছে। মুখের কালো চাপ দাড়ির রঙ এখন কটা। কিছু কিছু পেকে সাদাও হয়েছে। মাথার কোঁকড়ানো বাবড়ি চুলও অর্ধেকের বেশি পেকেছে। বেশ লম্বা চওড়া চেহারা মতি মিঞার। ছড়ানো পিঠ, চেপ্টা বুক। পিঠও খালি নয়, বুকও খালি নয়। পিঠভরা দাদ আর বুকভরা লোম। মতি মিঞা বলে, 'মেঞ্যারা, দাউদে আমার কোন ঘেন্নাপিত্তি নাই, অসোয়াস্তিও নাই। আমি মলম ফলম কিছু লাগাই না। দাউদ আমি পুষি। আমার বিবির জন্যে পুষি। ঘরে যদি পছন্দসই, মনের মতন বিবি থাকে দাউদে ভয় কি তোমার। কিন্তু একটা কথা। তার পরণে শাড়ি আর প্যাটে দানাপানি পড়ন চাই। নইলে সে তোমারে আস্ত রাখবে না। তোমার মুখের দাড়ি আর বুকের লোম সবটাই ছেঁড়বে।'

ভারি রসিক মতি মিঞা। বয়স যত বাড়ছে তত যেন রসের ফোয়ারা ছুটছে। তবু যদি চালে টিন আর গোলায় ধান থাকত মতি মিঞার। তাহলে ফোয়ারা আর ফোয়ারা থাকত না। সমুদ্দুর হত। আর তাতে গাঁ-শুদ্ধ লোক সাঁতার কাটত। কিন্তু ছেলেপুলে নিয়ে বড় কষ্টে আছে মতি মিঞা। গোড়ার দিকে কতকগুলি মেয়ে হয়েছে, শেষের দিকে ছেলে। সব মিলিয়ে গুটি দশেক। বাপকে সাহায্য করবার বয়স তাদের হয়নি। তাকে একাই খেটে খেতে হয়।

কিন্তু মাঠে তো ঘরের বিবি নেই, নিজের হাতেই এখানে দাদ চুলকিয়ে নিতে হচ্ছিল মতি মিঞার। মাঝে মাঝে পায়ের থোড়া থেকে জোঁকও ছাড়াতে হচ্ছিল। তবু তার কাঁচি যত জোরে চলছিল তেমন আর কারও নয়। মবতুল এদের মধ্যে বয়সে ছোট। তেইশ-চব্বিশ বছরের বেশি হবে না তার বয়স। লম্বা ফর্শাপানা চেহারা। থুতনির ডগায় কালো দাড়ি। জোয়ান বয়সের ছেলে। কিন্তু আজ যেন তার হাত নড়ছিল না। বড় আনমনা দেখাচ্ছিল তাকে। মতি মিঞা তা লক্ষ্য করে বলল, 'কি রে মবতুল, তোর হইছে কি আইজ? কাজে বুঝি মন লাগছে না? নাকি ক্ষিদা লাগছে। তামুক খা, তামুক খা।'

তামাক আগুন হুঁকো কলকের ব্যবস্থা নৌকোতেই আছে। বিহারী মণ্ডল নৌকোর কাছে গিয়ে তামাক সাজতে শুরু করল। তার চেহারা বেঁটে খাট, বয়স চল্লিশের কাছে। কলকেয় আগুন তুলতে তুলতে সে হেসে বলল, 'মেয়া-ভাই, তামাক খাওয়াইয়া আইজ আর ওয়ারে চাঙ্গা করতে পারবা না। আইজ ওয়ার বিবির ব্যথা ওঠছে। ঘরের খুঁটি ধইরা কাতরাইতেছে সে। আইজ কি আর ধান কাটায় ওয়ার মন লাগে?'

মতি মিঞা উৎসুক চোখে মবতুলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'সাচাই নাকি?'

মবতুল লজ্জিত হয়ে বলল, 'হ।'

'এই পেরথম পোয়াতী?'

'হ।'

মতি মিঞা এবার একটু উদ্বেগের স্বরে জিজ্ঞাসা করল, 'দাইটাইর ব্যবস্থা কইরা আইছিস তো?'

মবতুল বলল, 'তা করছি। মা আছে, আমার বড় বুইনও আইছে। তবু—'

বিহারী হুঁকোয় টান দিয়ে হেসে বলল, 'তবু আমাগো মবদুলের ভাবনা যায় না। ও নিজেই যেন পোয়াতী হইয়া রইছে। ব্যথাডা যেন ওয়ারই।'

মতি মিঞা সহানুভূতির সঙ্গে বলল, 'হাইসো না মণ্ডল, হাইসো না। পেরথম পেরথম ওই রকম হয়। যে পোয়াতী সে নিজের ব্যথা ছাড়া আর কিছু টের পায় না। যে সোয়ামী তার দুইজনের ব্যথা সইতে হয়।'

বিহারী হেসে উঠল, 'ও ভাই মতি মিঞা, তোমারও কি সেই দশা হয় নাকি?'

মতি মিঞা স্বীকার করে বলল, 'হয়। কিন্তু এখন আর ততটা না। এ ব্যাপারে চূড়ান্ত কষ্ট আমি পাইছিলাম ওই মবদুলের মত বয়সে। নিজের পরিবারের জন্যে না, পরের পরিবারের জন্যে।'

বিহারী মণ্ডল বলল, 'তাই নাকি? বড় মজার কথা তো। রসের কথায় ক্ষিদেতেষ্টা দূর হয়। কও শুনি।'

মতি মিঞা সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ করল না। নীরবে নিজের মনে ধান কাটতে লাগল। খানিকটা সময় নিল কালের সাগর পাড়ি দিয়ে বহু দূরে ফেলে-আসা তার সেই প্রথম যৌবনের উপকূলে পৌঁছতে। বিহারী তাড়া দিয়ে বলল, 'কও কও, আরম্ভ কর।'

মতি মিঞা বুঝতে পারল তার দুজন সঙ্গীই ধানে কাস্তে চালাতে চালাতে কান আর মন তাকে সমর্পণ করে রেখেছে। কিষাণরা গল্প বড় ভালোবাসে।

মতি মিঞা আরও এক গোছা ধান নৌকোয় তুলে রেখে আস্তে আস্তে আরম্ভ করল, 'সে বড় সরমের কথা মণ্ডল ভাই। কইলাম তো তখন ওই মবদুলের মতই বয়স আমার। মবদুলের চাইতেও ছোট। গায়ে গতরে রক্ত তখন টগবগ করে। সেই বয়সে আমি একজনকে ভালোবাসছিলাম। না আমাগো জাতের ধম্মের কেউ না, তোমাগো জাতের তোমাগো ধম্মের, তোমাগো গুষ্টীরই মাইয়া। এখন আর নাম করতে দোষ নাই। বদন চৌকিদারের ছোট মাইয়া তুফানী। সেই তুফানী আমার শিরায় শিরায় রক্তের তুফান ছুটাইছিল।'

অথচ তুফানীকে প্রায় ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছে মতি মিঞা। বয়সেও মেয়েটা তার চেয়ে দশ-বার বছরের ছোট। আম জাম আর খেজুর কুড়াতে মতি মিঞাদের বাগানে আসত। বদন চৌকিদার আর মতি মিঞার বাপ রজ্জাক সিকদার প্রতিবেশী ছিল দুজনে। রজ্জাকের গরু বদনের বাড়ির কলাগাছে কি লাউ কুমড়োর মাচায় এসে মুখ লাগাত, আবার বদনের গরু

ছাগলও রজ্জাকদের মূলো আর মরিচের ক্ষেত মুড়ে খেত। কেউ কাউকে সহজে ছেড়ে দিত না। ঝগড়াঝাটি হত। গালাগাল দিয়ে দু-পক্ষই দু-পক্ষের চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করত। কিন্তু মিলমিশ হতেও বেশি দেরি লাগত না। দুজনের গলায়-গলায় ভাব ছিল। রজ্জাক আর বদনের। তারা প্রায় একই ধরনের চাষী গৃহস্থ। একসঙ্গে মাঠে খাটত, বর্ষার সময় এক নৌকোয় হাটে যেত। তাদের চালচলন শোয়াবসা সব একরকম ছিল। শুধু পুজো আর্চার সময় বদন পৈতেধারী পুরুত ডাকত আর রজ্জাক তিন ওক্ত নামাজ পড়ত, বিয়ে-সাদির সময় মোল্লা মৌলবীকে ডেকে আনত। অন্য কোন ব্যাপারে তারা আলাদা ছিল না।

বলতে বলতে সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে মতি মিঞা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, 'সেই দিন কাল আর নাই মণ্ডল ভাই। কালে কালে দেশের কি হালই হইল। ভাগভেন্ন হইয়া তছনছ হইল দেশ। কারো কোন লাভ হইল না।'

মতি মিঞার বাপ আর বদনরা যে আলাদা জাত ধর্মের তা বুঝতে তার সময় লেগেছিল। বুঝবার পরেও মানতে চায়নি। ওই তুফানীর জন্যেই যে মন অত অবুঝ হয়ে উঠেছিল, তা তার টের পেতে বাকি ছিল না। এদিকে তুফানীও আস্তে আস্তে ডাগর হয়েছে। ছেলেছোকরাদের দিকে তাকায় আর ফিক ফিক করে হাসে। কিছু ভেবে হাসবার মত বুদ্ধি ওই ন-দশ বছরের মেয়ের তখনও হয়নি। কিন্তু তার হাসি দেখতে, মুখ দেখতে বড় ভালো লাগে মতিমিঞার। যেমন টুকটুকে রঙ, তেমনি গড়ন, তেমনি মুখে শ্রীছাঁদ। টানাটানা নাক চোখ। পাতলা ঠোঁট, সাদা ফুলের মত দাঁতের সারি। মতিমিঞা সেই মুখের দিকে তাকিয়ে থাকত। দুজনের বাড়ির মাঝখানে যে বড় বাগানটা ছিল, যে বাগান এখন রায়রা কিনে নিয়েছে, সেই বাগানে আম জাম কুড়োতে তুফানী এলে আগের মত মতিমিঞা আর তাড়া করত না। বরং হাতের ইশারায় কাছে ডাকত। কিন্তু তুফানী বড় সেয়ানা মেয়ে। সে আরও সরে গিয়ে ভেংচি কাটত। হেসে পালিয়ে আসত বাড়িতে। ঘরে তার মা ছিল না, ছিল দূর সম্পর্কের এক বিধবা পিসী। লোকে বলাবলি করত রাত্রে সে-ই মা সাজে তুফানীর। কিন্তু তার নিজের চরিত্র যাই হোক, বড় জাঁদরেল মেয়েমানুষ ছিল তুফানীর সেই পিসী। যেমন কাঠখোট্টা চেহারা তেমনি স্বভাব। সে বড় একখানা দা আর মুড়ো ঝাঁটা উচিয়েই রাখত। তার ভয়ে ও বাড়ির ত্রিসীমানায় কেউ ঘেঁষতে পারত না। কিন্তু মতিমিঞাদের সঙ্গে ছিল আলাদা সম্পর্ক। তারা বদনের

দরকারের সময় সাহায্য করত, ধান ধার দিত, শস্ত বোনা কি কাটার সময় বেগার দিত, ধান মলনের সময় জোড়া বলদ দিয়ে সাহায্য করত। চৌকিদারের বাড়িতে মতি আর তার বাবার আলাদা খাতির ছিল। তা দেখে মতির স্বজাতের পড়শীরা ঠাট্টা করত, 'চকিদার তোরে জামাই করবে মতি।'

মতি চটে উঠে বলত, 'করবেই তো। তোরা শালারা জ্বইলা পুইড়া মর।'

কিন্তু জ্বলে পুড়ে মরতে হল মতিকেই। দুদিন বাদে তুফানীর বাপ আর পিসী পাশের গ্রাম পীরপুরের বনমালী ভক্তের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিল। ভক্তদের অবস্থা ভালো। চাষের জমি ছাড়াও মিস্ত্রীর কাজকর্ম করে। ঘর তোলায় ওদের বেশ নামডাক। এই সব দেখেশুনেই বদন মেয়েকে ও ঘরে দিল। টাকা পেল পাঁচ কুড়ি। কিন্তু নাম যেমন আছে বদনের জামাইর দুর্নামও তেমনি। বয়স বেশি, নেশাভাঙ করে। গোপনে কোথায় রাঁড়ও রেখেছে। এ সব কথা শুনে মতিমিঞা মনে মনে বড় খুশি হল। বেশ হয়েছে, আচ্ছা জব্দ হয়েছে ওরা। শুধু দুঃখ হত তুফানীর মুখের দিকে চেয়ে। সে মুখ কেমন যেন ভার-ভার। সে মুখে সেই আগের মত ফিক ফিক হাসি আর নেই। বিয়ের পর তুফানীর পিসী তাকে নিজের কাছে নিয়ে এল। বলল, 'মাইয়া বড় হউক, ফলটল দেখুক তখন পাঠাব। এখন দেব না। তোমাগো ছাওয়াল তো এক অসুর। এখন দিলে কাচাই গিলা খাবে।'

এই নিয়ে জামাইর সঙ্গে বদন চৌকিদারের বেশ মনকষাকষি হল। কিন্তু মেয়েকে ওরা ছাড়ল না।

একদিন পিসী যখন গাঙের ঘাটে নাইতে গেছে তেমনি এক ফাঁক খুঁজে মতিমিঞা এসে দেখা করল তুফানীর সঙ্গে।

'কি তুফানী, কেমন আছিস ?'

'ভালো।'

'সোয়ামী নাকি তোরে মাইর ধইর করে ?'

'না না। কেডা কইল ?'

মতিমিঞা বলল, 'কবে আবার কেডা। কয় আমার মন। তোর মুখ দেইখা কয়।'

তুফানী অস্বীকার করে বলে, 'তোমার চউখ দেখতে জানে না মেঞা।'

ছেলেবেলা থেকেই তুফানীর চোখেমুখে কথা।

মতিমিঞা বলল, 'তয় বুঝি সোয়ামী খুব আদর যত্ন করে ?'

তুফানী বলল, 'তা তো করেই। কার সোয়ামীই বা তা না করে?'

মতিমিঞা বলল, 'সে আদরের এমনই ঠেলা যে, পরাণ সামলানো দায়।'

তুফানী লজ্জিত হয়ে মুখ নামাল। একটু বাদে বলল, 'তুমি এখান থিকা চইলা যাও মতিমিঞা। ও সকল কথা তুমি কইও না। আমার শোনা পাপ।'

মতিমিঞার মনে মনে বড় রাগ হল। সে তো তুফানীর কাছে আর কিছু চায় না, শুধু শুনতে চায় বিয়ের পর সে সুখী হয়নি। তার এই সুখী-না-হওয়াতেই সুখ মতিমিঞার। কিন্তু এটুকু সুখও তুফানী তাকে দিতে নারাজ। সে কেবল বলে, 'তুমি যাও, তুমি চইলা যাও।'

যেতে তো চায় মতিমিঞা। কিন্তু যেতে পারে কই। তুফানীর মুখ তাকে টানে। দিনের মধ্যে দু-একবার ওই মুখখানা দেখতে না পারলে কাজকর্মে সুখ নেই, খেয়ে বসে স্বস্তি নেই। মতিমিঞার মনে হয়, বিয়ের পর তুফানীর মুখ যেন আরও বেশি সুন্দর হয়েছে। কি করে হল? সে কি ওর সিঁথির সিঁদুরে? গা-ভরা রূপার গহনায়? গলায় সোনার হারের চিকচিকানিতে? নাকি মনের দুঃখ আর অশান্তির আগুন ওর দেহকে পুড়িয়ে পুড়িয়ে খাঁটি সোনা করেছে। কিন্তু তুফানী ওকে ভিতর থেকে যতই টানুক, বাইরে থেকে দু হাত দিয়ে কেবলি ঠেলে, বলে, 'আইস না, আইস না। ভালোবাইস না, বাইস না। জাইত মান নিয়া আমারে শান্তিতে থাকতে দাও।'

তুফানীর আরও বয়স বাড়ে, ও পুরো মেয়েমানুষ হয়ে ওঠে। রূপের গরিমায় যেন ফেটে পড়ে। আর তা দেখে হিংসায় ঈর্ষায় বুক ফাটে মতিমিঞার।

বাপ বলে, 'মতি তুই সাদি কর।'

মতি বলে, 'বাজান এখন না।'

মা বলে, 'ক্যান?'

মতি বলে, 'আমার মন লয় না।'

মা বলে, 'ভরানাইশা, পোড়াকপাইলা, তোর মন যে কোথায় পইড়া আছে তা কি আর আমার বোঝন বাকি? আউ বাবা ছিঃ! পরের বউর পাছে পাছে অমন ঘুর ঘুর করিস না। মানুষ তাতে নষ্ট হয়, গোল্লায় যায়। তুই একবার মুখের কথা খসা বাজান, আমি একটা ক্যান তিনডা মাইয়া তোরে আইনা দেই।'

মতি বলে, 'ও কথা কইও না মা। আর যা কবা তাই শোনব, কিন্তু বিয়া-সাদিতে আমার মন নাই।'

মতির মা নিঃশ্বাস ফেলে বলে, 'তোরে যে রোগে ধরেছে, কারো সাধ্য নাই সারায়। এখন আল্লার দোয়া ভরসা।'

বনমালী মাঝে মাঝে অনেক দূরে দূরে মিস্ত্রীর কাজ করতে যায়। বড় বড় ঘর তোলে। স্ক্রু বল্টু দিয়ে শক্ত করে করোগেটের টিন লাগায়। ঢালা পেটে। দুই-তিনজন মিস্ত্রী তার হুকুমে কাজ করে। ফিরে যখন আসে বউর জন্মে তেল, সিঁদুর, আলতা আর লাল নীল হলদে রঙের বাহারের শাড়ি আনে। কিন্তু এত করেও বউর মন পায় না। বনমালী গাঁজা খায়, নেশায় তার চোখ দুটো জবাফুলের মত লাল হয়ে থাকে, গলার স্বর খসখস করে। তুফানীর এ সব পছন্দ হয় না। সে বলে, 'তুমি ওই নেশাভাঙ ছাইড়া দাও।'

বনমালী মুখ ভেংচিয়ে ধমক দেয়, 'দূর শালী। গ্রামগঞ্জে কোন্ শালা গাঁজা না খায় শুনি। নেশা না করলে এত খাটা যায়? এত পয়সা কামান যায়? আসলে মন রইছে তোর সেই মোছলার কাছে। আমারে তোর পছন্দ হবে ক্যান? আমি যা করি তাই খারাপ। আমি দুনিয়া ভইরা ঘর তুইলা বেড়াই আর ওই মোছলা তলে তলে আমার ঘর ভাঙে। বড় হাতুড়ি দিয়া ওর মাথা ভাঙব তবে ছাড়ব। বাটাইল দিয়া নাক চউখ তুইলা ফেইলা মুখখানারে লেপা পোছা কইরা দেব।'

তুফানী স্বামীকে থামায়, 'চুপ কর, চুপ কর। তুমি কি পাগল হইলা।'

স্বামী-স্ত্রীর এই ঝগড়া অবশ্য মতিমিঞা কোনদিন আড়ি পেতে শোনেনি। কিন্তু পীরপুরের বনমালীদের বাড়ির ধার দিয়ে তো আরও পাঁচ ঘর পাড়াপড়শী আছে তারাই এ গাঁয়ে এসে গল্প করে। আর সেই গল্প সাতখানা হয়ে মতিমিঞার কানে যায়। নিজের নিন্দা মন্দ শুনে রাগে অবশ্য টগবগ করে মতি। কিন্তু যে বনিবনাও হচ্ছে না এই গোপন খবরটা ওই সব গাল গল্পের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে। আর মতি তা শুনে খুশি হয় আর ভবিষ্যতের ভরসায় থাকে। স্বামীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তুফানী একদিন তার কাছে ধরা দেবে, তার ঘরে এসে উঠবে, তার বিবি হয়ে থাকবে। ভবিষ্যতের সেই সুখস্বপ্ন দেখে মতিমিঞা। রাত্রেও দেখে, দিনেও দেখে। ঘুম আর জাগরণ তার ওই এক স্বপ্নে একাকার হয়ে যায়।

তাই বলে মতিমিঞা যে নিজাম পাগলা হয়ে বাউল-বাউণ্ডুলের মত ঘুরে বেড়ায় তা নয়। গেরস্থ ঘরের ছেলে সে। সব কাজই তাকে করতে হয়।

মাঠের কাজে খাটে। লাঙল চালায়, ধান পাট বোনে, কাটে ধোয়, শস্য ঘরে তোলে। যখন ক্ষেতের কাজ থাকে না বাপ-বেটায় দুজনে মিলে ঘরামির কাজ করে, মাটি কাটে, কাঠ চেলা করে, বড় বড় গাব গাছ ধারালো কুড়ুলের ঘায়ে চিল চিল হয়ে যায়। বাপের চেয়ে অনেক বেশি জোয়ান হয়েছে মতিমিঞা। গায়ে গতরে অনেক ছাড়িয়ে গেছে। ছেলের দিকে তাকিয়ে মতির বাজান সুখের হাসি হাসে। গামছা দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বলে, 'হারামজাদা, তুই তোর বাবার বাবা হইছিস। এবার আমার মারে আইনা দে। আমি নাতিপুতির মুখ দেখি।'

মতি বলে, 'সবুর বাজান। আর দুইটা দিন সবুর কর। আর দুইটা পয়সার মুখ দেইখা লও আগে।' বলে আর মনে মনে আর একখানা মুখ ধ্যান করে। কবে সেই চাঁদের মত মুখ নিজের বুকের মধ্যে গুঁজে ধরতে পারবে। বেহেস্তের সুখ পাবে ছেঁড়া কাঁথার তলায়। তাকে ছাড়া চৈত মাসের মাঠের মত মতির এত বড় লম্বা চওড়া বুকখানা যে খাঁ-খাঁ করে। মাঠ ফেটে চৌচির হয় তা সবাই দেখে, কিন্তু বুক ফেটে যে চৌচির হয় তা চোখে পড়ে কজনের। দুই-একজন দোস্ত শুধু মনের ব্যথা বোঝে মতিমিঞার। সেখেদের রহিমুদ্দিন, খাঁদের কাজল সর্দার তাকে প্রায়ই বলে, 'মতিভাই, তুমি একবার হুকুম দাও, ওই গাঁইজাল মাইজমরা মিস্ত্রীর পরিবারকে আউড়া কোলে কইরা নিয়া আসি। আইনা তোমার কোলে ফেলাইয়া দিই।'

লোভে মতির চোখ দুটো জ্বল-জ্বল করে। কিন্তু পরক্ষণেই মরা মাছের চোখের মত তা ফ্যাকাশে হয়ে যায়। তুফানী যে সত্যিই তা চায় একথা তো সে কোনদিন বলেনি। বরং মতি এসব ইঙ্গিত দেওয়ায় সে উল্টো কথাই বলেছে। 'খবরদার মেঞা, ওদের কথা কইয়ো না। ও কথা শোনাও পাপ।' কিন্তু মতিকে দেখলে তুফানী যে জোয়ারের গাঙের মত আহ্লাদে উছলে ওঠে, তুফানী যে তার সঙ্গে কথা বলতে ভালোবাসে, সেজেগুজে তার সামনে দাঁড়াতে ভালোবাসে, নানা ছলে মাথার আঁচল ফেলে দিয়ে শজারুর কাঁটা দিয়ে বাঁধা খোঁপাটি তাকে দেখাতে ভালোবাসে, স্বামীর বাড়িতে যাবার সময় কাঁচ পোকার টিপ যেদিন পরে সেদিন লক্ষ্মীর আসনের জন্যে ফুল দুর্বা তোলার ছল করে পথের ধারটিতে এসে দাঁড়ায়। এসব কি কোন পুরুষের চোখে না পড়ে পারে?

মতিমিঞার দোস্তরা বলে, 'মেঞাভাই, মাইয়ামানুষ নিজের মনের কথা নিজেই টের পায় না। তারা কেবল ঢাকে, কেবল ঢাকে। ঘোমটা দিয়া মুখ

ঢাকে, ধরম শরম দিয়া মন ঢাকে। যে পুরুষ জোর কইরা সব পর্দা টাইনা সরাইতে পারে, বেপর্দা করতে পারে যে, মাইয়া মানুষ তার। ওরা চায় জুয়ান মরদরে। ওরা ডাকাইতের দিকে কাইত হইয়া শোয় মেঞা-ভাই, পায়ের তলার মেনি বিড়ালরে বাও পাও দিয়া লাথি মারে। তুমি তোমার পথ বাইছা লও। হয় ডাকাইত হও, না হয় পোষা কুকুর-বিড়াল হইয়া আইটা কাটা খাইয়া থাক।'

এ তো কেবল দোস্তদের কথা নয়, মতিমিঞারই একটা মন দুই ভাগ হয়ে ঠোকাঠুকি করে। মন স্থির করতে পারে না মতিমিঞা।

মাঝে মাঝে বনমালী শ্বশুরবাড়িতে বেড়াতে আসে। তুফানী যখন থাকে তখনই আসে। মাঠে-ঘাটে, জেলা বোর্ডের রাস্তার ধারে মতিমিঞার সঙ্গে যখনই তার চোখাচোখি হয়, মনে হয় সে যেন কট কট করে তাকায়। চোখ দুটো লাল টক টক করে। হতে পারে গাঁজার জন্যেই অমন হয়। চোখে রাগ থাকলেও বনমালী কিন্তু মুখে হাসে, বলে, 'কি মেঞাসাহেব, দিনকাল কাটতেছে কেমন।'

মতিমিঞা বলে, 'ভালো।'

কিন্তু বনমালীর চাপা হাসি আর গাঁজা খাওয়া গলার তামাশা মস্করা শুনে রাগে তার গা জলে যায়।

বনমালী বলে, 'ভালো হলেই ভালো। এবার আম কাঁঠালের ফলনটা বেশ ভালোই হইছে না? পাকা কাঁঠালের গন্ধে গ্রাম-গঞ্জ ভইরা গেছে। আমার বাড়িতেও কাঁঠাল গাছ আছে মেঞা। একটা গাছে যা কাঁঠাল তা তোমারে কব কি। দেখতে যেমন বড়, ভিতরের কোয়াগুলিও তেমনি রসথাজা। দেখলে তোমার জেহবা দিয়া টস টস কইরা জল পড়বে মেঞা। আমাগো ওদিকে একটা কটা আছে। তারও জল পড়ে। শালার কটা রোজ আমার ঘরের চালে আইসা একবার কইরা হানা দেয়। কিন্তু কাঁঠালের ধারে কাছে যাইতে পারে না। শক্ত জাল দিয়া খুব কইরা ঘিরা রাখছি। শালার কটা আসে আর ফিরা-ফিরা যায়। আইচ্ছা জব্দ। কি বল মেঞাসাব?'

বনমালী বলে আর মুখ টিপে টিপে হাসে। ওর কথার মানে যে কী তা বুঝতে বাকি থাকে না মতিমিঞার। গায়ের রাগে হাত দুটো নিসপিস করে। ইচ্ছা করে তড়াক করে গিয়ে টিপে ধরে ওর গলা। যা লিকলিকে চেহারা একখানা। একবার ধরলেই ভবলীলা সাঙ্গ। কিন্তু কেন যেন হাত ওঠে না

মতিমিঞার, মনে মনে এত গজরানি, কিন্তু মুখ দিয়ে কথা ফোটে না। বনমালীর বিদ্রূপ তার বুকে বর্শার মত বেঁধে। মতিমিঞা ভাবে আর একটু স্পষ্ট করে কথা বলুক, আর একটু সুযোগ তাকে দিক বনমালী, আর সেই অজুহাতে মতি তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলুক। কিন্তু বনমালী বড় সেয়ানা। সে মতি মিঞার চোখের ভাবভঙ্গি দেখে, আর কথা বাড়ায় না আর এগোয় না, এক দু পা করে পিছোতে থাকে। মতিমিঞা মনে মনে বলে, 'যা শালা, বাইচা গেলি।'

তারপর ঘটল সেই চূড়ান্ত ঘটনা। সে ঘটনা নিয়ে অনেকদিন পর্যন্ত মতিমিঞাদের পাড়ায়, ঘাটে মাঠে লোকে গালগল্প করেছে, জটলা করেছে, গুজব ছড়িয়েছে, পরাণ শীল ছড়া পর্যন্ত বেঁধেছিল। সেই ঘটনার দিন এল।

ভাদ্র মাসের সংক্রান্তির দিন বিশ্বকর্মা পূজা। সে পূজা হিন্দুদের ছুতার কামাররাই করে। কিন্তু সেই উপলক্ষে নদীতে যে নৌকা বাইচ হয়, তাতে মুসলমানরাও যোগ দেয়। তাদের নৌকাই বরং বেশি থাকে। যাদের অবস্থা বড়, শখও বড়, তারা নিজেরাই নৌকা কেনে। আর যাদের শখ আছে, কিন্তু টাকার জোর নেই তারা পরের নৌকায় বৈঠা বায়। গুণতিতে তারাই বেশি, দলে তারাই ভারি। মতিমিঞাও সেই দলে। নৌকা না থাকলে কি হবে বইঠাখানা তার নিজের। তার গায়ে যেমন জোর মনে তেমনি কলাকৌশল। 'বাইছা' হিসেবে সবাই তার নাম করে ভিন গাঁ থেকে লোকে তাকে বায়না করতে আসে। তারা বলে, 'মেঞা' তুমি আমাগো নায় আইস। মান নাই মার কাছে, মান নাই গাঁর কাছে। তোমারে আমরা টাকা দেব, কাপড় দেব, উড়নি দেব।' কিন্তু প্রতিবেশী মেহের মুন্সীর ছেলে সোনা মুন্সীর সঙ্গে তার লেংটা বয়স থেকে দোস্তি। তাদের আছে নৌকা। সোনা মুন্সী মতিমিঞাকে অত সব দেয় না, কিন্তু জিতলে পরে ভাই বলে দোস্ত বলে বুকে জড়িয়ে ধরে। তাকে কি ছেড়ে যাওয়া যায়। মতিমিঞা মুন্সীদের নৌকোতেই বেশিরভাগ ওঠে। কোন কোনবার বন্ধুকে বলে কয়ে বাইরে যায়। নাম যশ একটু বাড়িয়ে নেবার জন্যে। মনে মনে ভাবে, তার যশ তুফানীর শ্বশুরবাড়িতে তার কানে গিয়ে পৌঁছুক, তার কানের সোনা হোক, গলার হার হয়ে থাকুক। যশ চায় মতিমিঞা। কিন্তু সোনা মুন্সী সেবার তাকে ছাড়ল না, হাত ধরে তার নৌকোয় নিয়ে তুলল। সেবার নদীতে খুব নৌকা হয়েছিল। পঞ্চাশ ষাটখানা

তো হবেই। আর সেই বাইচ দেখবার জন্যে বিশ পঁচিশখানা গাঁয়ের লোক জড় হয়েছিল কুমার নদীর তীরে। তীরে মানে নৌকায়। বর্ষার সময় ডাঙা বলে কোন পদার্থ নেই। সব জল আর জল। মাঠ ঘাট হাট বাজার সব জলের নিচে। কিন্তু মানুষ তো আর মাছ নয় যে জলের নিচে থাকতে পারবে, ডাঙা তার চা-ই। ডিঙি নৌকো, পানসি নৌকো, দাঁড়ের নৌকো এক নৌকোই কত রকমের। আবার ছোটর দিকে যাও, কলার ভেলা, তালের ডোঙা তাও আছে। কোন রকমে একটা কিছুকে ধরে একটুখানি জলের ওপর ভেসে থাকতে পারলেই হল। তাহলেই রাজা। ডাঙার রাজা মানুষ। কোন রকমে মাথাটা জাগিয়ে শ্বাস প্রশ্বাস নিতে পারলেই তাকে আর পায় কে।

তুফানীর কথা ভুলে গিয়ে মতিমিঞা সঙ্গীদের কাছে সেদিনের নৌকা বাইচের বর্ণনা আরম্ভ করল। চেয়ে দেখল সঙ্গীদের হাতের কাস্তে সমানে চলছে। তাদের ডিঙি নৌকোখানা সোনার বরণ পাকা ধানে বোঝাই হয়ে এল বলে। মতিমিঞা হেসে বলল, 'আর এক ছিলুম তামুক খাও মণ্ডল ভাই। তেমন বাইচ আজইকাল আর হয় না। হবে কেমনে। মাইনষের মনের সেই ফুর্তিই নষ্ট হইয়া গেছে। আর তত মানুষই বা কই। হিন্দুরা চইলা গেল। কতজনে না বুইঝা গেল, বিনা ভয়ে ডরাইল। কানা হইয়া গেল দেশটা। কানা ছাড়া কি। হিন্দু আর মোছলমান একই সুন্দরী মাইয়া মাইনষের সুর্মা পরা দুই চউখ। এক চউখ কানা হইয়া গেলে কি আর এক চউখের শোভা থাকে। সেকালে খুব নৌকা বাইচ হইত। মানুষের মনের আনন্দ আহ্লাদ যেন গাঙের জলে গইলা গইলা পড়ত। সেবারও খুব ফুর্তি হইছিল। সকাল থিকাই মুন্সীগো নাও ধোওয়া পাকলা শুরু করলাম। সে কি নাও একখানা। ষাইট হাত লম্বা। আর তার কি বাহারের গলুই। দুই পাশে বড় বড় বিশ পঁচিশটা কইরা পিতলের চউখ। মাইনষে সোনার চউখে সেই দিকে চাইয়া থাকত। দেখত সোনা। খাজুরের সলতা দিয়া আমরা বাইছারা সেই নাওরে ঘইষা ঘইষা চকচক কইরা ফেললাম। তেল পরাইলাম, সিন্দুর পরাইলাম। নাও তো না, যেন মাইয়া, তরী তো না যেন পরী। আর সে কি রাঙা গলুই মেঞা ভাই। জলে নামাইয়া দুই চাইরখানা বইঠা ছোয়াইলেই সে নৌকার লম্বা সরু গলুই থরথর থরথর কইরা কাপে। যেন ষোল বছরের মাইয়া পোলার উদ্‌লা বুকের ডগা। বাইছারা মিলা নাও নিয়া চললাম ঘাটে। আসল বাইচ ভাঙার বন্দরে। গাঙে জল বইলা কিছু নাই, সব নৌকা; বন্দরে বাড়িঘর দোকানপাট বইলা কিছু নাই।

সব কালা কালা মাথা। পঞ্চাশ হাটের মানুষ আইসা এক ঘাটে জোটছে। ভিড় হবে না! পুলিসের বোট ঘোরতে লাগল। বিবাদ বিসংবাদ লাগলে তারা থামাবে। মুন্সেফবাবু, বড় বড় উকিলবাবুদের মাইয়া পোলারা পানসিতে ওঠল বাইচ দেখবার জন্যে। অন্য দিন তাদের দেখলে মানুষ ভুলুক টুলুক দেয়। কিন্তু আইজ নৌকার দিকেই মাইনসের চউখ। আইজ আর নাওয়ের চাইয়া সেরা মাইয়া কেউ নাই। খুব জোর বাইচ হইছিল সেবার মণ্ডল-ভাই। মবদুলের মনে না থাকলেও তোমার একটু একটু মনে থাকবার কথা। যাইট পঁয়ষট্টিখান বাছারি নৌকা নামল। ছোটখাট নৌকা আর সেদিন গোণে কেডা। খোদার দোয়ায় আমরাই জেতলাম। পাঁচখানা সেরা বাইছের নৌকার ভিতর থিকা মুন্সীগো নাও তরতর কইরা বাইর হইয়া আসল। মুন্সেফবাবুর বড় কলসটা আমরাই পুরস্কার পাইলাম। সোনা মুন্সী নাচতে নাচতে আমারে আইসা জড়াইয়া ধইরা কইল, 'দোস্ত, এ কলস তোমার। এ নাওয়ের তুমিই বড় বাইছা।' দুইজনে ঘামে নাইয়া উঠছি। গায়ের সেই ঘাম আর মনের সেই আহ্লাদ যেন আঠার মতো আমাগো দুইজনারে লাগাইয়া রাখল। খুব ফুর্তি কইরা আমরা ফিরা চললাম। বাইছারা সব হৈ হৈ করে। দশ টাকার মিঠাই কিনা দিছে সোনা মুন্সী। তাতে তো প্যাট ভরে না। চিড়া গুড়ও খাইতে খাইতে গান গাইতে গাইতে চলছি। কাপুইড়া সদরদির মোল্লাদের ঘাটের কাছাকাছি আইসা ঘটল এক কাণ্ড। পীরপুরের তালুকদারগো নৌকার গলুই আমাগো নৌকার ওপর উইঠা পড়ল। তারা বলে, 'তোগো দোষ', আমরা বলি, 'তোগো দোষ'। শুরুতে তর্কাতর্কি, গালাগালি। তারপর দুই নৌকার খোলের ভিতর থিকা রামদাও, সড়কি, বর্শা বাইর হইয়া পড়ল। আমার বাইছারা কেউ বইঠা থুইয়া দাও নিলাম, বর্শা নিলাম, কেউ কেউ বইঠারেই অস্তর করলাম হাতের। কাইজা খুব একচোট হইল। খুন কেউ হইল না। তবে জখম খুব হইল। তালুকরদারাও মোছলমান। এ কাইজা হিন্দুমোছলমানের কাইজা না। পীরপুর চণ্ডীপুরের কাইজা। ও নৌকায় হিন্দুও আছে, মোছলমানও আছে। এ নৌকায়ও তাই। তারপর আন্ধারে ঠিক তাহেত করতে পারলাম না, ও নৌকার এক বর্শা আইসা আমার ঠিক কান্ধের ওপর পড়ল। আর একটু হইলেই গলাডা এফোড় ওফোড় হইয়া যাইত। খুব জোর লাগছিল ভাই। সেই পেরথম কাইজা, সেই পেরথম জখম। পানিতে পইড়া যাইতেছিলাম, সোনা মুন্সী আইসা জড়াইয়া ধরল।

এবার আর নাচতে নাচতে না। এবার আর যাম না, রক্ত। আমাদের নৌকায় আরো জন দশেক জখম হইল। বাইচে আমরা জেতলাম, কিন্তু কাইজায় আমরা হাইরা গেলাম। সোনা মুন্সী আমারে ধইরা আইনা আমার মায়ের কাছে দিয়া গেল। দশা দেইখা মার সে কি কান্দন। আমার সেই কান্ধের ঘাও শুকাইতে তিন মাস লাগছিল। দাগ? হ দাগ এখনও আছে। পরে শোনলাম, পীরপুরের সেই নৌকায় বনমালীও ছিল। তার উসকানিতেই নাকি—। সাচা-মিছা জানি না, লোকে তাই কওয়া-কওয়ি করতে লাগল।

সেই কাজিয়ার পর কাঁধের ঘায়ের জন্যে মতিমিঞা সারা বর্ষাকালটা ভুগেছিল। গোড়ায় দিকে খুব জ্বর হত, যন্ত্রণা হত। প্রায় সারা রাত চীৎকার করত কষ্টে। তারপর আস্তে আস্তে সব কমে আসতে লাগল। মা আগে কাছে নিয়ে বসে থাকত। এখন কাজকর্মে যায়। বাপও কাজে বেরোয়। পাট কাটে, পাট ধোয়। একা একাই করে। মতিমিঞা এই সময়টায় বিছানায় পড়ে থাকায় ভারী লোকসান হল সংসারের। শুয়ে শুয়ে সে তুফানীদের খোঁজ-খবর করে। চৌকিদারের ঘরেও অসুখ বিসুখ। থানা থেকে সে ছুটি নিয়েছে। সে আর তুফানীর পিসী দুজনেই ম্যালেরিয়া জ্বরে পড়েছে। ওষুধ পথ্য দেওয়ার কেউ নেই। তুফানী পীরপুরে শ্বশুরঘর করছে। তার নাকি ছেলেপুলে হবে। তাকে তারা বেশি পাঠাতে চায় না।

অনেক বলে কয়ে তুফানীর পিসী তাকে কদিনের জন্যে আনিয়েছে। সাধ দেবে মেয়েকে। পাঁচ মাসে দিতে পারে নি, সাত মাসে দিতে পারে নি, এই ন' মাসেও যদি না দেয় কখন দেবে। মেয়েকে নতুন শাড়ি কিনে দেবে, পিঠে পায়েস করে খাওয়াবে। হিন্দুদের যা নিয়ম। একথা শুনে মতির মা এক হাঁড়ি দুধ পাঠিয়ে দিল।' ক্ষীরের মত মিষ্টি আর ঘন দুধ দেয় তাদের কালো গাইটা। সেই গাইয়ের দুধ। সেই দুধের পায়েসে সাধ খেল তুফানী। পাড়ার মেয়েরা উলু দিল। কুলু কুলু কুলু কুলু। মতি শুয়ে শুয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'ওকি মা।'

মতির মা হেসে বলল, 'ও বাড়ির তুফানী সাধ খায়। জোকারে জোকারে সেই কথা পাড়া ভইরা জানাইতেছে। বাজান, তুই এবার শাদি কর।'

দিন দুই পর সেদিন বিকালবেলা জানলা দিয়ে তাকিয়ে আছে মতিমিঞা। সেও এই কার্তিক মাস। মাঠের ধান পেকেছে। কেউ কাটছে, তাদের নাবি ফসল, তারা এখনো কাটতে শুরু করেনি। বর্ষার জল শুকাতে শুরু করেছে,

তবে এখনো পুরোপুরি শুকায়নি। সারা পাড়াটা নিস্তব্ধ। হাট-বার। পুরুষেরা সবাই হাটে গেছে। মেয়েরা যার যার ঘরের কাজে ব্যস্ত। হঠাৎ মতিমিঞার চোখে পড়ল বাঁশের সাঁকো বেয়ে একটি মেয়ে পা টিপে টিপে গুটি গুটি এগোচ্ছে। সাঁকোর নীচে এখন আর অথৈ জল নয়, হাঁটু পর্যন্ত ঘোলা জল। তার ভিতর থেকে ছোট ছোট মাছ চাঁদা-চুঁচড়ো লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে। মতিমিঞা দূর থেকেই মেয়েটিকে চিনতে পারল। তাকে সে এতকাল ধরে দেখে আসছে শুধু রক্তমাংসে নয়, রাত্রের খোয়াবেও যাকে সে দেখেছে, তাকে সে চিনতে পারবে না ? সাঁকো পার হয়ে তুফানী মতিমিঞাদের পারে চলে এল। বাড়িতে ঢুকবার পথে এক ঝাড় মোরগবলী গাছ। লাল ফুলে গাছ ভরে গেছে। এই ফুল তুফানী ছেলেবেলায় বড় ভালোবাসত। এ ফুল হিন্দুদের কোন পূজায় লাগে না। শুধু দেখতে বাহার বলে তুফানী সেগুলি নিত। আজও লোভ সামলাতে পারল না। হাত বাড়িয়ে কয়েকটা ফুল তুফানী ছিঁড়ে নিল। তা দেখে মতিমিঞাদের লাল আর কালো মেশানো বড় মোরগটা তুফানীর দিকে কক কক করতে করতে এগিয়ে গেল। হয়ত ভাবল তার ঝুঁটিটাই বুঝি তুফানী ছিঁড়ে নিয়েছে। একটু এগিয়েই গোবরলেপা উঠান। একধারে হলদে রঙের পাকা ধানের আঁটি। মলন দেওয়ার জন্য জড়ো করে রেখেছে মতির বাবা। সেই ধানের আঁটির পাশ দিয়ে পাকা ধানের রঙ গায়ে আর মুখে মেখে হিন্দুদের লক্ষ্মী প্রতিমার মত তুফানী মতিমিঞাদের নতুন তোলা টিনের ঘরখানায় এসে ঢুকল। এদিক ওদিক তাকিয়ে ডাকল, 'মতি !'

আর তুফানীর মুখে নিজের সেই নাম শুনে মতিমিঞার বুকের মধ্যে তুফান ডেকে উঠল। রক্তের মধ্যে তা দাপাদাপি শুরু করল। এতকাল বাদে ফের তার কাছে কেন এসেছে তুফানী। এবার কি তার ধরা দেওয়ার সাধ হয়েছে ? মতির দিকে মন ঝুঁকেছে ?

মতিমিঞার বাপ গেছে হাটে, মা গেছে সিকদার বাড়িতে চিড়া কোটতে। তক্তাপোষের পাতলা কাঁথাখানা গায়ে জড়িয়ে মতি আজ একাই শুয়ে আছে। ছেঁড়া কাঁথার তলায় লাখ টাকার স্বপ্ন কি আজ সত্য হয়ে উঠল ?

মতি সাড়া দিয়ে বলল, 'এই যে আমি, এইখানে আইস।'

তুফানী হেসে বলল, 'বাব্বা, দিনেও ঘরের মধ্যে তোমার অন্ধকার ?'

মতি বলল, 'হ তুফানী। দিনেও আমি রাইতের আন্ধার নিয়া বাস করি। তারপরে এতকাল পরে কি মনে কইরা ? বইস।'

নিজে উঠে বসে মতি হাত দিয়ে তক্তাপোষের ধারটা তুফানীকে দেখিয়ে দিল। রোগীর বিছানাটা বেশ একটু ময়লা হয়েছে। বিড়ির আগুনে চাদরের খানিকটা জায়গা পুড়ে গেছে। ঘরদোরের হাল দেখে মতির নিজেরই সরম হল। ও তো জানে না, তুফানী আজ আসবে। তাহলে ওর জন্যে ফুলের শয্যা বিছিয়ে রাখত।

অনুরোধ সত্ত্বেও তুফানী বসল না। একটু দূরে তেমনি দাঁড়িয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'তোমারে দেখতে আইলাম।'

মতিমিঞা বলল, 'কি দেখতে আইলা? বর্শার কোপে মইরা গেছি না আছি, তাই?'

তুফানী বলল, 'কি যে কও? মইষের মত মানুষটা দুই এক কোপ খাইলেই যদি মরে তা হইলে জাইত থাকে না কি? সাইরা ওঠ, আরও কত কাইজা করবা, কোপ খাবা, কোপ দেবা—।'

মতিমিঞা দেখতে লাগল তুফানীকে। ওর মুখে পাকা ধানের রঙ, শাড়িতে কাঁচা ধানের বরণ।

তুফানী একটু হেসে বলল, 'শিগ্‌গির আর আমার আসা হবে না। আটকা পইড়া যাব। ওরা আমারে আটকাইয়া রাখবে। তাই দেখতে আইলাম। শোনলাম অসুখ, শোনলাম জখমে খুব কাবু হইছ। শুইনা এত ভাবনা হইছিল। এখন তো আর জরজারি নাই? কি কও?'

মতিমিঞা বলল, 'আছে কি না আছে? দেখনা গায়ে হাত দিয়া? নাকি ছুইতেও দোষ?'

তুফানী গায়ে হাত দিয়ে দেখল না। শুধু হাতের সেই ফুলগুলি মতিমিঞার বিছানার উপর রেখে দিতে দিতে একটু হেসে বলল, 'তোমার ফুল তোমারেই দিয়া গেলাম।'

মতিমিঞা লক্ষ্য করল সেই রাঙা রাঙা মোরগবলী ফুলের রঙ তুফানীর সিঁথির সিঁদুরে, তার কপালের সুগোল ফোঁটায়, তার পানের রসে আর রঙে রাঙানো তুলতুলে দু'টি ঠোঁটে। তুফানী নিজেই যেন এক মোরগবলী।

ধান কাটা বন্ধ রেখে মতিমিঞা তার সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি আর ঠিক থাকতে পারলাম না না মণ্ডলভাই, আমি তার হাতখানা সঙ্গে সঙ্গে চাইপা ধরলাম। কইলাম আমার ফুল আমিই নিলাম তুফানী। আমি আর তারে ছাইড়া দেব না।'

সে কইল, 'কি কর মেঞা, কি কর! তোমার কি আক্কেল বুদ্ধি সব গেছে!'

আমি কইলাম, 'আক্কেলবুদ্ধি দিয়া মাইয়া মানুষরে পাওয়া যায় না। আমি জোর কইরা তারে আরও কাছে টাইনা নিলাম। তুফানীর আমারে থামাবার শক্তি ছিল না, চেঁচামেচি করবার শক্তি ছিল না, বোধ হয় সরমে বাইক্য বন্ধ হইয়া গেছিল। সে সরমে নিজের চউখ ঢাকল, কিন্তু আমার চউখ ঢাকবে কেডা। তখন যে সাক্ষাৎ শয়তান ঢোকছে আমার শরীলে। সে আমার সব লাজ-লজ্জা হইরা নিছে। এতদিন আমি কেবল দূর থিকাই দেইখা আইছি। ধরি নাই, ছুই নাই, সোয়াদ পাই নাই। আমি যেন পাকা বেলের কাছে কাউয়া হইয়া রইছি। আইজ তা ক্যান থাকব! আইজ ক্যান ছাইড়া দেব? আমি ছাড়লাম না, ধরলাম। তুফানীর মুখে কথা নাই। ও যেন মাটি হইয়া গেছে, পাথর হইয়া গেছে। কিন্তু আমি মাটি না, পাথর না, আগুন, আমি তুফান। হিংসায় আমার বুকটা জ্বইলা পুইড়া ওঠল। বর্শার ফলাটা এবার কান্ধে না, পিঠে না, এক্কেবারে আমার বুকের মইধ্যেখানে আইসা বেন্ধ্‌ল। পরের পোলা প্যাটে নিয়া, ও আমার সঙ্গে আইজ তামাসা করবার জইন্যে আইছে। ওয়ার তামাসা আমি ছুটাইয়া দিব। আমার চউখের ভাব দেইখা ও দুই পাও পাউছাইয়া গেল। আমি চাইর পাও আউগাইলাম, ও ভয়ে কাঁপতে লাগল। কাঁপতে কাঁপতে কইল, 'ছাইড়া ছাও মেঞ্যা, ছাইড়া ছাও, তোমার পায়ে ধরি। মতি, তুমি কি সব ভুইলা গেলা।'

কব কি মণ্ডল ভাই, এই না বইলা দুই চউখের জল ছাইড়া দিল তুফানী। সে আমারে কোন কথা মনে করাইতে চাইল তা ঠিক বোঝতে পারলাম না। কিন্তু তার মুখে আমার নিজের নাম শুইনা আমার বুকের মইধ্যে সমদ্দুরের ঢেউ হুহু কইরা ওঠল। কিসের থিকা যে কি হয়, তা কি কওয়া যায় মণ্ডল ভাই। এই আগুনে জ্বইলা পুইড়া মরছিলাম, ফুকমন্তরে দেখি কোথায় আগুন, কোথায় কি, বাইষার পাণিতে দুনিয়াদারি ভাইসা গেছে। দেখ মণ্ডলভাই দেখ, সেইদিনের কথায় আমার গায়ের লোম আইজও খাড়া হইয়া উঠছে। তারে ছাইড়া দিয়া আমি সইরা দাঁড়াইলাম। পরণের শাড়িখান ফের গোছগাছ কইরা তুফানী চইলা গেল। আমি যে তারে অত সহজে ছাইড়া দিছিলাম সে কথা কেউ বিশ্বাস করে না। তারা ভাবে, আমি আর কিছু করবার বাকি রাখি নাই। কিন্তু এই ধান

হাতে কইয়া, আকাশের তলায় দাঁড়াইয়া সূর্য সাক্ষী কইয়া তোমারে আমি কইতেছি মণ্ডলভাই, আমি তার আর কোন ক্ষেতি করি নাই।—তবু তো সে রইল না।'

একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মতিমিঞা পুনরায় বলতে লাগল, 'তুফানীর সোয়ামী বনমালী আর তার বাপ দুইজনেই হাট থিকা একসঙ্গে আসল। বউর জইন্যে বনমালী ময়ূর মার্কা গন্ধ তেল, নতুন নীলাম্বরী শাড়ি নিয়া আইছে। নিয়া আইছে গরম গরম এক সের জিলাফি। তুফানী জিলাফি বড় ভাল খায়। সাধস্তির সাধ, কত জিনিসই তার খাইতে ইচ্ছা করে। বাইছা বাইছা মাছ-তরকারি, পান-সুপারি সব নিয়া আইছে। কিন্তু আইসা দেখে বউ নাই ঘরে। অমনিই তার মুখ অন্ধকার। পিসী, সে গেল কোথায়? পিসী কাঁথা মুড়ি দিয়া জ্বরে কাঁপে। সে কয়, আছে ধারে কাছেই। 'যাবে আর কোথায়। তুমি বইস, জিরাও। হাত-মুখ ধোও, পান তামুক খাও। সে আইল বইলা। কিন্তু বনমালী তারে তালাস কইরা আর কোন জায়গায় পাইল না। তারপর দেখল, সাঁকোর ওপর দিয়া পা টিপা টিপা আসতেছে। নয় মাইসা পোয়াতী আসতে কি আর পারে। পায়ের তলায় একটা বাঁশ। আর হাতে ধরবার জন্য সরু একটা তল্লা বাশ মাথার উপর দিয়া বান্ধা। ধইন্য সাহস ছিল তুফানীর। আমি যেমন তার পার হইয়া আসা দেখছিলাম, তেমনি পার হইয়া যাওয়াও দেখছিলাম। তার পর আর দেখলাম না। কেবল একটা চীৎকার শোনলাম। সে চীৎকারে আকাশ ফাটে, পিরথিবী ফাটে, মানুষের বুক কি তার চাইয়া শক্ত মণ্ডল ভাই, শালার হারামী শূয়ারের বাচ্চা বোনা মিস্ত্রী করল কি জান? মাইয়াডারে সাকোর উপর থিকা নামতে দেওয়ার তর সইল না তার। নামতে না নামতেই সে আইসা তার চুলের মুঠ ধরল। আহা কি চুলের গোছাই না তার ছিল। যেমন গোছে বড়, তেমনি লম্বায় বড়, আর কি মিশমিশে রঙ। চুল তো না আষাঢ় মাইসা আকাশ-ছাওয়া মেঘ। দেইখা চউখ জুড়াইয়া যায়। সেই চুল ধইরা বোনা শালা তারে টানতে টানতে ঘরের মধ্যে নিয়া গেল। এসব কথা আমি পরে শুনছি। ঘরে নিয়া আউলাপাথারি এই লাথি। লাথির পর লাথি, লাথির পর লাথি। হুকিদার আইসা এক হাত ধরল, তার বুইন কাথার তলা থিকা কাপতে কাপতে উইঠা আইসা আর এক হাত ধরল, 'কর কি জামাই কর কর কি। পোয়াতী মাইয়ার গায়ে লাথি মার,

এ কি আক্কেল তোমার।' জামাই কইল, 'ও মোছলার ঘরে গেছে। জাইত জন্ম সব খোয়াইয়া আইছে। ওয়ারে আমি খ্যাষ করব।' চকিদার তখন আইসা সাধের জামাইর ঘাড় ধরল, চউখ রাঙাইয়া কইল, 'খবরদার, আমার মাইয়ার গায় ফের হাত দিবি তো সেই হাত আমি মোচড়াইয়া ভাঙব। আমার মাইয়া আমি যারে খুসি দেব, ডাকাইতরে আর না। আমার বাড়ির থিকা এক্ষুনি বাইর হইয়া যা।' বনমালী সেই রাতেই চইলা গেল। কিন্তু তুফানীর ব্যথা আর যায় না। সারা রাইত সারা দিন যাতনায় ছটফট করতে লাগল মাইয়া। খ্যাপে দাপাইতে লাগল। চকিদার দাই আনল, ডাক্তার আনল। ওষুধ দিল, ইনজিশান দিল। তারপর সব শান্তি হইল সন্ধ্যার সময়। তুফানী আর কাতরাইল না, আর কথা কইল না।'

মবদুল আর বিহারী দেখতে পেল মতিমিঞা ভিজে হাতের পিঠ দিয়ে ছুটো ভিজে চোখ তার মুছে নিচ্ছে।

চৌকিদার থানা পুলিস কিছু করল না। কেলেঙ্কারীর ভয় তারও আছে। সেই রাত্রেই মেয়েকে তারা কালীখোলার শ্মশানে নিয়ে গেল। তুফানী ফের মাথায় সিঁদুর পরল, পায়ে আলতা পরল, তারপর বুড়ো বাপের কাঁধে উঠে চলল তার নিজের দেশে। যে দেশে কেলেঙ্কারীর ভয় নেই, জাতজন্মের ভয় নেই। মতিমিঞা ছুটে যাচ্ছিল সঙ্গে সঙ্গে, কিন্তু তার বাপ তাকে যেতে দিল না, বলল, 'ওরা এখন ক্ষ্যাপা কুত্তার মত হইয়া রইছে। তোরে দেখলে আর থোবে না।' ঝাড়া দিয়ে বাপের হাত ছাড়িয়ে নিল মতিমিঞা, কিন্তু মায়ের হাত ছাড়াতে পারল না।

তারপর শেষ রাত্রে ঘুমন্ত বাপ-মাকে ফাঁকি দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল মতিমিঞা। ঘাটের ছোট ডিঙিখানা খুলে নিল। সারাটা পাড়া নিঝুম। চৌকিদার বাড়িও শান্ত। অনেক হৈচৈ আর কান্নাকাটির পর তুফানীর বাপ আর পিসিও বোধ হয় এতক্ষণে ঘুমিয়েছে। খালের ভিতর দিয়ে ডিঙি নৌকাখানা নিয়ে চলল মতিমিঞা। হাত যেন অবশ। বৈঠা জলে পড়ে কি না পড়ে। এ তো আর সেই বাইছের নৌকা নয়। ঘোষেদের জংলা ভিটে ঘেঁষে জোলাদের পোড়ো মসজিদটার ধার দিয়ে ভেসাল পাতা জেলেদের ঘাট পেরিয়ে মতিমিঞা হিন্দুদের কালীখোলার শ্মশানের দিকে এগিয়ে চলল। একবার শেষ দেখা দেখবে। এখন আর দেখবার কিছু নেই। চিতায় জল ঢেলে লোকজন নিশ্চয়ই অনেক আগে চলে এসেছে। তবু মতিমিঞা সেই মাটিটুকু ছুঁয়ে দেখবে,

খানিকটা ছাই লুকিয়ে লুকিয়ে কুড়িয়ে নিয়ে আসবে। তারপর কাল ভোরে যাবে পীরপুর। বুনো শুয়োরকে খুন করে তবে ছাড়বে। আর তার ভয় কিসের। জেল ফাঁসিকে সে আর ডরায় না।

মতিমিঞা ডিঙি ভিড়িয়ে রাখল ঘাটের কাছে। গাঙের তীরে শ্মশান। বর্ষার সময় জলে ডুবু ডুবু হয়। কোন কোনবার তলিয়েও যায়। কার্ত্তিক মাসে জল সরে গিয়ে তুফানীর জন্যে অনেক জায়গা করে দিয়েছে। কতকগুলি পোড়া কাঠ আর একটি নতুন মাটির কলসী। আর কিছু নেই। শ্মশানের ওপর উত্তর দিকে ছোট একখানি টিনের ঘর, হিন্দুদের কালীমন্দির। আর তার সামনাসামনি দক্ষিণ দিকে একখানি দোচালা ঘর। শ্মশান-যাত্রীদের বিশ্রামের জায়গা। বৃষ্টি বাদল নামলে সেখানে এসে তারা দাঁড়ায়। তামাক খায়, বিড়ি টানে।

ঘাটে ডিঙিখানা রেখে মতিমিঞা চিতার দিকে এগিয়ে যেতেই হঠাৎ দেখল ছায়ার মত কি যেন একটা সেখানে নড়াচড়া করছে। সঙ্গে সঙ্গে মতিমিঞার সমস্ত রক্ত যেন জল হয়ে গেল। সমস্ত লোম খাড়া হয়ে উঠল, গা কাঁপতে লাগল থর থর করে।

তখনকার সেই অবস্থাটার কথা সঙ্গীদের কাছে বর্ণনা করে মতিমিঞা বলল, "শ্মশানে যখন আসছিলাম, তখন গোয়ারের মত ছুইটা আসছিলাম। তখন মনের মইধ্যে ভয়ডর কিছু ছিল না। প্রাণডা কেবল তুফানী তুফানী কইরা অস্থির হইছিল। আমিও তুফানের মত ছুইটা আসছিলাম। কিন্তু আইসা চিতার ওপর সেই কালা ছায়া দেইখা আমার রক্ত একেবারে ঠাণ্ডা হিম হইয়া গেল। এ তো আর কিছু না, শ্মশানের ভূত। হিন্দুগো দেবদেবতা মানা আমাগো নিষেধ। মানলে গুণা হয়। কিন্তু তাই বুইলা কি ভূতপ্রেত আমাগো ছাইড়া দেয়? না তাগো না মাইনা পারি? কোন একখানা অস্তর আমার হাতে নাই। ফকিরের এক টুকরা গাছগাছড়া পর্যন্ত সাথে নাই। বোঝ মনের অবস্থাডা। তবু কোন রকমে খোদার নাম নিয়া সাহসে ভর কইরা চকিদারের মতই একটা হাক দিলাম, কেডা? ওখানে কেডা? সেও কাপা কাপা গলায় চি চি কইরা ওঠল, কেডা? তুমি কেডা? গলা শুইনা তখন আমি ব্যাপারটা বোঝতে পারলাম। ভূত না প্রেত না, এ তো শালা সেই পীরপুরের বনমালী। সেও বোঝল, সেও আমারে চেনল। বোঝতে পারলাম, সেও যে জন্যে আইছে, আমিও সেইজন্যে আইছি। বোঝতে পারলাম সেও যা চায়, আমিও তাই চাই। ডাক

ছাইড়া কান্দতে চাই মণ্ডলভাই, লাজলজ্জা ছাইড়া চিল্লাইতে চাই। তারপর সেই গাঙের ধারে, শেষ রাইতের আন্ধারে সেই নতুন চিতার ওপর আমরা দুইজনে দুইজনের দিকে টাউ হইয়া চাইয়া রইলাম। আমাগো পায়ের নীচে তাপ, বুকের মধ্যে তাপ। তুফানীর চিতা নেবল, কিন্তু আমরা দুইজন* জ্বলতে লাগলাম। একজন হিন্দু একজন মোছলমান, একজন সোয়ামী আর একজন জার; একজন খুনী আর একজন লুচ্চা বদমাইস, কিন্তু দুইজনেই খাড়াইয়া খাড়াইয়া সমানে পোড়তে লাগলাম। তারপর রাইত ভোর হইলে গাঙে নাইমা একটা কইরা ডুব দিয়া যার যার গ্রাম-ঘরে ফিরা আসলাম।

এরপরে অনেকদিন বিবাগী হইয়া এদেশে ওদেশে ঘোরলাম। উত্তর দক্ষিণ কোন দিক বাদ রাখি নাই। পাচ বছরের মধ্যে আর বিয়া-সাদি কিছু করলাম না। তারপর মার মাথা কোটাকুটির চোটে সবই করতে হইল। ঘর-সংসারে থাকতে গেলে সবই করতে হয় মণ্ডলভাই। বনমালীও বিয়া করছে, তারও ছাওয়াল পাল হইয়াছে। তবে বেশি না, গণ্ডা খানেক।

আমার বউডা ভাই বছর-বিয়ানী। বিয়াইয়া বিয়াইয়া তার আর সাধ মেটে না। বেরক্ত কইরা মারল। কিন্তু যখন পোয়াতী হয় আমি তারে খুব আদরযত্ন করি। যা খাইতে চায় আইনা দেই। তারপর আতুড়ঘরে যাইয়া যখন সে গোঙায়, খুটি ধইরা কাতরাইতে থাকে, কোকাইতে থাকে, আমার সেই তুফানীর কথা মনে পড়ে। পরানডা হু হু কইরা ওঠে। কি আর করব, উপায় তো কিছু নাই। ঘরের দুয়ারে খাড়াইয়া খাড়াইয়া আনমনা থাকবার জন্যে তামুক টানি, মনে মনে আল্লার নাম করি আর আমার বিবির কাতরানির মধ্যে আমার সেই পেরথম পীরিতের গোঙানি শুনি। সে গোঙানির শেষ নাই মণ্ডলভাই, দুনিয়াদারিতে গোঙানির শেষ নাই।'

ধান কাটা শেষ হয়ে গিয়েছিল। সবাই ভরা নৌকোয় উঠল। সূর্য হেলে পড়েছে। মবদুল লগি দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে নৌকোখানা খালের ভিতরে নিতে লাগল। কিসের একটা ভয় আর আশঙ্কায় তার মনটা যেন কুঁকড়ে রয়েছে। একটু পরে সে মনের কথাটা খুলেই বলল, একটু হেসে মতিমিঞার দিকে তাকিয়ে সে বলে ফেলল, 'আপনার ওই কেচ্ছা আইজ না কইলেই ভালো করতেন বড়মেঞা।'

মতিমিঞা চমকে উঠে মবদুলের দিকে তাকাল, 'ক্যান রে ?'

মবদুল বলল, 'যতসব অপয়া, অলুক্ষুইণা—'

মতিমিঞা একটু হেসে তাকে আশ্বাস দিয়ে বলল, 'নারে না ; তোর ভয় নাই মবদুল, আল্লার দোয়ায় কোন ভয় নাই। তুই গিয়া ছাওয়ালের মুখ দেখবি। সে আমার অপয়া নারে, তার পয় আছে। সে ভারি পয়মন্তী।'

এরপর আর কেউ কোন কথা বলল না। সরু খালের ভিতর দিয়ে হলুদ রঙের ধান বোঝাই নৌকো গাঁয়ের দিকে এগিয়ে চলল।

দেরাজটা আধখানা টানতেই সব দেখা গেল।

নীল ফিতে দিয়ে বাঁধা চিঠির তাড়া। তাড়া নয়, গুচ্ছ। তাড়া বলে মিনতির দিদিরা। মিনু মনে মনে বলত, গুচ্ছ। পুষ্পগুচ্ছ, পত্রগুচ্ছ, কবিতাগুচ্ছ।

ঘরে কেউ নেই, ধারেকাছে কেউ নেই। সবাই ব্যস্ত। মিনুর বিয়ের জন্যেই ব্যস্ত রয়েছে সবাই। দিদির সঙ্গে মা বেরিয়েছেন মার্কেটিংএ। বাবাকেও টেনে না নিয়ে ছাড়েননি। বীথিদি আর ছোড়দা গাড়ি নিয়ে বাকি নিমন্ত্রণগুলি সারতে গিয়েছে। অন্য লোকজন রান্নাঘরে, ভাঁড়ারঘরে, আর জামাইবাবুরা সবান্ধবে ব্রীজ খেলায় মত্ত। মিনতির এই নিজস্ব নির্জন ঘরখানিতে কেউ আর এখন আসবে না। যদি বা আসে, দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে টোকা দেবে, অনুমতি চেয়ে নেবে।

মিনতি সময় পাবে। এমন কি দুঃখ জানিয়ে অবাঞ্ছিত আগন্তুককে ফিরিয়ে পর্যন্ত দিতে পারে। কেউ আসবে না। মিনতি উঠে গিয়ে আধখোলা দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এল। তারের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত অবধি টেনে দিল ঘন নীল রঙের পর্দা। তারপর ফিরে এসে নিশ্চিন্তে নতজানু হয়ে বসল দেরাজের কাছে। এবার পুরো দেরাজটাই টেনে নিল। বুকে এসে লাগল মেহগনি কাঠের স্পর্শ। নিজের মনেই একটু হাসল মিনতি। কিছুদিন আগেও শরীর এত খারাপ ছিল যে, এসব অনুভূতি প্রায় ছিলই না।

ফিতে-বাঁধা রাশ রাশ চিঠিতে দেরাজটি এবার কানায় কানায় ভরে উঠেছে। আর একখানা চিঠি রাখবারও যেন জায়গা নেই। আর জায়গা নেই বলেই যেন চিঠির পালা শেষ হয়ে যাচ্ছে। দু দিন পর থেকে যে জীবন শুরু হবে তার কোন কোণেই এই চিঠিগুলির আর জায়গা হবে না।

অথচ গত পাঁচ বছর ধরে এই চিঠিগুলি মিনতির একমাত্র—একমাত্র না হক, প্রধান অবলম্বন ছিল। এক-একখানা চিঠিকে কতবার করে যে সে পড়েছে, তার ঠিক নেই। এক-একখানা চিঠি আসবার অপেক্ষায় সে যে কত অধীর মুহূর্ত কাটিয়েছে, আজ আর তার হিসাব নেওয়া যায় না। শুধু স্মৃতিতে তার পুরো স্বাদ ধরাও পড়ে না।

চিঠিগুলিকে কিছুদিন হল কালানুক্রমে আলাদা আলাদা ভাবে ভাগ করে সাজিয়ে বেঁধে রেখেছে মিনতি। প্রথমে এই বুদ্ধি হয়নি। গোড়ার দিকে যেমন তেমন করে রেখে দিত। সবগুলিই যে ড্রয়ারে রাখত তা নয়। বরং ড্রয়ারে প্রথম প্রথম রাখতই না। তখনকার চিঠিগুলির মধ্যে তো কোন গোপনতা ছিল না। প্রায় কিছুই ছিল না বলতে গেলে। টেবিলের উপর দিনের পর দিন সে সব চিঠি পড়ে থাকত। হয়ত কোন চিঠি থাকত নভেলের পত্রচিহ্ন হিসাবে, কোনখানা উড়ে যাবার ভয়ে ডিকশনারির তলায় চাপা, চায়ের কাপের ঢাকনি হিসাবেও গোড়ার দিকে কোন কোন চিঠিকে ব্যবহার করেছে মিনতি। খামগুলির উপর গোলাকার দাগগুলি বোধ হয় এখনও দেখা যাবে। ভাবতে এখন লজ্জা করে মিনতির। ছি ছি ছি, কী নির্বোধ, কী উদাসীনই না ছিল তখন সে! অথচ তখন—শুধু তখন কেন, তার ঢের আগে থেকেই উৎপলকুমার রায় বেশ প্রতিষ্ঠিত গায়ক। রেডিওতে তাঁর রবীন্দ্র-সঙ্গীত যখন হয়, বাড়ির সবাই উৎকর্ণ হয়ে শোনে। পরিবারের প্রত্যেকের কাছে এবং মিনুর বন্ধু-বান্ধব সকলের কাছেই উৎপলকুমার তাঁর নামে আর কণ্ঠমাধুর্যে শুধু পরিচিতই নন, প্রিয় গায়কদের একজন। বেশ বিক্রি তাঁর রেকর্ডগুলির। যাঁরা রবীন্দ্র-সঙ্গীত ভালবাসেন, সেগুলি তাঁরা সযত্নে সঞ্চয় করেন।

তবু মিনতির কাছে তাঁর চিঠিগুলির বেশী সমাদর ছিল না। অতি-সাধারণ মামুলি চিঠি। দু-চার লাইনেই শেষ। 'সুচরিতাসু, আপনার চিঠি পেয়েছি। আমার প্রোগ্রাম আপনার ভাল লেগেছে শুনে খুশী হলাম। শুভেচ্ছা ও প্রীতি-নমস্কার নিন।'

এই ধরনের চিঠিই প্রথম প্রথম আসত। পোস্টকার্ডে কি সস্তা কাগজে কোনরকমে দায়-সারা চিঠি। যেন ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাধ্য হয়ে জবাব দিয়েছেন। মিনতির অত দামী রঙিন প্যাডের কাগজের বদলে ভাল একখানা কাগজ ব্যবহারের কথাও ভদ্রলোকের মনে হয়নি। হলেনই বা বিখ্যাত ব্যক্তি। তাঁর অবজ্ঞার দানকে মিনতি অহেতুক আদর করতে যাবে কেন?

মিনতির বড়দিদি নীতি কিন্তু তখন মিনতির এই ঔদাসীন্যের নিন্দা করত: 'ছি, ছি, ছি, তোর এ কী স্বভাব মিনু। চিঠিগুলি যদি ভাল করে রাখতেই না পারিস, তাঁকে চিঠি লিখিস কেন, তাঁর কাছে থেকে চিঠির জবাব চাসই বা কেন?'

মিনতি প্রতিবাদ করত, 'কে বলল যে চাই? তিনি না চাইতেই লেখেন।'

ছোড়দি বীথি বলত, 'লিখবেন না ? তিনি যে আমাদের মিনুকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছেন।'

পরিহাসের সূচগুলি মনে গিয়ে বিঁধত মিনতির। তার দিদিরা সামনে থাকতে তাকে দেখে কেউ মুগ্ধ হবে না, এ-কথা সে ভাল করেই জানে। নীতির মত চোখ-মুখের গড়ন নেই তার, বীথির মত নেই রঙ, স্বাস্থ্য আর দেহসৌষ্ঠব, তাকে দেখে মুগ্ধ হবে কে ? তা ছাড়া, দিদিদের মত তার বিদ্যাও নেই। ওরা দুজনেই এম এ পাশ করেছে। আর মিনতি বি এ-র চৌকাঠ পার হতে গিয়ে একবার ইকনমিকসে হোঁচট খেল, দ্বিতীয়বার পড়ল অজ্ঞান হয়ে। সেই থেকে মিনতির অসুখ আর সারেনি। প্রায়ই মাথা ঘোরে, ঝিমঝিম করে। মালদা শহর থেকে শুরু করে কলকাতার নামজাদা ডাক্তাররা পর্যন্ত কেউ কিছু করতে পারেননি। হার মেনে বলেছেন, তার ব্যাধিটা মনের, তার ব্যাধিটা বাতিক ছাড়া কিছুই নয়। মিনুর বাবা মানসিক রোগের ডাক্তারকে দেখাবার উদ্যোগ করেছিলেন। কিন্তু মিনু কিছুতেই রাজী হয়নি। সে বলেছে, 'আমার মনের চিকিৎসা আমি নিজেই করতে পারব বাবা, কোন মনস্তাত্ত্বিকের দরকার নেই।'

মিনতি জানত, তার দিদিরা যেমন তাকে ভালবাসে, তেমনি গোপনে গোপনে একটু অবজ্ঞাও করে। আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব সব মহলেই অনুকম্পা কুড়তে হয় মিনতিকে। তার দূরসম্পর্কের এক জেঠিমা সেবার তার মাকে বলেছিলেন, 'তোমার এই মেয়ে পার করতে বেশ একটু বেগ পেতে হবে ভাই।'

কথাটা আড়ালে থেকে মিনতি শুনে ফেলে। তারপর থেকে জেঠিমা কি জেঠতুতো ভাইদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখেনি। এমনি আস্তে আস্তে অনেকের সঙ্গেই সম্পর্ক ছেদ করে মিনতি ঘরের কোণে আশ্রয় নিয়েছিল। রোগ হয়েছিল এই নির্জনবাসের সহায়। জরজারি মাথাব্যাথা লেগেই থাকত। কারও সঙ্গে না মিশবার, কোথাও না যাবার অজুহাত থাকত হাতের কাছে।

মিনতির মত মেয়েকে কারও যে চোখে পড়বে, একথা ভাবাই যায় না। কিন্তু আশ্চর্য, উৎপল রায়ের পড়েছিল। তিনি সেবার মালদয়ের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে দলবল নিয়ে গাইতে এসেছিলেন। মিনুর ছোড়দা সেই অনুষ্ঠানের একজন পাণ্ডা। যুগ্ম সেক্রেটারিদের একজন। উৎপলবাবুকে নিজেদের বাড়িতেই তুলেছিল এনে। সঙ্গে আরও দু-একজন গায়ক ছিলেন। অভ্যর্থনা, আলাপ-পরিচয়, গল্প-সল্পের ভার ছোড়দা আর দিদিরাই নিয়েছিল। মিনুর স্থান ছিল তাদের মধ্যে সবচেয়ে পিছনে। তবু অটোগ্রাফ নিতে গিয়ে

আলাপ হয়ে গেল। নীতি আর বীথি দুজনেরই তখন বিয়ে হয়ে গিয়েছে। তারা অটোগ্রাফের বাতিক পার হয়ে এসেছে অনেকদিন। মিনু মাঝে মাঝে তখনও দুএকজনের স্বাক্ষর ধরে রাখে।

খাতাটা হাতে নিয়ে তার পাতাগুলি উল্‌টে যেতে যেতে উৎপলবাবু মিনুর মুখের দিকে চেয়ে বলেছিলেন, 'বাঃ, এ ত দেখছি সবই বড় বড় বিখ্যাত ব্যক্তিদের অটোগ্রাফ, এর মধ্যে আমি কেন?'

তখন বছর পঁয়ত্রিশেক বয়স উৎপলবাবুর। গায়ের রঙ না ফরসা না কালো। সুপুরুষ নন, বলিষ্ঠ পুরুষ নন। তীক্ষ্ণাগ্র নাক নেই, চোখ দুটি শ্রুতিমূলে পৌঁছবার অনেক আগেই থেমে গিয়েছে। ঈষৎ পুরু ঠোঁট আর চ্যাপ্‌টা চিবুকে মুখের ডৌলকে সুশ্রী কোনরকমেই বলা চলে না। তবু উৎপলবাবুর মধ্যে কোথায় যেন শ্রী আছে বলে মিনতির মনে হয়েছিল। পরে মিনু ভেবে দেখেছে সেই শ্রী তাঁর হাসি আর কথা বলবার ভঙ্গিতে। দাঁতগুলির সুষম সুন্দর গঠনে। কিন্তু গড়নের সৌন্দর্য মানুষের হাসিকে কতখানি সুন্দর করে তুলতে পারে, যদি তাঁর অন্তর প্রীতি আর প্রসন্নতায় ভরা না থাকে। তাঁর কথাগুলিও যে মিনতির ভাল লেগেছিল তা কি শুধু উচ্চারণের স্পষ্টতা আর কণ্ঠস্বরের মিষ্টতার জন্যে? মোটেই তা নয়। মিনতি এ নিয়েও তারপর অনেক ভেবে দেখেছে। কথা হল খেয়া নৌকো। তা হল এক ঘাট থেকে আর এক ঘাটে পৌঁছবার জন্যে, এক অন্তর থেকে আর এক অন্তরে পারাপারের জন্যে। নইলে সে-যাত্রায় পুরো একটি দিনও ত মিনুদের বাড়িতে ছিলেন না তিনি, এরই মধ্যে তাঁদের পরিবারের সঙ্গে অত অন্তরঙ্গ হলেন তিনি কী করে!

একটু ভেবে নিয়ে অটোগ্রাফ-খাতায় শেষ পর্যন্ত সই করেছিলেন উৎপলবাবু। নাম স্বাক্ষরের আগে এক টুকরো কবিতাও লিখেছিলেন,

'যদিও জানি না
এ নামের মানে আছে কিনা।'

মিনুর বড়দি নীতি বলেছিল, 'বাঃ বেশ হয়েছে তো। আপনার কি কবিতা লেখারও অভ্যাস আছে নাকি?'

তিনি হেসে বলেছিলেন, 'এখন আর নেই। ছেলেবেলায় একটু আধটু ছিল।'

বীথি বলেছিল, 'কিন্তু কী বিনয় আপনার! যাই বলুন, পুরুষের অত বিনয় আমার ভাল লাগে না। তাঁরাও যদি অহংকারী না হন, দাম্ভিক না হন, হবে কে?'

নীতি বলেছিল; 'আমাদের বীথি পৌরুষ আর পরুষতাকে এক বলে জানে।'

মিনতি এ-তর্কে যোগ দেয়নি। উৎপলবাবুও যে যোগ দিয়েছিলেন তা নয়। তিনি শুধু স্মিতমুখে ওদের দুজনের বাগ্‌যুদ্ধ দেখেছিলেন।

ফাংশন সেরে আসরের সুখ্যাতি আর মালা নিয়ে উৎপলবাবুর ফিরতে ফিরতে রাত প্রায় এগারটা হয়েছিল। তার একটু আগে দিদিদের সঙ্গে মিনুও ফিরে নিজের টেবিলে এক টুকরো কাগজ রেখে গিয়েছিল তা আর পায়নি। পরে বুঝল বীথির শত্রুতা। সে ততক্ষণে সেই কাগজের টুকরো উৎপলবাবুর হাতে পৌঁছে দিয়েছে।

'দেখুন, আপনার কবিতার সেই জবাব। মিনুকে কবিতা লিখলে আর রক্ষা নেই। সঙ্গে সঙ্গে ও ছড়া কেটে তার জবাব দেবে।'

উৎপলবাবু উৎসুক হয়ে বলেছিলেন, 'দেখি দেখি।'

তারপর তাঁর সুরেলা সুমিষ্ট গলায় আবৃত্তি করেছিলেন,

'নামের মান জানে পঞ্চজনে
নামের মানে জানি আপন মনে।'

নিজের কবিতা অন্যের কণ্ঠে শোনার যে সুখ তা সেই প্রথম পেয়েছিল মিনু।

কাগজটুকু তিনি পকেটে রেখে দিতে দিতে বলেছিলেন, 'এযাত্রায় এই হল আমার সেরা মানপত্র।'

মিনু বলেছিল, 'বাঃ, ওটা নিয়ে যাচ্ছেন কেন?'

তিনি হেসে বলেছিলেন, 'আপনি কি নিয়ে যাওয়ার জন্যেই দেননি?'

মিনতি ভারী লজ্জা পেয়েছিল, তারপর মৃদু আপত্তির সুরে বলেছিল, 'মোটেই না। বীথিদি ওটা আমার টেবিল থেকে চুরি করে এনেছে। আর আপনি ডাকাতি করেছেন।'

কথা শেষ করে মিনু সেখানে আর দাঁড়ায়-নি। নিজের কথায় নিজেই সে লজ্জা পেয়ে গিয়েছিল। ছি ছি ছি, কী নির্লজ্জ, কী প্রগল্‌ভাই না তিনি মনে করেছেন মিনুকে! বীথির রূপ আছে। ওর মুখে সব কথাই মানায়। কিন্তু মিনুর আছে কী! সে কোন্ লজ্জায় মুখ বাড়ায়, মুখ তোলে, মুখ খোলে?

পরদিন ভোরের গাড়িতে উৎপলবাবু চলে গিয়েছিলেন। স্টেশন পর্যন্ত এগিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা ছিল মিনুর। কিন্তু হল না। স্টেশন বেশ দূরে। শহর থেকে মোটরে করে সেখানে যেতে হয়। গাড়িতে ঠাঁই কোথায়? উৎপলবাবুর দলবলে তা ভরে গেল। সি অফ করবার জন্যে শুধু ছোড়দাই সঙ্গে গেলেন।

মিনু চুপে চুপে এক ফাঁকে ড্রয়িংরুমে গিয়ে দেখে ঘরটা খাঁ-খাঁ করছে। অ্যাশট্রেতে সিগারেটের টুকরো আর ছাইয়ে ভরতি। খালি প্যাকেটগুলি পড়ে রয়েছে কার্পেটের ওপর। কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারের হাতলে কিছু ভাল নিদর্শনও ফেলে গিয়েছেন। রেখে গিয়েছেন মালাগুলি। ভুলে গেলেন নাকি? দিদিরা কী করছিল? অত যে কাছাকাছি ছিল, একবারও কি মনে করিয়ে দিতে পারেনি? নাকি ইচ্ছা করেই রেখে গিয়েছেন?

জুঁই ফুলের মালাটি বেছে নিয়ে নিজের খোঁপায় জড়িয়েছিল মিনতি। তাই দেখে বীথির কী ঠাট্টা! মুখের কাছে মুখ এনে গুনগুন করে গেয়েছিল,—

'মালা হতে খসে পড়া ফুলের একটি দল, মাথায় আমার ধরতে দাও গো ধরতে দাও। কিন্তু তুই শুধু একটি দল নিয়ে খুশী হসনি, পুরো একটি মালাই তুলে নিয়েছিস।'

মিনতি রাগ করে বীথির গায়ে ছুঁড়ে ফেলেছিল মালা। বলেছিল, 'নে। একটা বাসী ফুলের মালা, তাই নিয়ে অত! যতক্ষণ ছিলেন তোর দিকেই তো তাকিয়ে ছিলেন। তাতেও হয়নি?'

বীথি বলেছিল, 'ভুল করছিস। আমাকে শুধুই চোখ দিয়ে দেখে গেছেন। মন দিয়ে দেখেছেন কেবল তোকে।'

মিনতি বলেছিল, 'আর বড়দিকে?'

বীথি হেসে বলেছিল, 'ওকে বোধ হয় শুধু নাক দিয়ে শুঁকে গেছেন।'

বড়দি তাড়া করে এসেছিল, 'ফাজিল কোথাকার!'

সেই থেকে শুরু। সেই কাগজের টুকরো, কবিতার টুকরো থেকে। উৎপলবাবু কলকাতায় গিয়ে ছোড়দার কাছে পৌছান সংবাদ দিয়েছিলেন। তাতে শেষের দিকে মিনতির কথা ছিল। তার কবিতা নাকি উৎপলবাবুর খুব ভাল লেগেছে। তাঁর বন্ধুদেরও।

ছোড়দা হেসে বলেছিল, 'মিনুকে আর পায় কে! ও বোধহয় মাসখানেকের মধ্যে খানকয়েক মহাকাব্য লিখে ফেলবে।'

কিন্তু মহাকাব্য লেখবার শক্তি কই মিনুর। না একটি জীবন দিয়ে লিখতে পারল, না কোটি কোটি অক্ষর দিয়ে। কাব্য হল না, গল্প হল না, উপন্যাস হল না, কিছুই হল না। লিখল শুধু চিঠি, টুকরো কবিতা আর ডায়েরি। কিছু না পারার, কিছু না হওয়ার, কিছু না পাওয়ার বিলাপে ভরা।

সেই ডায়েরির পাতা মাঝে মাঝে চিঠির আকারে কপি করে পাঠিয়েছে

উৎপলবাবুকে। নিজের মনে মনে কথা বলা পৌঁছে দিয়েছে আর একজনের কানে। কিন্তু মরমে পৌঁছেছে কি না কে জানে!

চিঠি মিনুই আগে লিখেছিল। ছোড়দার চিঠিতে তার নামের উল্লেখ দেখে সে আর না লিখে থাকতে পারেনি। তাঁর মধুর কণ্ঠের—তার চেয়েও বেশী তাঁর মধুর ব্যক্তিত্বের সুখ্যাতি করেছিল, নিজের মুগ্ধ হৃদয়কে প্রায় সেই প্রথম চিঠিতেই ধরে দিয়েছিল মিনতি।

তার জবাবে এসেছিল সাধারণ চিঠি, মামুলি চিঠি। হয়ত প্রথমেই ধরা দিতে চাননি। কিংবা পরখ করে নিতে চেয়েছিলেন। আর মিনতি শোধ নিয়েছিল সেসব চিঠি অনাদর করে; চিঠিগুলিকে যেখানে সেখানে ফেলে রেখে, চায়ের কাপ, দুধের কাপ, পথ্যের বাটির ঢাকনি হিসাবে ব্যবহার করে। কিন্তু তাতে কি সব জ্বালা, সব তৃষ্ণা, সব আকাঙ্ক্ষা ঢাকা পড়েছে? পড়েনি, শেষ পর্যন্ত একখানা চিঠিও সরাতে দেয়নি মিনতি, এক টুকরো ছেঁড়া কাগজ পর্যন্ত না। সব দিয়ে গুচ্ছ বেঁধেছে, ঐতিহাসিকের মত সাল তারিখ কাল অনুযায়ী সাজিয়েছে। এই চিঠিগুলির মধ্যে ধরা আছে দুজনের একটি সম্পর্কের ক্রমবিকাশের ইতিহাস। তার অর্ধেক আছে এখানে; মিনুর কাছে। বাকী অর্ধেক আর একজনের কাছে আছে কি না কে জানে? তিনিও কি মিনুর মত একখানি একখানি করে সব পাওয়া চিঠি সঞ্চয় করে রেখেছেন? মিনুর চিঠিগুলি দেখতে অনেক সুদৃশ্য। রঙিন খামে রঙিন প্যাডের কাগজে অতি যত্ন করে লেখা। কেউ গুছিয়ে রাখলে ভালই দেখায়। কিন্তু তার বদলে মিনু যে চিঠিগুলি পেয়েছে, তার প্রায় প্রত্যেকখানিই সাধারণ সরকারী খামে মোড়া। কাগজগুলি বেশির ভাগই সাদা আর সস্তা। বাইরে থেকে এই চিঠিগুলির কোথাও কোন রঙ নেই। রঙ শুধু এর কথাগুলির মধ্যে। তবু মিনতির মাঝে মাঝে মনে হয়েছে শুধু তার লেখা চিঠিগুলিই নয়, তার পাওয়া চিঠিগুলিও রঙিন হক, কাগজগুলি দামী হক। যেমন দিদিদের চিঠিগুলি হয়। রঙ দেখলেই চেনা যায় সেগুলি কোন রসে ভরা। কিন্তু লিখি-লিখি করেও উৎপলবাবুকে এ নিয়ে কোন কথা লিখতে লজ্জা করেছে মিনতির। ছি ছি ছি, এ রঙ কি বাইরে থেকে লাগাবার, মুখ ফুটে চেয়ে নেওয়ার? এর জন্যে কি কোন কথা নিজে থেকে বলা যায়? মিনতির মনে হয় এদিক থেকে মেয়েদের দাবি অনেক কম। তাদের চোখ খুশী হবার জন্যে পুরুষের রঙিন পোশাক দাবি করে না, মণিমুক্তার অলঙ্কারের ফরমায়েশ করে না। পুরুষের অনাড়ম্বর বেশ

আর ভূষণহীনতায় তার দীনতার কথা মনে হয় না। কিন্তু পুরুষের চোখ কি অত অল্পে খুশী হয়? জমকালো শাড়ি গয়নায় সেজে না গেলে তারা কি কোন মেয়ের দিকে তাকায়?

মিনু জানে জমকালো পোশাক তাকে মানায় না। সেজন্যে শাড়ির চড়া রঙ, আর গয়নার আধিক্য সে চিরকাল এড়িয়ে চলেছে। আবরণে আভরণে, ভোজনে শয়নে কোথাও কোন বিলাস নেই তার। শুধু চিঠিতে আছে। তার চিঠি থাকবে দামী কাগজে লেখা, তার পাতার রঙ থাকবে গাছের পাতার মত, তার ভাষায় থাকবে ফুলের সৌন্দর্য, আর প্রচ্ছন্ন সৌরভ। সে সৌরভ শুধু ভাষায় আসে না, যদি তাতে প্রাণের স্পর্শ না থাকে

আটপৌরে আবরণ নিয়ে যে-সব চিঠি উৎপলবাবুর কাছ থেকে এসেছে তা যদি আর কেউ লিখত মিনতি দূর করে ছুঁড়ে ফেলে দিত। এর আগে অনেক মেয়ে-বন্ধুর সঙ্গে চিঠি লেখালিখি চলেছে। তাদের বিয়ে হবার পরে প্রায় বন্ধ। উৎপলবাবুই প্রথম অনাত্মীয় পুরুষ যাঁর সঙ্গে চিঠির আত্মীয়তা শুরু হয়েছে। তাঁর একখানা চিঠি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে কতবার করে যে পড়েছে মিনু, তার ঠিক নেই। ভাষা ত সঙ্কেত, ভাষা ত এক ধরনের ইশারা ছাড়া কিছু নয়। সেই সঙ্কেতের ভিতর থেকে কী নিগূঢ় অর্থ বের করা যায়, কথার সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে, মনের কোন্ গোপনতম গহ্বরে পৌছান চলে, বার বার সেই চেষ্টা করেছে মিনতি। না করে উপায় ছিল না। এ তো দিদিদের দাম্পত্যপত্র নয়। যার আবরণের জন্যে শুধু একখানা খামই যথেষ্ট। চিঠি ভরে যে কথাগুলি মিনতির কাছে এসে পৌছয়, শুধু খাম ছিঁড়লেই কি তার অর্থ ধরা পড়ে? সেই নিহিত অর্থ কখনও থাকত প্রকৃত বর্ণনায়, কখনও থাকত সংগীতের তত্ত্ব আলোচনায়, কখনও থাকত উদ্ধৃত গানের কলিতে কলিতে লুকনো।

আর এই লুকনো পথেই ত অভিসারের আনন্দ। যে পথের রেখা ইশারার মত দেখা যায় কি যায় না সেই অস্পষ্ট পথই যে মিনুর একমাত্র পথ।

তবু সেই গোপনতা মাঝে মাঝে ধরা পডতে লাগল। বড়দিরা থাকে দিল্লিতে। জামাইবাবু সেক্রেটারিয়েটে কাজ করেন। বাপের বাড়িতে বেশী আসতে পারে না বড়দি। কিন্তু বীথির শ্বশুরবাড়ি এই মালদতেই। সে প্রায়ই আসে। সপ্তাহে একদিন দুদিন এসে না থাকলে বাবা অস্বস্তি বোধ করেন।

বেড়াতে এসে বীথি মাঝে মাঝে খুলে ফেলে মিনুর চিঠি। পড়ে আর মুখ টিপে টিপে হাসে।

মিন্নুর বুঝতে বাকী থাকে না এই হাস্যরসের উৎসটা কোথায়। রাগ করে বলে, 'আমার চিঠি কেন পড়লি? বিয়ের পর তোর ভদ্রতাবোধটুকুও গেছে।'

বীথি হাসে: 'অত চটছিস কেন? এ তো বরের চিঠিও নয়, প্রিয়বরের চিঠিও নয়। আমাদের পারিবারিক বন্ধুর চিঠি। ওতে কোন্ গোপন কথা লেখা আছে যে তুই লুকিয়ে রাখবি।'

পরিহাসটা বিষাক্ত তীরের মত মিন্নুর বুকে গিয়ে বেঁধে। লুকবার কিছু নেই সেই তো সবচেয়ে বড় দুঃখ। এর চেয়ে সত্যিই যদি ঢেকে রাখবার মত কিছু থাকত, এমন প্রচণ্ড মারাত্মক রকমের কথা যা পড়তে গিয়ে দারুণ লজ্জা পেত মিন্নু, তা হলেই যেন সবচেয়ে খুশী হত সে। কিন্তু তা তো হবার নয়। তাই বলে চিঠিগুলিতে একেবারেই যে কিছু নেই তাই বা কী করে বলে! চিঠির ভিতর থেকে কিছুই পাওয়া যায় না কিংবা দাতার কিছুই দেওয়ার ইচ্ছা নেই মিন্নুর মন একথা মানতে চায় না।

একদিন গিয়ে মিনতি মার কাছে নালিশই করে বসল, 'আচ্ছা মা, ছোড়দির এ কী স্বভাব বল তো!'

মা বললেন, 'কী হল তোদের আবার?'

মিন্নু বলল, 'ছোড়দি কেন আমার চিঠি পড়বে! এত চিঠি পেয়েও ওর আশ মেটে না? ওর মেয়ে-বন্ধু আছে, ছেলে-বন্ধু আছে, জামাইবাবুও শিকাগো থেকে সপ্তাহে সপ্তাহে চিঠি লেখেন। তবু কেন আমার চিঠির দিকে ওর বাজপাখির মত চোখ?'

বীথি হেসে বলে, 'খবরদার বাজপাখির চোখ বলবিনে। আমাকে সবাই বলে মৃগাক্ষী, মীনাক্ষী, ময়ূরাক্ষী—আর তুই বাজের সঙ্গে একটা বাজে তুলনা দিলেই হল?'

মাও হাসেন: 'তা বাপু তোমারই দোষ। তুমি কেন ওর পার্সনাল চিঠি দেখবে?' তারপর মিন্নুর দিকে ফিরে তাকিয়ে বলেন, 'আচ্ছা, উৎপলবাবুই বা সপ্তাহে সপ্তাহে তোকে অত কী লেখেন বল্ তো? আর তুই বোধহয় সপ্তাহে দুখানা লিখিস। কী যে এত কথা জমে ওঠে আমি তো বুঝতে পারিনে। আমার তো দু লাইন লিখতেই গায়ে জ্বর আসে। নীতির শাশুড়ী মাসখানেক হল সেই যে একখানা চিঠি দিয়েছেন, আজ পর্যন্ত তার জবাব দিতে পারলাম না।'

প্রতিবাদ করে করে চিঠিগুলির উপর এক সময় স্বাধিকারের প্রতিষ্ঠা করে মিনতি। তার চিঠি বীথিও খোলে না। খুললে মিন্নু কষ্ট পায়, তার অসুখ বাড়ে বলেই বোধহয় তাদের এই সহৃদয় বিবেচনা।

সব সময় যে বড় চিঠি আসত তা নয়, মাঝে মাঝে দু-এক লাইনে, দু-একটি কবিতার লাইনে উৎপলবাবু চিঠি শেষ করতেন।

তারপর ফের পুরো চিঠি শুরু হত। মিনুর রোগশয্যায় ওষুধপথ্য ফল আসত। সেই সঙ্গে খামেভরা চিঠিগুলি আসত। প্রায় কোন সপ্তাহই বাদ যেত না। প্রথম প্রথম সেই চিঠিগুলির মধ্যে কিছু থাকুক বা না থাকুক মিনুর মনে হত এই সুনিয়মে আসাই যে ভালবাসা। নিয়ম? তেতো ওষুধের মতই নিয়ম মিনুর কাছে প্রায় বিষ। নাওয়া খাওয়া বিশ্রামের কোন নিয়মই ওর মানতে ইচ্ছা করে না। শুধু চিঠির নিয়মই নিয়ম হয়েও ব্যতিক্রম। চিঠি লিখতে ভাল লাগে মিনুর। পেতে আরও ভাল লাগে। কিন্তু একথা যে কতখানি সত্যি, তার ঠিকমত যাচাই হয় না। কখনও মনে হয় লিখতেই তার বেশী ভাল লাগে। লিখে যাওয়াই যে পাওয়া। নিজেকে দিতে দিতেই যেন নিজেকে পাওয়ার স্বাদ বেশী করে মেলে।

শুয়ে শুয়ে যে চিঠিগুলি পেত মিনু সেগুলিতেই যেন অন্তরঙ্গ সুর বেশী বাজত। এ-সব চিঠির অনেক তার মুখস্থ হয়ে গেছে।

‘তোমার অসুখের কথা যত শুনি, নিজের স্বাস্থ্যের জন্যে তত আমার লজ্জা বাড়ে। মনে হয় আমি যেন একা একা একান্ত স্বার্থপরের মত জীবনের সমস্ত সুখ-সম্পদকে ভোগ করে চলেছি। গান আছে, গানের কলেজ আছে, দলবল নিয়ে ছুটোছুটির শেষ নেই। আমার আজ আগ্রা, কাল দিল্লি, পরশু বোম্বে, তরশু মাদ্রাজ। অবশ্য শুধু একার জন্যে নয়, একটি প্রতিষ্ঠানকে বাঁচিয়ে রাখবার ভার আমি নিয়েছি। তাতে আরও কয়েকজনের জীবিকা জড়িয়ে আছে। অজুহাত আছে আমার। এমনও হয় সেই অজুহাতে আমি আমার আসল কাজকে ফাঁকি দিই। আরও যে কত ফাঁকিতে জীবন ভরে ওঠে তার আর ঠিক নেই। তবু এত কাজ আর এত ফাঁকির মধ্যেও মাঝে মাঝে নির্জন নিঃসঙ্গ মুহূর্ত আসে। তা কাজ দিয়েও ভরা নয়, আবার ফাঁকি দিয়েও ভরা নয়। সেই দুর্লভ এক-একটি ক্ষণে আমি একজনের কথা ভাবি। আকাশের এক-একটি নিঃসঙ্গ তারার মত এমনি দু-একটি নিবিড় মুহূর্ত ছাড়া যাকে আমি আর কিছুই দিতে পারি নে।’

আর একখানা চিহ্নিত চিঠি টেনে নিয়ে খুলে পড়ল মিনু: ‘তুমি জানতে চেয়েছ তোমার মধ্যে আমি কী দেখতে পেয়েছি? এই প্রশ্ন করে তুমি অত সংকুচিত হয়েছ কেন? এ-জিজ্ঞাসা কি শুধু তোমার একার? তা তো নয়।

তোমার আমার সকলেরই। যাদের অনেক আছে, তারাও একথা জিজ্ঞাসা করে, যাদের কিছু নেই তারাও। কিন্তু কিছু নেই বলে কাউকে অপমান করবার অধিকার কি আমাদের আছে? আমি কিছু দেখতে পাইনি, আমার চোখ এড়িয়ে গেছে, বড়জোর এই কথাটাই বলতে পারি। দুটো চোখ আছে বলেই আমরা কি সবাইকে পুরোপুরি দেখতে পাই! আমিও যেমন অনেককে দেখিনে, আমাকেও তেমনি অনেকে দেখেও দেখে না।

'তোমার মধ্যে আমি কী দেখতে পেয়েছি, তার চেয়ে তোমাকে যে আমি দেখতে পেয়েছি, এই সত্যই আমার কাছে বড়। নাও তো দেখতে পারতাম। চোখ এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব ছিল না। তোমার মধ্যে দর্শনীয় কিছু কম আছে বলে নয়। যারা চোখকে প্রলুব্ধ করে, আকৃষ্ট করে, তাদেরও তো দেখেছি। কখনও লুকিয়ে, কখনও আড়চোখে, কখনও বা সোজাসুজি। কিন্তু সেই চোখের দেখাকে কতক্ষণই বা মনে রাখতে পেরেছি?

'জীবনে এই দুর্ভাগ্যই তো বেশী ঘটে যখন আমরা একজন দেখি, আর একজন দেখিনে। কিংবা রূপের চেয়ে বিরূপতাকে দেখি, গুণের বদলে দোষের আকরকে দেখতে পাই। কিন্তু দুজনেই যখন পরস্পরকে দেখি, তখন তিল আর তিল থাকে না, তিলোত্তম হয়, তিলোত্তমা হয়ে ওঠে।

'তোমার কথার জবাব তোমার কথাতেই দিতে হয়। তোমার মধ্যে এমন একজনকে দেখেছি যাকে আমিও নির্ভয়ে নিঃসংকোচে জিজ্ঞাসা করতে পারি আমার মধ্যে তুমি কী দেখলে?'

উৎপলবাবুর এ-চিঠি মিনু অনেকবার পড়েছে। রোগে আরোগ্যে, বিকালে সন্ধ্যায়, গভীর রাত্রে মেঘে ঢাকা বর্ষার দিনে, ফুটফুটে কোজাগরী জ্যোৎস্নায় রাত জেগে এ-সব চিঠি পড়েছে মিনু। কোন কোন মুহূর্তে রোমাঞ্চিত হয়েছে, মুগ্ধ হয়েছে, আবার এমন দুঃসময় এসেছে যখন সন্দিগ্ধও কম হয়নি! এই যে পরতে পরতে কথার স্তর, এর মধ্যে কোথাও কি সত্য বলে কিছু আছে? আন্তরিকতা আছে? এই কথায় ভরা চিঠিগুলি ছাড়া তার অন্য প্রমাণ কই? যে ভালবাসে সে কি অত কথা বলতে ভালবাসে? ভালবাসা কি শুধু মূককে বাচাল করে? বাচালকেও মূক করে না? দুঃসহ সন্দেহ হয়েছে মিনুর। আর সেই সংশয়ের জ্বালায় নিজেই ছটফট করেছে। চিঠিগুলিকে মনে হয়েছে অভিশাপের মত। এতে যে যত সুখ তত যন্ত্রণা তা কি সে আগে জানত!

মার কাছে অসুখের কথা বলে রেহাই পেয়েছে। কিন্তু বীথির কাছে তো ছাড়া

পাবার জো নেই। সে ধরে ফেলেছে। অন্ধকারে ছাদের আলিসায় বসে নিজের হাতের মধ্যে মিনুর শীর্ণ মুঠি চেপে ধরে রেখেছে বীথি। যেন কিছুতেই আর ছাড়াছাড়ি নেই। সামনে অন্ধকারে কলনাদে বয়ে চলেছে বর্ষার মহানদী। খাপে-ঢাকা বাঁকা তলোয়ার শুধু ঝিলম নয়, যে-কোন নদী যে-কোন নদ, যে-কোন নারী যে-কোন নর। তার খাপের বাঁকা তলোয়ার অকস্মাৎ এসে বিঁধতে পারে যে-কোন বুকে, যে-কোন মুহূর্তে।

বীথি আস্তে আস্তে বলেছে, 'মিনু, তুই ওসব চিঠি লেখালেখি ছেড়ে দে।'

মিনু বলেছে, 'কেন বীথিদি?'

বীথি জবাব দিয়েছে, 'ছেড়ে না দিলে তোর অসুখ সারবে না। আমরা প্রথম প্রথম ভাবতাম চিঠি পাওয়া, চিঠি লেখা তোর পক্ষে রিক্রিয়েশনের কাজ করবে, তুই যখন আনন্দ পাস—। কিন্তু এ যে দেখছি হিতে বিপরীত হল।'

মিনু বলেছিল, 'বীথিদি, সত্যিকারের কোন্ আনন্দে দুঃখের মিশেল নেই বল তো?'

বীথি চটে উঠে বলেছিল, 'তোর ওসব বস্তাপচা তত্ত্বকথা রাখ তো! আনন্দের স্বাদের সঙ্গে দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণার স্বাদের কোন মিল নেই। ও-সব কবিদের কল্পনা-বিলাস। তুই আমার শাড়ি-গয়নার বিলাসিতা নিয়ে ঠাট্টা করিস, কিন্তু মানসিক বিলাসিতা আরও খারাপ।'

মিনু এ-কথার কোন জবাব দেয় নি।

বীথি বলেছিল, 'তা ছাড়া সে ভদ্রলোকের স্ত্রী আছে, ছেলেমেয়ে আছে, সঙ্গীত-সঙ্গিনীদেরও অভাব নেই। তুই কোন্ আশায়—'

মিনু তাড়াতাড়ি হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বীথির মুখ চেপে ধরেছে, 'চুপ কর্ বীথিদি, চুপ কর্। তুই এত ভালগার হতে পারিস আমার ধারণা ছিল না।'

সেখান থেকে উঠে মিনু সেদিন নিজের ঘরে গিয়ে খিল দিয়েছিল। সে-রাত্রে আর খায়নি, ঘুমোয়নি। তারপর মিনু ইচ্ছা করেই পত্রধারাকে বন্ধ করে দিল। তার চিঠি-লেখালেখির যখন এমন অপব্যাখ্যাই হয় দরকার নেই লিখে। কিন্তু না লিখে যে বড় কষ্ট। মনে হয় জীবনের স্রোতই যেন শুকিয়ে ফেটে গিয়েছে। গ্রীষ্মের মহানন্দার মত তাতে শুধু বালি, শুধু বালি।

সে না লিখলেও পর পর একখানা নয়, দুখানা চিঠি এল উৎপলবাবুর। মিনু পড়ল, বার বার পড়ল, কিন্তু জবাব দিল না। বেশ মজা। তিনি ভাবুন তিনি উদ্বিগ্ন হন। তাঁর মনে এই বিশ্বাস আসুক যে, মিনুর খুব শক্ত অসুখ

হয়েছে আর সেই অসুখে ভুগে ভুগে সে মরে গিয়েছে। একজন যদি এমনি করে হঠাৎ মরে যায় আর একজন যদি তা কিছুতেই জানতে না পারে, আর না জানতে পেরে দূর দূরান্তর থেকে সে যদি সারা জীবন তাকে চিঠি লিখে যায়, তা হলে বেশ হয়। চিঠির পর চিঠি, চিঠির পর চিঠি। মিনু নেই কিন্তু তার উদ্দেশ্য চিঠিগুলি আসছে, বেশ লাগে ভাবতে। তার সমাধি ফুলের বদলে চিঠির স্তবকে ভরে উঠছে বেশ লাগে ভাবতে। তাকে কি এমন ভাল কেউ বাসে না যে তার কাছ থেকে চিঠির জবাব না পেয়েও সে চিঠি লিখে যাবে? মিনু বেঁচে না থাকলেও আর-একজন জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তার উদ্দেশে শুধু চিঠি পাঠাবে?

মিনু তার ডায়েরিতে লিখে রাখল কথাগুলি। যেন নিজেকে নিজে চিঠি লিখছে। নিজেকে নিজে প্রশ্ন করছে। কিন্তু সব প্রশ্নের জবাব কি নিজের দিতে ইচ্ছা করে? জীবনটাকে আগাগোড়া কি অত বড় একটা পরীক্ষার খাতা ভাবতে ভাল লাগে যে, যা লিখবে মিনু নিজেই লিখবে, তার লেখা কেউ লিখে দেবে না, তার কথা কেউ বলবার থাকবে না?

প্রশ্নের জবাব মিলতে দেরি হল না। দিন দুই বাদেই ছোড়দা একখানা টেলিগ্রাম নিয়ে এসে হাজির। হেসে বলল, 'কী রে, তোরা কি ঝগড়াঝাঁটি করেছিস নাকি?'

মিনু অবাক হয়ে বলল, 'ঝগড়া আবার কার সঙ্গে ছোড়দা?'

ছোড়দা হেসে বলল, 'আবার কার সঙ্গে? দিল্লিতে ন্যাশনাল প্রোগ্রাম করতে গিয়েও ভদ্রলোকের স্বস্তি নেই। আমাদের অফিসে টেলিগ্রাম করেছেন তুই কেমন আছিস জানতে চান। একেবারে প্রিপেড টেলিগ্রাম।'

লজ্জায় মিনু নিজের ঘরের কোণে এসে মুখ লুকাল। ছি ছি ছি, তার জন্যে টেলিগ্রাম! বাবা মা ছোড়দারা কী ভাবলেন! সব যে ধরা পড়ে গেল! টেলি-গ্রামের সাঙ্কেতিক অক্ষরগুলি শুধু ত সঙ্কেতের মধ্যে গোপন রইল না। হীনবুদ্ধি পোস্টমাস্টার তাকে যে আবার ভাষায় ধরে দিয়েছেন। কিন্তু কী আশ্চর্য, এই সীমাহীন লজ্জার সঙ্গে, এক গোপন আনন্দের ধারাও এসে মিশে গেল। 'আনন্দধারা বহিছে ভুবনে।' সে ভুবন নিশ্চয়ই শুধু বাইরের ভুবন নয়।

যুক্ত বেণীর মত দুটি ধারা ঘিরে ধরল মিনুকে। ধরা পড়বার লজ্জা, আর ধরা পড়বার গর্ব। ধরা দেওয়ার ভয় আর ধরে দেওয়ার পরিতৃপ্তি। কে বলে আনন্দের ধারা অবিমিশ্র, একস্রোতা? বীথি কিছু জানে না, কিচ্ছু

জানে না। জীবনের কত স্বাদ যে বিষাদের মোড়কে মোড়া বীথি তার কিছু জানে না।

শুধু টেলিগ্রাম নয়, কলকাতা থেকে এল কয়েকখানা নতুন রেকর্ড। উৎপলদা তার নামেই পাঠিয়েছেন। মিনুর নামে।

গ্রীষ্মের পরে বর্ষা এসেছে। মিনুর জানলার তলা দিয়ে মহানন্দা ভরে উঠেছে, ছুটে চলেছে। সে চলার শেষ নেই, দিগ্‌বিদিক্‌ জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে চলেছে।

মিনুর ঘরে বাজে বর্ষার গান—

'আজ আকাশের মনের কথা ঝরঝর বাজে
সারা প্রহর আমার বুকের মাঝে!'

মিনুর গলায় স্বর নেই, সে গভীর রাত্রে নিজের মনে আবৃত্তি করে—

'শ্রাবণের ধারার মতো পড়ুক ঝরে পড়ুক ঝরে
তোমারি সুরটি আমার মুখের পরে বুকের 'পরে।'

ডাক্তারের নিষেধ অগ্রাহ্য করে মিনু জানলা খুলে দিয়ে তার ধারে গিয়ে দাঁড়ায়। শিকগুলির সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দেয়। মিনুকে বাধ্য হয়ে মানতে হয় এই শিকগুলির বাধা। কিন্তু বাইরের প্রবল বর্ষণ কি কোন বাধা মানে? সে ঝাপটায় ঝাপটায় মিনুর সর্বাঙ্গ ভিজিয়ে দেয়, তার সমগ্র সত্তাকে ছিনিয়ে নিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

মিনু আবৃত্তি করে—

'যা কিছু জীর্ণ আমার, দীর্ণ আমার জীবনহারা,
তাহারি স্তরে স্তরে পড়ুক ঝরে সুরের ধারা।
নিশিদিন এই জীবনের তৃষার 'পরে, ভুখের 'পরে।
শ্রাবণের ধারার মত পড়ুক ঝরে, পড়ুক ঝরে।"

আশ্চর্য, এত ভিজেও মিনু এবার আর অসুখে পড়ে না। বাবার ডাক্তারবন্ধু হেসে বলেন, 'তুমি ভাল হয়ে গেছ মা। অসুখটা তো তোমার আসলে— । এবার তুমি যা ইচ্ছে তাই খেতে পার, যেখানে খুশী যেতে পার। এখন থেকে তুমি পুরোপুরি স্বাধীন।'

স্বাধীন? কতটুকু স্বাধীনতা আছে মিনুর? শুধু মিনুর কেন? যে কোন মেয়ের? ডাক্তার তাঁর বাধা তুলে নিলেই কি সব বাধা উঠে যাবে?

বর্ষার পরে শরৎ গেল, শীত গেল। মহানন্দা আবার শীর্ণা, নিরানন্দা।

কিন্তু মিনুকে সেই যে বর্ষা এসে ছুঁয়েছিল, কানায় কানায় ভরে দিয়েছিল, তার যেন আর সরে যাওয়ার মন নেই।

সবাই বলছেন, 'তুই সেরে গেছিস মিনু, ভাল হয়ে গেছিস।' বাবা-মার এই কথার মধ্যে কোথায় যেন একটা নিগূঢ় অর্থ আছে। মিনু তা টের পায়। টের পেয়ে তার ভাল লাগে না। অত ভাল তো সে হতে চায়নি। এমন সারা তো সে সারতে চায়নি।

এদিকে তার আত্মীয়স্বজনের মধ্যে চক্রান্ত চলেছে। পাত্রের খোঁজ চলছে অনবরত। বক্স নম্বর দিয়ে কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে। ছি ছি ছি। চিঠিপত্রও নাকি আসতে শুরু করেছে; এ-চিঠিও চিঠি।

আমগাছগুলিতে বোল ধরেছে। ডালগুলি যেন ভেঙে পড়ে-পড়ে। মিনু দিনরাত জানালা খুলে রাখে। হাওয়ায় মুকুলের গন্ধ আসে। মালদয়ে বাস করেও পাকা আম মিনু ছোঁয় না। পাকা আমের গন্ধ সে ভালবাসে না। সে শুধু মুকুলের ভক্ত। যতক্ষণ দিনের আলো থাকে, মিনু চেয়ে চেয়ে দেখে গাছগুলির মাথায় মাথায় এই পুষ্পবৃষ্টি। তারপর আলো নিভে গেলে অন্ধকারে সেই সৌরভ যেন আরও ঘন হয়, ঘনিষ্ঠ হয়ে কাছে আসে। যেন বেশবাসের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে চায়।

গন্ধের পরে সুর। কিন্তু সে-সুরেও গন্ধেরই কথা।

উৎপলদার নতুন রেকর্ড বেরিয়েছে,—

'মন যে বলে চিনি চিনি
যে গন্ধ বয় এই সমীরে।'

চিনি চিনি, কিন্তু সত্যিই চিনি কি?

তারপর যা ঘটবার তাই ঘটেছে। ফলে গিয়েছে ঘটকালির ফল।

বাবা মিনুকে ডেকে পাঠালেন তাঁর ঘরে। মাও আছেন, বীথিও আছে। কিন্তু মিনুকে রেখে সবাই বেরিয়ে গেল। বাবা তাঁর চেয়ারটা ঘুরিয়ে নিয়ে তার দিকে চেয়ে বললেন, 'জলপাইগুড়ির ওই সম্বন্ধটাই ঠিক করলাম মিনু।'

মিনু জানে এই কথা শোনাবার জন্যেই তাকে ডাকা হয়েছে। সে মুখ নিচু করে বলল, 'আমাকে এ-সব কথা কেন বলা! আমি আগেই তো বলে দিয়েছি, বিয়ে আমি করব না।'

বাবা বললেন, 'সে কথা শুনেছি। কিন্তু তোমার 'না' বলার কোন কারণ নেই।'

সামান্য মুখ তুলে মিন্নু বলল, 'কেন ?'

বাবা বললেন, 'ছেলে হোক মেয়ে হোক যারা কোন জ্ঞানবিজ্ঞানের সাধনা নিয়ে থাকে কি দেশের কাজে যারা নিজেদের উৎসর্গ করে রাখে, তাদের বিয়ে না করার মানে বুঝতে পারি। কিন্তু তোমাদের মত মেয়ের পক্ষে বিয়ে না করার কোন অর্থ নেই।'

মিন্নু আবার মুখ নামাল।

বাবা বললেন, 'এতদিন তোমার অসুখবিসুখ ছিল, কিছু বলি নি; কিন্তু এখন ত তোমার সে-সব নেই—।'

মিন্নু বলল, 'কী করে জানলে যে নেই। বাবা, তুমি নামজাদা ইঞ্জিনিয়ার, কিন্তু তুমি তো ডাক্তার নও।'

বাবা বললেন, 'মিন্নু, বাপকে কখনও উকিল হতে হয়, কখনও ডাক্তার হতে হয়, কখনও গুরু হয়ে ঠিক পথ দেখিয়ে দিতে হয়। তার দায়িত্ব অনেক।'

মিন্নু বুঝতে পারল প্রতিবাদ নিষ্ফল। সে মনে মনে বলল, 'জানি জানি, বাপকে সবই হতে হয়। শুধু কবি হতে নেই, শিল্পী হতে নেই, প্রেমিক হতে নেই।'

নহবত এখনও আসেনি, কিন্তু সারা বাড়িতে বিয়ের বাজনা বাজছে। মিন্নুকেও আগে থেকেই বিয়ের সাজ না সাজলে চলবে না।

গৌহাটি কলেজে বড়দা প্রফেসর। সেখানে টেলিগ্রাম গিয়েছে। তিনি যেন অবিলম্বে সস্ত্রীক চলে আসেন। ছোড়দাও ছুটি নিয়েছে অফিস থেকে। কাছে আছে বলে চাপটা তার উপরেই বেশী। নিমন্ত্রণের চিঠি ছাপানো হয়েছে। কিন্তু ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বন্ধুদের তো শুধু ছাপানো চিঠি দিলে চলে না। তাই চিঠি লেখা চলেছে। বাবা লিখছেন, মা লিখছেন, দিদিরা লিখছে। আজ সবারই চিঠি লেখার পালা।

কিন্তু এত কাজ এত ব্যস্ততার মধ্যেও মা আসল কথাটা ভোলেননি। মিন্নুকে একান্তে ডেকে নিয়ে তার পিঠে একটু হাত বুলিয়ে দিয়েছেন, তারপর কপালের উপর থেকে দু-এক গাছি চুল সরিয়ে দিতে দিতে বলেছেন, 'সেই চিঠিগুলির কী করলি ?'

মিন্থ এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলেছে, 'কী আবার করব ?'

মা বলেছেন, 'নষ্ট করে ফেল। লক্ষ্মী মেয়ে। ওগুলি দিয়ে তো আর কোন দরকার নেই। কিছু নেই যদিও তবু পড়ে যদি কেউ কিছু ভাবে।'

মিন্থ কোন কথা বলেনি।

মা বলেছেন, 'কিসে কী হবে। শেষে অশান্তির শেষ থাকবে না।'

মিন্থ মাকে আশ্বাস দিয়েছে, 'ভেব না। যা করবার আমি ঠিকই করব।'

বীথিরও চিন্তা ওই চিঠিগুলি নিয়ে। কেউ তো হিতৈষিণী কম নয়। দু-দুবার করে জিজ্ঞাসা করেছে বীথি, 'চিঠিগুলির কী করলি ?'

মিন্থ বলেছে, 'এখনও কিছুই করিনি।'

বীথি বলেছে, 'করে ফেল্। যা করবার এখনই ডিসাইড করে ফেল্। নষ্ট করতে যদি না চাস যার চিঠি তাকে ফিরিয়েও দিতে পারিস।'

বীথি পরামর্শ দিয়েছে।

মিন্থ বলেছে 'ছিঃ।'

বীথি বলেছে 'ছিঃ কেন ? শুনেছি অনেকেই তো এমন করে।'

মিন্থ বলেছে, 'তুমি ভেব না, যা করবার আমি ঠিকই করব।'

ফেরত দেওয়ার কথায় মন সরেনি মিন্থর। সে নিজের কোন লেখা ফেরত চায় না। এ যেন কাগজের অফিসে গোপনে পাঠানো নিজের কবিতা ফেরত পাওয়া। এ-পাওয়ার মত বড় হারানো আর নেই। সে যেমন নিজের লেখা ফেরত চায় না, নিজের চিঠি ফেরত চায় না তেমনি অন্যের চিঠি ফেরত দিলে তার যে কী অপমান তাও সে বোঝে। চিঠি লেখা আর-একজনের চিঠির জন্যে, নিজের চিঠি ফেরত পাওয়ার জন্যে তো নয়। পালা যখন শেষ হয়ে যায়, চুপ করে থাকতে হয়; গান যখন শেষ হয়ে যায়, চুপ করে থাকতে হয়। যে গায় আর যে শোনে, তাদের কারও বলবার দরকার হয় না 'শেষ হল'। যতি চিহ্নের জন্যে একটি দীর্ঘশ্বাসই যথেষ্ট।

দেরাজ থেকে চিঠির তাড়াগুলি একে একে বাইরে নামাল মিন্থ। সন তারিখ মিলিয়ে ইতিহাসের মত সাজানো। একটি সম্পর্কের ইতিহাস। রাজা রানী সেই, ছোটখাট মান-অভিমান ছাড়া যুদ্ধ নেই, বিগ্রহ নেই, তবু এক টুকরো ইতিহাস আছে। মিন্থ একবার ভেবেছিল চিঠিগুলিকে নতুনভাবে সাজাবে। সন-তারিখের ফিতেয় না বেঁধে নতুন ধরনে বাঁধবে। যে চিঠিগুলি

তাড়াতাড়িতে লেখা নয়, কাজের চাপে যে-সব চিঠি কুঁকড়ে ছোট হয়ে পড়েনি, কিংবা কথার চাপে যে চিঠিগুলিতে রসের স্বল্পতা ঘটেনি, যে চিঠিগুলি কয়েকটি মধুর মুহূর্তকে সত্যিই বুকে করে ধরে রেখেছে, মিনু বেছে বেছে সেই চিঠিগুলিকে আলাদা করে রেখে দেবে। তার স্বাদ যে আলাদা। শুধু চিঠি কেন, প্রিয়জনের সব কথা, কাজ আর আচরণের ভিতর থেকে প্রিয়তমকে বেছে নেওয়ারও এই রীতি। তার প্রকাশ তার শ্রেষ্ঠ দানে, তার প্রকাশ তার শ্রেষ্ঠ মুহূর্তগুলিতে, তার প্রকাশ তার শ্রেষ্ঠ গানে।

আজ সব ছাই করে দেওয়ার দিন এসেছে।

হ্যাঁ, এগুলি পুড়িয়ে ফেলাই ভাল। তাতে নিজে খাক হয়ে যাবে মিনু, তবুও। সত্যিইত চিঠিগুলির মধ্যে কটি কথা খাঁটি, কটি কথা অন্তরের স্পর্শ পেয়েছে তার ঠিক কি! আন্তরিকতাই যদি থাকবে তাহলে অন্তত আর একবার তিনি এসে দেখা করতে পারতেন। কিন্তু নিজে থেকে আসা দূরের কথা এখানকার সংস্কৃতি-পরিষদ অনেক সাধাসাধি করেও তাঁকে আনতে পারেনি। প্রতিবারই অন্য কোন কাজে তাঁকে আটকে রেখেছে, অন্য প্রোগ্রামের সঙ্গে সংঘাত বেধেছে। কেন আসেননি, মিনু জানে। পাছে তাকে দেখে আরও খারাপ লাগে। পাছে চিঠির ছলনা চোখের দৃষ্টির কাছে ধরা পড়ে যায়। মিনু সব জানে, সব বুঝতে পারে।

সেইজন্যেই কলকাতায় মিনুর কয়েকবার যাওয়া সত্ত্বেও একবারও দেখা হয়নি; তিনি কোথাও-না-কোথাও প্রোগ্রাম করতে বেরিয়েছেন। কি অন্য কোন আকস্মিকতা তাঁর সহায় হয়েছে।

চিঠিগুলির যে অর্থ মিনু করেছে হয়ত সবই তার নিজের মনের বানানো। তিনি বানিয়েছেন একরকম করে, মিনু বানিয়েছে আর একরকমে। মুখের কথার মাটির মূর্তিতে সে মনের কথার রঙ লাগিয়েছে। আজ সেই মিথ্যার মূর্তির বিসর্জনের সময় এসেছে। সে নিরঞ্জন জলেই হক আর আগুনেই হক—একই কথা।

দেরাজ থেকে চিঠিগুলি টেনে বার করে মিনু মেঝের উপর স্তূপাকার করল। দেশলাইটায় আট-দশটা কাঠি আছে। পাঁচটি বছরের পক্ষে একটি কাঠিই যথেষ্ট। মিনু জ্বালতে চেষ্টা করল। কিন্তু কাঠিগুলিতে কি বারুদ নেই! একটাও যেন জ্বলতে চায় না। বিরক্ত হয়ে মিনু কয়েকটা কাঠি ছুঁড়ে ফেলে দিল। শেষ পর্যন্ত একটি জ্বলল। কিন্তু জ্বলন্ত কাঠিটা একবার এদিকে সরে

আর একবার ওদিকে সরে। যেন চিঠিগুলিকে তা পোড়াতে আসেনি, আরতি করতে এসেছে।

'কী করছিস তুই।'

বীথির চাপগলায় মিনুর চমক ভাঙল। ফিরে তাকাল মিনু। বীথি কী করে এল? তবে কি দরজায় খিল দিতেও মিনু ভুলে গিয়েছিল। বীথি বলল, 'ঘণ্টা দুই হয়ে গেল যে। এতক্ষণ লাগে! যা করবার তাড়াতাড়ি কর। ওঁরা যে এসে পড়েছেন।'

আধপোড়া নিবন্ত কাঠিটা দুটি আঙুলের ফাঁক থেকে আপনিই খসে পড়ল।

ক্লান্ত আর্ত অস্ফুট স্বরে মিনু বলল, 'দিদি, আগুনে দিতে পারলাম না ভাই, জলেই দিতে হবে।'

বীথি মিনুর দু চোখের দিকে তাকাল। তাকিয়ে তাকিয়ে বুঝল, সে জল মহানন্দার নয়।

দু পা এগিয়ে এসে বীথি ছোট বোনকে আরও কাছে টেনে নিল, বলল; 'আমার হাতে তুই সব ছেড়ে দে মিনু, তোর কোন ভয় নেই।'

মিনু মুখ ফিরিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, 'বীথিদি, এর পরও দু-একখানা চিঠি হয়তো আবার আসবে। সেগুলি রিডাইরেকট করবার দরকার নেই। সেগুলি আমি খুলতে আসব না। তোরাও যেন কেউ না খুলিস।'

বীথি বলল, 'কেউ খুলবে না বোন, তোর কোন ভয় নেই।'

জন্মদিন

দিনের আলো নিভে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শীতের সন্ধ্যা নেমে এল। একটুকাল হয়তো গোধূলির আলো ছিল। কিন্তু ইন্দুভূষণ তা লক্ষ্য করেন নি। চোখ ছিল বইয়ের পাতায়, মন ছিল নিজের জীবন পুঁথিতে। এলোমেলো ভাবে জীবন-ইতিহাসের পাতাগুলি উলটে-পালটে যাচ্ছিলেন ইন্দুভূষণ। যখন হাতে কোন কাজ থাকেনা, পাশে কোন লোক থাকেনা, এমন কি প্রিয় গ্রন্থকারও তাঁর পুরোন পাঠককে আর আকর্ষণ করতে পারেন না, তখন একা একা পেশেনস্ খেলার মতো, স্মৃতি-বিস্মৃতির আলোছায়ায় এমনি করেই লুকোচুরি খেলেন ইন্দুভূষণ।

আজ প্রায় সারাদিনই অন্যমনস্ক, কখনো বা অতীতমনস্ক ছিলেন তিনি। তাই প্রহরে প্রহরে দিনের রূপ বদলানোর পালা, দৃশ্যে দৃশ্যে পটপরিবর্তন দেখতে পারেননি। অথচ দেখবার কথা ছিল। অনেকবার দেখেওছেন। এই উনত্রিশে পৌষ তারিখটিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কতবার কতভাবেই না দেখেছেন। কখনো ভিতর থেকে কখনো বাইরে থেকে। কখনো ঘরে বসে কখনো বা ছুটোছুটি করে। কখনো, বন্ধুজনের সঙ্গে, কখনো নির্জনে। নানাভাবে নিজের জন্মদিনের স্বাদ গ্রহণ করেছেন ইন্দুভূষণ। কম তো নয়, পঁচাত্তর বার এই তারিখটি তাঁর জীবনে ফিরে ফিরে এসেছে। নানা বেশে, নানা ভূষণে।

চাকর অমূল্য এসে সামনে দাঁড়াল। ধমক খাবার ভয় সত্ত্বেও একটু ইতস্তত করে বলল, 'বাবু।'

ধমক দিলেন না ইন্দুভূষণ, শান্তভাবেই বললেন, 'কী বলছিস।'

'আলো জ্বেলে দেব বাবু? নাকি ঘরে গিয়ে বসবেন? আপনার যে ঠাণ্ডা লেগে যাচ্ছে।'

ইন্দুভূষণ বললেন, 'আচ্ছা, চল্ ঘরেই যাই।'

সারাদিন আজ তাঁর প্রায় বাইরেই কেটেছে। বাড়ির বাইরে নয়, ঘরের বাইরে। তাঁর দোতলার এই ঘরখানির পুবে পশ্চিমে দু'দিকেই বারান্দা। সকাল থেকে দুপুর পূবমুখী হয়ে রোদ পুহিয়েছেন। তারপর খেয়েদেয়ে চেয়ারে শুয়ে একটুকাল তন্দ্রার আবেশ উপভোগ করে আবার এসে বসেছেন পশ্চিমের বারান্দায়।

সূর্যের তাপ আর আলো আস্তে আস্তে ক্ষীণ হয়েছে। সহরের রাজপথে 'স্বপ্নসম লোকযাত্রা'। কেউ পদাতিক, কেউ রিকশায় চড়ে বসেছেন, কেউ বা ট্যাক্সিতে। এ পথে বাস-ট্রাম নেই। নেই তাই রক্ষা। না হলে কান পাততে পারতেন না ইন্দুভূষণ। আজকাল যে কোন রকম শব্দই তাঁর কানের পক্ষে দুঃসহ।

বারান্দার চেয়ার ছেড়ে ঘরের চেয়ারে এসে বসলেন ইন্দুভূষণ। এ চেয়ারেও আরাম আছে। হাত-পা ছড়িয়ে শরীরকে একেবারে এলিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু সেভাবে তিনি ছড়িয়ে দিলেন না। এই বয়সে যতখানি সম্ভব সোজা হয়ে শক্ত হয়ে বসলেন।

অমূল্য স্যুইচ টিপে আলো জ্বেলে দিল। প্রথমে ভ্রূ কুঁচকে চোখের ওপর একটু হাত রাখলেন ইন্দুভূষণ। তারপর হাতখানা আস্তে আস্তে সরিয়ে নিলেন। আলো খুব জোরালো নয়, শান্ত সহনীয়। সেই আলোয় নিজের অতি পরিচিত আর ব্যবহৃত আসবাবগুলি ফের ফুটে উঠল। অমূল্য ঝেড়েপুঁছে জিনিসপত্র-গুলিকে পরিচ্ছন্ন করে রেখেছে। কিন্তু তাদের প্রাচীনতা ঢাকবে কী করে। দুটো আলমারি আইনের বইয়ে ভর্তি। কিন্তু তালা দুটোয় বোধ হয় জং পড়ে রয়েছে। অনেক কাল খোলা হয় না। যে আলমারিগুলিতে সাহিত্য, দর্শন আর ইতিহাসের সংগ্রহ আছে সেগুলি বরং মাঝে মাঝে খোলা হয়ে থাকে। কাঁচের পাল্লার ভিতর দিয়ে এলোমেলো বইয়ের রাশ চোখে পড়ছে। অনেক আগে বইয়ের আলমারিগুলি অন্য ঘরে ছিল। সুহাসিনী বই বিশেষ পছন্দ করত না। শুয়ে শুয়ে তাঁকে বই পড়তে দেখলে সে বই কেড়ে নিয়ে তবে ছাড়ত। বলত, 'বই আমার সতীন, বই আমার দু'চোখের বিষ।'

সুন্দরী তরুণী স্ত্রীর মুখের সেই 'বিষ' কথাটি ইন্দুভূষণের কানে অমৃত ঢেলে দিত। তিনি হেসে বই সরিয়ে রেখে স্ত্রীকে বুকের মধ্যে টেনে নিতেন। তখন ভাবেননি এই প্রেমের শেষ আছে, ভাবেননি সমস্ত তৃষ্ণার তৃপ্তির জন্যে একটি নারীদেহই যথেষ্ট নয়।

—'বাবু!'

ইন্দুভূষণ এবার সত্যিই বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আঃ, তুই জ্বালালি আমাকে। কী ওটা।'

অমূল্য বলল, 'আপনার কফি। নাকি দুধ খাবেন? দুধ খেলেই কিন্তু ভালো করতেন বাবু।'

ইন্দুভূষণ বললেন, 'না না, দুধ আর নয়। তুই আর বউমা মিলে আমাকে একেবারে দুগ্ধপোষ্য বানিয়ে রেখেছিস। যা এনেছিস তাই দে।'

কফির পেয়ালাটা যেন অমূল্যের হাত থেকে কেড়ে নিলেন ইন্দুভূষণ, তারপর বললেন, 'যা, পালা এবার।'

অমূল্য মাইতি খুব বেশীদিনের চাকর নয়। চার পাঁচ বছর ধরে আছে এখানে। কিন্তু এই কয়েক বছরেই বেশ সেয়ানা আর সাহসী হয়ে গেছে। ধমক দিলে ভয় পায়না, ছুটে পালায়না। ধীরে স্থস্থে আড়ালে সরে গিয়ে মুখ টিপেটিপে হাসে। ইন্দুভূষণ সব বুঝতে পারেন, সব টের পান। আঠারো উনিশ বছর বয়স হয়েছে ছোঁড়ার। ঠোঁটের ওপর কচি কোমল কিশলয়ের মতো গোঁফ। ইন্দুভূষণের ব্লেড চুরি করে শয়তান মাঝে মাঝে দাড়িও কামায়। সে দাড়ি কড়া হতে এখনও ঢের দেরি। রঙ মিশমিশে কালো, কিন্তু মুখের ডৌলটুকু ভারি মিষ্টি, দেহের গড়ন স্থঠাম। আরো বয়স হলে ও অনেক মেয়েকে নাচাবে, পরে কাঁদাবে। রূপের ধর্মই তাই। 'রূপ লাগি আঁখি ঝুরে'।

তবু এখনো যার রূপ আছে, ইন্দুভূষণের কাছে তার সাত খুন মাপ। ঝি চাকর অবশ্য কেউ তাঁকে এপর্যন্ত খুন করেনি, শুধু ঘড়ি কলম মনিব্যাগ চুরি করে পালিয়েছে। স্থহাস বলত, 'তোমার আর শিক্ষা হয়না!'

তা অবশ্য হয়নি। বার বার ঠকেও শিক্ষা হয়নি ইন্দুভূষণের। পুরনো চাকর-বাকর বেশিদিন সহ্য করতে পারেননি। তিনি নিত্য নতুনের মধ্যে জীবনের বৈচিত্র্যকে ভোগ করতে চেয়েছেন! নতুন চাকর দারোয়ান, নতুন আসবাবপত্র, নতুন বন্ধু, নতুন বান্ধবী। দিন যখন ছিল, পৃথিবী তাঁর এই নবত্বের দাবি দু'হাতে মিটিয়েছে। আজ সব শেষ। 'যৌবন।' বৃদ্ধ ইন্দুভূষণ চৌধুরী ধীরে ধীরে উচ্চারণ করে যেন জিভ দিয়ে শব্দটির স্বাদ গ্রহণ করলেন, 'যৌ-ব-ন।' সে যখন মানুষকে রাজা বানিয়ে রাখে তখন দাসত্বেও স্থখ। ক্ষুধার জন্যে দাসত্ব, তৃষ্ণার জন্যে দাসত্ব। সে দাসত্বকে তখন আর বন্ধন বলে মনে হয়না। মনে হয় পরে, অনেক পরে যখন যৌবন ঝরে যায়, যখন জরার হাত থেকে শুধু অভিশাপ ঝরে।

—'বাবু।'

ইন্দুভূষণ চোখ তুলে তাকালেন, 'আবার বাবু! কফি তো খেয়েছি। আবার কি।'

অমূল্য বলল, 'আর কিছু খাবেননা বাবু? দুটো সন্দেশ খান। ভালো সন্দেশ নিয়ে এসেছি বাবু। নতুন গুড়ের সন্দেশ।'

ইন্দুভূষণ একটু হাসলেন, 'তোরা নতুন মানুষ তোরাই খা। পৃথিবীর সমস্ত গুড় আর মধু তোদের জন্যে। নতুন গুড় আর এই পুরোন পেটে সইবে না।'

অমূল্য বলল, 'কিন্তু বাবু আজ যে আপনাকে একটু মিষ্টি খেতে হয়। আজ যে আপনার জন্মদিন বাবু। বউমা অত করে বলে গেছেন—

ইন্দুভূষণ ভেংচাবার ভঙ্গিতে বললেন, 'বলে গেছেন! আমার ওপর ভারি তো তাঁর দরদ! আজকের দিনে সকাল থেকে তাঁর দেখাই নেই।'

অমূল্য বলল, 'ছন্দা দিদিমণির যে অসুখ বাবু। তাইতো তিনি সকালের গাড়িতে আসানসোল রওনা হয়ে গেছেন। আপনাকে তো বলেই গেছেন। আপনার মনে নেই!'

ইন্দুভূষণের এবার সব মনে পড়ল। তাঁর নাতনী ছন্দার ছেলেপুলে হবে। এই নিয়ে তিনবার। আগের দু'বার ছন্দাকে নিজের কাছে এনে রেখেছিলেন ইন্দুভূষণ। একবার দিয়েছিলেন ভবানীপুর নার্সিং হোমে। আর একবার মেডিকেল কলেজে আলাদা কেবিন ভাড়া করে রেখেছিলেন। সন্তান কোনবারই বাঁচেনি। তার ফলে ছন্দার শ্বাশুড়ীর ধারণা হয়েছে দোষটা কলকাতা সহরের। কুসংস্কার আর কাকে বলে। ছন্দাকে তারা নাকি এবার আর জায়গা নাড়া করবেন না। আসানসোলে নিজেদের কাছেই রাখবে। মেয়ের শরীর নরম হয়েছে খবর পেয়ে অণিমা ছুটেছে সেখানে। বর্বরদের হাতে পড়ে মেয়েটা এবার রক্ষা পেলে হয়।

ইন্দুভূষণ একটুকাল নাতনীর কথা ভাবতে থাকেন। আহা, প্রসববেদনায় কচি মেয়েটা কী কষ্টই না পাচ্ছে। কিংবা হয়তো এতক্ষণে একটি ছেলে হয়ে গেছে ছন্দার। ইন্দুভূষণের জন্মদিনে তাঁরই বংশে না হোক, তাঁরই অংশে আর একটি মানব ভূমিষ্ঠ হয়েছে। ভাবতে মন্দ লাগছে না। তাই হোক। এবার ছন্দার সব কষ্ট সার্থক হোক। ছেলে হয়ে বেঁচে থাকুক।

মেয়েদের মধ্যে প্রবাদ আছে প্রসূতি যখন খুব কষ্ট পায় তার ছেলে হয়। ছেলে নাকি মাকে খুব যন্ত্রণা দিতে দিতে আসে। কারণ ছেলে হল সুসন্তান। শ্রেষ্ঠ সন্তান। ঠিক লেখকের শ্রেষ্ঠ লেখার মতো। ইন্দুভূষণ দেখেছেন যে লেখা তাঁকে খুব যন্ত্রণা দিয়েছে, দিনের পর দিন রাতের পর রাত ভাবিয়েছে, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত

করে রেখেছে, যে লেখা আহার-নিদ্রাকে অস্বস্তিতে ভরে দিয়েছে, যার জন্যে অনেক কাগজ ছিঁড়েছেন, অনেক সময় অপব্যয় করেছেন—সেই লেখার জন্যেই তাঁর নিজের তৃপ্তি আর লোকের সুখ্যাতি লাভ ঘটেছে।

'কবিতা বনিতা চৈব সুখদা স্বয়মাগতা' এ কথা সব সময় সত্য নয়। অনেক যন্ত্রণা, অনেক কৃচ্ছ্রতার ভিতর দিয়ে যে আসে স্থায়ী গভীর অনাস্বাদিত সুখ সেই দিতে পারে।

ইন্দুভূষণ স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেছেন, বান্ধবীদের জিজ্ঞাসা করেছেন, শেষবয়সে নাতনীকেও জিজ্ঞাসা করেছেন, মেয়েদের প্রসবযন্ত্রণার সঙ্গে শিল্পীর সৃষ্টির যন্ত্রণার কোন মিল আছে কিনা। কোন্ যন্ত্রণার তীব্রতা বেশি। তারা কেউ সঠিক জবাব দিতে পারেনি। জবাব ইন্দুভূষণ নিজের মনেই খুঁজে নিয়েছেন। একের সঙ্গে আর একের তুলনা হয় না। প্রথমটা শারীরিক, দ্বিতীয়টা মানসিক। একটা জৈব আর একটা অজৈব। কিন্তু তাই কি সত্য? মানুষের শরীর আর মনকে, তার রচনার রূপ আর ভাবকে অমন বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায়? শরীরের যন্ত্রণা কি মনের যন্ত্রণা নয়? মানসিক কষ্ট কি শরীরের কষ্ট নয়? তাঁর একমাত্র ছেলে যখন মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে মারা গেল তখন ইন্দুভূষণের শরীর সবচেয়ে সুস্থ ছিল। কিন্তু সেই দৈহিক স্বাস্থ্য কি তখন মুহূর্তের জন্যেও তিনি উপভোগ করতে পেরেছেন? নিজের যে দেহ আছে আর সেই দেহের এমন অনির্বাণ ক্ষুধা-তৃষ্ণা আছে তা কি তখন একবারও মনে হয়েছিল ইন্দুভূষণের? তিনদিন তিনি অন্নজল স্পর্শ করেননি, তারপর আরো দীর্ঘদিন কোন নারীর সান্নিধ্য-তৃষ্ণা তাঁর মনকে চঞ্চল করেনি। যে তৃষ্ণার অগ্নি প্রায় সারাজীবন তাঁকে জ্বালিয়েছে, শুধু পুত্রশোকের অশ্রু তা কিছুদিনের জন্যে নির্বাপিত করে রেখেছিল। তখন তাঁর দেহ বলে কোন বস্তু ছিল না। শুধু মন। আর সেই মন শুধু একটি অনুভূতির সঙ্গে একাত্ম। সেই দুঃসহ অনুভূতির নাম পুত্রশোক। সময়ের ভেলায় সেই শোকসমুদ্র ইন্দুভূষণ অনেক দিন হল পার হয়ে এসেছেন। তবু মাঝে মাঝে সে কথা মনে পড়লে যেন হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে যায়। ইন্দুভূষণ খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। তুমি একটি শিশুকে ভূমিষ্ঠ হতে দেখলে, তোমার স্ত্রীর কোলে হাত পা নেড়ে তার খেলা দেখলে, মুখের আধো-আধো বোল শুনলে, আর একটু পরিচিত হওয়ার পর মায়ের কোল থেকে সে যখন তোমার কোলে মাঝে মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল, তার অপূর্ব স্পর্শসুখ পেলে,—এও কচি কোমল মেদেরই স্পর্শ, সম্পূর্ণই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। তবু নারীস্পর্শ থেকে এই স্পর্শের স্বাদ কত আলাদা।

রসনায় যেমন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্বাদবৈচিত্র্য ধরা পড়ে, ত্বকেও তেমনি। তারপর সেই ছেলে তোমার চোখের সামনে ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠল। প্রতি পলে তোমার চোখের সামনেই সে বেড়েছে তবু যেন তোমার সম্পূর্ণ অগোচরে। তার এই ক্রমবিকাশ আর পরিণতি একেবারেই তোমার চোখের আড়ালে থেকে গেছে। তুমি তাকে খাইয়েছ, পরিয়েছ, লেখাপড়া শিখিয়েছ তবু তুমি তার অনেক কথাই জানোনি। তারপর তুমি একদিন তোমার এই প্রতিরূপের দিকে দ্বিতীয়-তুমির দিকে তাকিয়ে নিজেই বিস্মিত হলে, মুগ্ধও হলে, 'আরে মনুয়া, তুই দেখি মাথায় আমাকেও ছাড়িয়ে গেলি!'

মনুয়ার মা কোপের ভান করে বলল, 'খবরদার তুমি আমার ছেলের দিকে চোখ দিয়োনা। ছাড়াবেনা? ও তোমাকে সবদিক থেকে ছাড়াবে।'

তুমি হেসে বললে, 'ছাড়ালেই ভালো।'

তারপর সে আরো বড় হল। তোমাকে ছাড়াতে না পারলেও কখনো কখনো তোমার সে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে লাগল। তোমার দাম্পত্য কলহে সে তার মার পক্ষে দাঁড়ায়। তুমি কিছু অন্যায় করলে তার তীব্র প্রতিবাদ করে শাসন করতে চায়। তোমার গৌরবে যেমন তার গর্ব, তোমার অপমানে তেমনি তার লজ্জা। অন্য নারীর প্রতি তোমার বিন্দুমাত্র আকর্ষণকে সে সহ্য করেনা, তোমার অল্পস্বল্প মদ্যপানকে সে তীব্র ঘৃণা করে। তোমার চালচলন আচার আচরণের প্রতিবাদে সে তোমার সঙ্গে কথা বন্ধ রাখে। যে আত্মজকে তুমি তোমার দ্বিতীয় সত্তা বলে ভেবেছিলে তাকে তোমার পর মনে হয়, শত্রু মনে হয়।

সে তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিজের জীবিকা খুঁজে নেয়, নিজের বন্ধুর বোনকে ভালোবেসে বিয়ে করে। তুমি তাতে আরো ক্রুদ্ধ হও, তোমার মনে হয় নিজের ছেলের ওপর তোমার সব অধিকার তুমি হারিয়েছ। একই বাড়িতে একই অন্নে তোমরা থাক তবু সে যেন এক স্বতন্ত্র পরিবারের কর্তা। তার স্বাধ-আহ্লাদ ভাবনা-বেদনা সব তার সেই ছোট পরিবারটুকুকে ঘিরে। তার দাম্পত্য সুখ, তার পারিবারিক শান্তি দেখে তোমার মাঝে মাঝে হিংসা হয়। তার স্বার্থপরতায় তুমি বিরক্ত হও, ক্রুদ্ধ হও। তুমি ভাব তোমার দেহজ-পুত্রের চেয়ে তোমার মানসপুত্রেরা তোমার বেশি আপন। যাদের তুমি অক্ষরে অক্ষরে গড়ে তুলেছ, শুধু রক্তে নয়, রঙে রসে, নিজের বাসনা-কামনার অংশ দিয়ে যাদের তুমি প্রাণবন্ত করে তুলেছ, যারা তোমার শুধু রক্তবীজ নয়, যারা তোমার ভাবনার

বীজ, যারা তোমার আপন সত্তার ভগ্নাংশ হয়েও সম্পূর্ণ, সমগ্র—তারাই তোমার যথার্থ আত্মজ। তোমার নাম আর কীর্তি তারাই যুগ হতে যুগান্তরে বহন করে নেবে। তোমার দেহজাত যে পুত্র সে আকস্মিক, সে তার মায়ের বাধ্য, স্ত্রীর বশ, তোমার মনের খবর সে কতটুকু রাখে! কিন্তু যারা তোমার মানসপুত্র তারা তোমার মনঃপূত, তারাই তোমার যথার্থ আত্মজ। তুমি তোমার ছেলের ওপর বিমুখ হলে, উদাসীন হয়ে রইলে। তার ভালোয় মন্দে, হিতাহিতে তুমি নেই। তুমি শুধু রূপ খুঁজে খুঁজে বেড়াও। লতায় রূপ, পাতায় রূপ, পুষ্পে পুষ্পে বিচিত্র বর্ণ-সমারোহ, নারীর নয়নে রূপ, অধরে রূপ, তার ভূষণে রূপ, ভাষণে রূপ, সেই রূপতৃষ্ণাই তোমার রূপসৃষ্টির কাজে প্রধান প্রেরণা। এই তৃষ্ণার নির্বাণ তুমি চাওনা, কারণ তুমি জানো তুমি তাহলে নিজেই নির্বাপিত হবে। তুমি নিজের সংসারে আগুন জ্বালাও, অন্যের সংসারে আগুন জ্বালাও, নিজে জ্বলেপুড়ে খাক হও, তোমার ভ্রূক্ষেপ নেই। তুমি মনে মনে জানো এই আগুনের ভিতর থেকে যারা বেরিয়ে আসবে তারা খাঁটি সোনা। তুমি নিজের চেয়ারে শক্ত হয়ে বসে শীতের শেষরাত্রে শক্ত করে কলম ধরে নিজের মনে মনে বল, 'প্রবৃত্তি, আমি তোমার দাস। কিন্তু যখন তোমাকে নিয়ে আমি লিখি তখন তুমি আমার দাসী।'

তুমি নিজের মনে হাস আর তোমার সেই মনের হাসি তোমার নতুন উপন্যাসের পরাক্রান্ত নায়কের চোখে মুখে ছড়িয়ে দিতে থাক।

হঠাৎ পাশের ঘরে রোগার্তের চীৎকারে তোমার হাসি নিভে যায়। তোমার চলন্ত কলম থেমে পড়ে। তোমার স্ত্রী—যে তোমাকে বলেছিল, 'তোমাকে ছুঁতেও আমার ঘেন্না করে।'—সেই স্ত্রীই তোমার পায়ের কাছে আছড়ে পড়ে, 'ওগো, তুমি এখনো ওঠ না?'

তুমি চেয়াব ছেড়ে লাফিয়ে ওঠ, 'কেন, কী হয়েছে?'

'ওগো, মনুয়া যে আমাদের ছেড়ে যাচ্ছে!'

তোমার ছেলের অসুখের কথা তুমি শুনেছিলে। জ্বরটা ভালো নয় এ কথা তোমাকে জানানো হয়েছিল। কিন্তু তোমার নতুন উপন্যাস তোমার বহুকাল আগে লেখা একটি সাধারণ গল্পকে একেবারে ভুলিয়ে দিয়েছে। তোমার অর্থের অভাব নেই। লেখার আয়ের ওপর তোমাকে নির্ভর করতে হয় না। তুমি পয়সাওয়ালা এডভোকেট। তুমি অসুস্থ ছেলের জন্যে বড় ডাক্তার, ওষুধ-পথ্যের ব্যবস্থা করে নিশ্চিন্ত হয়ে তোমার নায়ক-নায়িকার মন-জানাজানির

পালায় মনোনিবেশ করেছ। তার পর তুমি সব ভুলে গেছ। পাশের ঘরে অসুস্থ ছেলেকে পর্যন্ত ভুলেছ। নইলে নতুন বাসরঘর তুমি কী করে রচনা করবে।

সব ফেলে তুমি ছুটে গেলে। শুধু একবার মাত্র ডাক শুনলে তার মুখের: 'বাবা।'

আর কিছু শুনলেনা।

তোমার স্ত্রী, পুত্রবধূ, ঘরভরা আত্মীয়-আত্মীয়াদের কান্নায় বাড়ি ভরে গেল।

শুধু তুমি কাঁদতে পারলেনা। তুমি মনে মনে বলতে লাগলে, 'আমার শত মানসপুত্রের বদলে আমার একটিমাত্র ছেলেকে ফিরিয়ে দাও। আমি যশ চাইনে, অর্থ চাইনে, নারী চাইনে, সৃষ্টিশক্তি চাইনে, আমি শুধু আমার জীবন্ত ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরতে চাই।' কার কাছে এই প্রার্থনা তুমি তা জানোনা। কারণ তুমি তো ঈশ্বর মানোনা। ঈশ্বর যে তোমারই মানসপুত্র, যে তোমার আত্মজ, তোমার ভাবসত্তায় যার জন্ম সেই ঈশ্বরকে স্বীকার করা তো দূরের কথা, তার নাম উচ্চারণেও তোমার লজ্জা। যেন জারজ সন্তানকে তুমি স্বীকার করে নিচ্ছ, যেন সে শুধু ধর্মপ্রচারকের, পাদ্রী-পুরোহিতের, মূঢ় অশিক্ষিত জনসাধারণের একটি সংস্কার মাত্র—কবি, দার্শনিক, ভাবুকের সৃষ্টি নয়। তাই তুমি তাকে আজও স্বীকার করতে পারনি। তোমার যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক মনের কাছে তাহলে তোমার লজ্জায় যে মাথা কাটা যাবে।

ইন্দুভূষণ কিছুদিন পরে নিজের সেই শোককে একাধিক গল্প-উপন্যাসে বর্ণনা করতে চেষ্টা করেছিলেন। পারেননি। একবার লিখেছিলেন, 'পাঁজরার হাড় কে যেন একখানা একখানা করে খুলে নিচ্ছে।' লিখেই বুঝেছিলেন, কিছুই হলনা। সেই তীব্র যন্ত্রণার বিন্দুমাত্রও উপমার মধ্যে প্রকাশ পেলনা। আর একবার লিখেছিলেন, 'একটা অসহায় মানুষ অন্ধকারে মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেছে আর তার ওপর দিয়ে পাথরে বোঝাই এক বিরাট চক্রযান যাচ্ছে আর আসছে, যাচ্ছে আর আসছে। আশ্চর্য, লোকটাকে কেউ মরতে দিচ্ছেনা। শুধু তার অস্থি আর মজ্জা, তার স্বাদ আর স্বপ্ন প্রতিমুহূর্তে পিষে পিষে ধুলোয় মিশিয়ে দিচ্ছে।' লিখে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন ইন্দুভূষণ। সেই যে যন্ত্রণা তা কি শুধু দেহের যে, বার বার তিনি কেবল দৈহিক কষ্টের সঙ্গে তুলনা দিচ্ছেন? সেই অসাড়তা, অসহায়তা, স্বাদগন্ধহীন পৃথিবীর নিরর্থকতা এই

উপমায় কতটুকু ফুটে উঠেছে ? সে শোককে বর্ণনা করবার চেষ্টা বৃথা। কিন্তু অবর্ণনীয় শুধু এই কথা বলেই কি ভাষাশিল্পী নিজের হাত থেকে নিজে রেহাই পান ? পুত্রহারা মায়ের মতো শুধু কাঁদলেই তাঁর নিষ্কৃতি নেই, সেই শোককে অভূতপূর্ব শিল্পরূপ দিতে পারলে তবে তাঁর ক্ষণিক মুক্তি।

—'বাবু!'

চমকে উঠলেন ইন্দুভূষণ, 'কে ?'

চাকর অমূল্য।

ভ্রম ভাঙল। নিজের মনেই লজ্জিত হলেন ইন্দুভূষণ। মনুয়া তাকে ছেলেবেলায় 'বাবু' বলেই ডাকত।

অমূল্য বলল, 'বাবু, এই দেখুন কত ফুল নিয়ে এসেছি।'

একরাশ লাল আর হলদে ডালিয়া আর দু'তিন ডজন রজনীগন্ধা। স্নিগ্ধ সবুজ মোটা মোটা ডাঁটা। তরুণী তন্বী নারীদেহের উপমা মনে আসে। ইন্দুভূষণ উল্লাসে উৎসাহে সোজা হয়ে উঠে বসলেন, 'কে এনেছে ? কে ? মিসেস রায় নিয়ে এলেন বুঝি ?'

আমূল্য বলল, 'না বাবু। আমাদেরই ভুবন মালী দিয়ে গেল। টালীগঞ্জের বাগানের ফুল।'

ইন্দুভূষণ রাগে জ্বলে উঠলেন, 'দূর করে দে, দূর করে দে। হতভাগা মরবার আর জায়গা পেলনা।'

অমূল্য বলল, 'বাবু, আপনার জন্মদিন—'

ইন্দুভূষণ বললেন, 'জন্মদিনে এখানে মরতে এসেছে কেন ? সারাদিন ওর আর সময় হয়ে ওঠেনি। এই সন্ধ্যেবেলায় ফুলের ডালি নিয়ে এসেছে। ঘাড় ধরে বের করে দে।' ক্রোধে আক্রোশে উত্তেজনায় হাঁপাতে লাগলেন ইন্দুভূষণ।

অমূল্য শান্তভাবে বলল, 'সে নিজেই চলে গেছে বাবু।' বলছিল সকাল-বেলায় তার নাকি খুব দাস্তবমি হয়ে গেছে। তাই আসতে পারেনি।'

ইন্দুভূষণ চেঁচিয়ে উঠলেন, 'সব মিথ্যুক। জোচ্চোর আর বদমাস। আমি কারো কথায় বিশ্বাস করিনা। আর তুই হয়েছিস চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা।'

অমূল্য রাগ করলনা। সহানুভূতির সুরে বলল, 'সত্যি বাবু, মিসেস রায় কেন যে আজ এলেন না বুঝতে পারছি না। প্রত্যেকবার আসেন—। আমি যাব নিউ আলীপুরে, নাকি আপনি একটা ফোন করে দেবেন ?

ইন্দুভূষণ ফের চটে উঠলেন 'বেরিয়ে যা, দূর হয়ে যা। হতভাগা হারামজাদা

শুয়োর! ইয়ার্কি হচ্ছে আমার সঙ্গে? নাই পেয়ে পেয়ে তুমি কাঁধে উঠতে চাইছ। নেড়ী কুকুর?'

অমূল্য এবার সরে গেল। বেশি রাগলে বাবু একেবারে পাগল হয়ে যান। তখন ওঁকে বেঁধে রাখতে পারলে ভালো হয়। কিন্তু কে বাঁধবে? হাত বাঁধো পা বাঁধো, মন বাঁধে কে?

ইন্দুভূষণ ইজিচেয়ারে আবার ঠেস দিয়ে শুয়ে পড়লেন। মুহূর্তের মধ্যে ফের শান্ত আর ঠাণ্ডা হয়ে গেলেন। ভারি শীত লাগছে। এ বছরে হঠাৎ বেশি শীত পড়ে গেছে, নাকি এ শীত শুধু একা তাঁরই? পঁচাত্তর বছরের শীত সব এসে একজায়গায় জমেছে, তাঁর বুড়ো জীর্ণ হাড় ক'খানার ঠকঠক বাজনা শুনতে চায় নাকি? কোটের ওপরে শালখানা গায়ে জড়িয়ে নিলেন ইন্দুভূষণ। এই শাল মিসেস রায়—অনুপমা রায়-ই তাঁকে এক জন্মদিনে উপহার দিয়েছিলেন। কিন্তু এবারের জন্মদিনে সে আর এলনা, কোন উপহারও পাঠালো না। মাত্র দিন পনেরো আগে তাকে কড়া কড়া কথা বলে অপমান করেছিলেন ইন্দুভূষণ। কিন্তু আশা করেছিলেন তা সে মনে রাখবেনা, অন্তত তাঁর জন্মদিনটিতে সে-কথা সে ভুলে যাবে। আগেও তো তাঁদের মধ্যে কত ঝগড়াঝাঁটি কত ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। কিন্তু জন্মদিনে অনু না ডাকতেই এসেছে। কোন কারণে না আসতে পারলে, কি কলকাতার বাইরে থাকলে সেখান থেকে চিঠি কি টেলিগ্রাম পাঠিয়েছে। কোনবার কলম, ফুলদানি, সিগারেট কেস, ডায়েরি, উপন্যাস লেখার জন্যে বাঁধানো খাতা, নিজের হাতে বোনা জাম্পার,—অনুপমা তাঁকে না দিয়েছে এমন বস্তু নেই। অনুপমা নেয়নি এমন বস্তুই কি আছে? তার জন্যে ইন্দুভূষণ দাম্পত্য-জীবনের সমস্ত শান্তি নষ্ট করেছেন, নিজের ছেলের কাছে অশ্রদ্ধাভাজন হয়েছেন, পুত্রবধূ আর নাতনীর শ্রদ্ধা হারিয়েছেন। ঈর্ষার বিষে আর যক্ষ্মারোগে স্ত্রীকে তিলে তিলে মরতে দিয়েছেন। অভিনেত্রী অনুপমার জন্যে ইন্দুভূষণের ত্যাগও কি কম?

স্বামীত্যাগিনী এই নারীটিকে তিনি প্রথমে দেখেছিলেন নিজেরই নাটকের নায়িকার ভূমিকায়। রঙ্গজগতে তখন অনুপমা স্থায়ী আসন করে নিয়েছে। তার নাম শুনে নাট্যরসিকদের ভীড় বাড়ে, থিয়েটার-সিনেমার পরিচালকদের কাছে তার প্রতিপত্তি সীমাহীন। তবু বিরোধের ভিতর দিয়েই ইন্দুভূষণের সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছিল। তাঁর 'অঙ্গনা' নাটকের মহড়া দেখতে গিয়ে তিনি তার মুখের ওপরই বলে দিয়েছিলেন, 'আপনি ভুলে যাচ্ছেন আমার নাটকখানা

পৌরাণিকও নয়, ঐতিহাসিকও নয়—সামাজিক। নিতান্তই ঘরোয়া চিত্র। তাই তার চরিত্রগুলি ধীরে-সুস্থে কথা বলে, স্বাভাবিকভাবে হাঁটে-চলে। আমার বইতে বীরাঙ্গনা লক্ষ্মীবাইদের কোন স্কোপ নেই।'

এই রূঢ় সমালোচনায় অনুপমার মুখ ক্রোধে অপমানে লাল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সেই ক্রোধকে শুধু মুখের বর্ণ পরিবর্তন ছাড়া ভাষায় কি আচরণে ফুটে উঠতে সে কিছুতেই দেয়নি। বরং একটু বাদে রঙমাখা ঠোঁটকে মধুর মৃদুহাসির রঞ্জনে আরও নয়নাভিরাম করে ম্যানেজারের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'ইন্দুবাবু বুঝি মেয়েদের মধ্যে শুধু গৃহলক্ষ্মীকেই দেখেছেন? আমাদের গৃহও নেই আর লক্ষ্মীও নই। আমরা যা, আমরা শুধু তাই-ই। কিন্তু ম্যানেজারবাবু, উনি যেন এসব চিন্তাভাবনা না করেন। অডিয়েন্‌স্ কী চায় আমি জানি। ইন্দুবাবু তাঁর মক্কেলদের দেখুন। আমার মক্কেল নিয়ে তাঁর মাথা ঘামাবার দরকার নেই।'

ইন্দুভূষণ অভিনেত্রীর স্পর্ধায় ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, বিস্মিত হয়েছিলেন, নিজের কাছে নিজে স্বীকার না করলে হবে কি, মুগ্ধও হয়েছিলেন। তখন তাঁর বয়স পঞ্চাশ ছুঁই-ছুঁই করছে। জোরে বইছে উনপঞ্চাশী হাওয়া। অনুপমাও অবশ্য তরুণী নয়। সেও তিরিশ পার হয়েছে। বেশভূষায় চালচলনে যদিও তার কোন প্রকাশ নেই। থিয়েটারের কর্তারা বাইশ তেইশ কি বড়জোর পঁচিশ —তার ঊর্ধ্বে তাকে উঠতে দেন না। মঞ্চে নামান অষ্টাদশীর ভূমিকায়। তার তন্বী চেহারায় সবই মানিয়ে যায়।

রিহার্সেল-রুমে সেই যে বাক্‌যুদ্ধের মহড়া শুরু হয়েছিল তার জের চলেছিল আরও পাঁচ বছর ধরে। অনুপমা সহজে ধরা দেয়নি। ইন্দুভূষণের নাটকের নায়ক আর উপনায়ককে সে অপক্ষপাতে অনুগ্রহ বিলিয়েছে, কিন্তু লেখকের সঙ্গে তার চলেছে শুধু ছলা কলা আর কৌশলের অস্ত্রপরীক্ষা। কে হারে কে জেতে। ভাষা-শিল্পী না ভঙ্গি-শিল্পী। শেষ পর্যন্ত ইন্দুভূষণই হার মেনেছেন। ভঙ্গির কাছে তাঁর পরাজয় তো এই নতুন নয়। ঠোঁটের ভঙ্গি, চোখের ভঙ্গি, ভ্রূ বাঁকাবার ভঙ্গি, বেণী দোলাবার ভঙ্গি—প্রত্যেকটি ভঙ্গির কাছে তিনি আত্মসমর্পণ করেছেন। সাহিত্যেও তাই। ভাষা-ভঙ্গির কাছে তিনি বিষয়কে উৎসর্গ করেছেন। তিনি সারাজীবন বলে এসেছেন, ভেবে এসেছেন—'বিষয়! বিষয় আবার কি? আমি ভাষার আধারে যা ধরে দেব তাইতো বিষয়। আমার হাতে ধুলিমুঠি সোনামুঠি হবে। আমি দিনকে রাত করব, রাতকে দিন। আম নতুন পৃথিবী গড়ব। তার আলাদা নিয়ম, আলাদা নীতি, আলাদা

মূল্যবোধ। আমি কি কেবল চিরাচরিতের ওপর শুধু দাগা বুলাবার জন্যে জন্মেছি ?'

ভঙ্গিমার মহিমাকেই সর্বপ্রধান বলে মেনে নিয়েছিলেন ইন্দুভূষণ। একবার এক সাহিত্য-সভায় সদম্ভে বলেছিলেন, 'বিষয় বিষয়ী লোকের জন্যে। সাহিত্যে যারা পাটের কারবারী, আলকাতরার দালাল তাদের জন্যে। তারা সংসারেও বিষয় খোঁজে, সাহিত্যেও বিষয় খোঁজে। কিন্তু সত্যিকারের শিল্পী বিষয়ের সন্ধান করেননা, সত্যিকারের রসিক পাঠক বিষয়ের হাত থেকে মুক্তি চান। রূপই শুধু তাঁকে সেই বাঞ্ছিত মুক্তি এনে দেয়। রূপলোক মানেই রসলোক। সেই রূপের স্পর্শে ধুলো সোনা হয়ে যায়। আর সেই রূপের জাদু না জানা থাকলে সোনা শুধু রূপা নয়, কাঁসা-পিতলের দলে গিয়ে জাত হারায়। শিল্পে রূপ মানে শুধু নিষ্প্রাণ জীবের অবয়ব নয়, তাঁর প্রতিটি অক্ষরে প্রতিটি আঁচড়ে প্রাণ-স্পন্দন, রসের স্রোতস্বতী। শিল্পে রূপ মানে আত্মার রূপ। আমাকে দেহবাদী বলে ভুল করবেননা, আমি দেহাত্মবাদী। দেহই আত্মা নয়, দেহ ও আত্মা।'

ভঙ্গির কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন, সাহিত্যে আর জীবনে, একই ভাবে একই সঙ্গে। আজ সেই তনুশ্রী পুরনো জরাজীর্ণ। কিন্তু তাই বলে রূপচর্চায় সেদিন যে আনন্দ পেয়েছিলেন সে কথা অস্বীকার করলে পরম অকৃতজ্ঞতা হবে। যৌবন ক্ষণস্থায়ী বলে কি তার গৌরব কম ? বসন্ত বারমাস থাকেনা বলে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে লাভ কি ?

চিরকাল রূপের আকর্ষণ তাঁকে টেনেছে। সেই রূপ শুধু শিল্পের রূপ নয়, নারীর রূপ নয়—অর্থের রূপ, যশের রূপ, পৃথিবীর সমস্ত রকমের ভোগ-সম্ভোগের রূপ।

সহপাঠী বন্ধু সোমেশ্বর সেনকে ওকালতিতে উন্নতি করতে দেখে ইন্দুভূষণও উঠেপড়ে লাগলেন। তিনিও ভালো উকিল হবেন। সোমেশের মতো বাড়ি গাড়ি করবেন। কলমকে যদি লক্ষ্মীর দাসত্বে লাগিয়ে দেন, তা ভোঁতা হতে দেরি হবেনা। তার চেয়ে উকিলের মুখ থাকুক লক্ষ্মীর স্তবগানের জন্যে আর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কলমের মুখ সরস্বতীর।

সোমেশ্বর হেসে বলেছিল, 'পারবে কি ভাই ? **Law is a jealous mistress.**'

ইন্দুভূষণ জবাব দিয়েছিলেন, 'সতীনদেরই সামলাবার কৌশল আমি জানি।'

যৌবনের সেই আত্মপ্রত্যয়কে এই বুড়োবয়সে নিতান্তই মূঢ় দম্ভ বলে মনে হয়েছে ইন্দুভূষণের। পারা যায় না, তা পারা যায় না। Jealous mistress কি শুধু Law? সব সব। Law, literature, love, life itself with its innumerable ever-increasing cravings. প্রত্যেকেই এক একটি অসীম অসূয়াবতী উপপত্নী। সেই সপত্নীদের কলহ মেটাতে মেটাতে সারা-জীবন কাটিয়ে দিলেন ইন্দুভূষণ। আজ সব মিটেছে তবু সাধ মেটে কই।

কিন্তু নিষ্ঠাহীন ইন্দুভূষণই না হয় ব্যর্থ হয়েছেন, সাধনা ছিলনা বলে সিদ্ধিও হয়নি, কিন্তু যাঁরা সাধনা করেছেন, যাঁরা শুধু সাহিত্য নিয়েই পড়ে ছিলেন, তাঁদের অনেকেই তো পথ থেকে সরে গেছেন। ইন্দুভূষণের মতো তাঁরাও আজ অশ্রুতনামা, বিস্মৃতকীর্তি। কেউ নিষ্ঠার অভাবে যায়, কেউ শক্তির অভাবে যায়। যেতে হয় সবাইকেই। শুধু দু'একজন থাকেন। তাঁরা দশকে দশকে আসেননা। প্রতি শতাব্দীতেও নয়। তাই আয়ুর ক্ষীণতা নিয়ে ক্ষোভ করে লাভ নেই। তবু আশ্চর্য, এই নশ্বর মরজগতে মানুষের অমর হবার সাধের অন্ত নেই। সে নিজের পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্রের মধ্যে অমর হয়ে বেঁচে থাকতে চায়, সে নিজের মানসসৃষ্টির মধ্যে অমরত্ব খোঁজে। ভুলে যায় অমরত্ব সীমাহীন কালে নয়, অত্যন্ত সসীম সাধনাঘন কয়েকটি মহেন্দ্র-ক্ষণের মধ্যে। তোমার সমগ্রজীবনকে যদি সেই একটি ক্ষণে আবদ্ধ করতে পার, একটি সাধনায় নিবদ্ধ রাখতে পার, আর যদি সেই সাধনা তোমাকে অমৃতের স্বাদ এনে দেয় তাহলে তুমি বেঁচে রইলে। তারপর তুমি জীবিত কি মৃত সে তথ্য তোমার কাছে অর্থহীন। কিন্তু তেমন সাধনা তো করতে পারেননি ইন্দুভূষণ। তাঁর ক্ষোভ সিদ্ধি হলনা বলে নয়, সাধনা হলনা বলে।

—ক্রীং ক্রীং ক্রীং…

পাশের ঘরে টেলিফোনটা বেজে উঠেছে। ইন্দুভূষণ খুসি হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। ফোন তো নয় যেন সেতারের তারে ঝঙ্কার লেগেছে। হেঁটে নয় প্রায় ছুটে গেলেন ইন্দুভূষণ। এতক্ষণে মনে পড়েছে মান ভেঙেছে অভিমানিনীর।

পরম আদরে রিসিভারটা তুলে নিলেন ইন্দুভূষণ, মাউথ-পীসটা মুখের কাছে নিয়ে কোমল স্নিগ্ধস্বরে বললেন, 'অনু, এতক্ষণে মনে পড়ল তোমার? কাকে চাই? রামেশ্বর তেওয়ারীকে? No, no, no, it is wrong number.

আমি কে ? তা নিয়ে মাথা ঘামাবার তো দরকার নেই আপনার। I am nobody.'

বিরক্ত হয়ে সশব্দে রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেন ইন্দুভূষণ। আশ্চর্য, এই স্বয়ংক্রিয়তার যুগেও দুষ্কৃতির শেষ নেই। সকালের দিকে আরো একটা wrong call এসেছিল। সব ভুল ঠিকানা। তাঁকে আজ আর ডাকবার কেউ নেই, খোঁজবার কেউ নেই। অথচ এমন একদিন ছিল, শুধু জন্মদিন কেন, অন্যদিনেও তাঁর টেলিফোনটার ঝঙ্কারের বিরাম ছিলনা। পাব্লিশারের দোকান থেকে ফোন, থিয়েটার থেকে ফোন, অগণিত বন্ধু-বান্ধবী, পাঠক-পাঠিকার কণ্ঠস্বর। সেই কোরাস আজ একেবারে থেমে গেছে। ইন্দুভূষণ এ-যুগের পাঠকদের কাছে মৃত, বিস্মৃত। গত পনেরো বছর ধরে তিনি প্রায় কিছুই লেখেননি। যা লিখেছেন তা একান্তই অকিঞ্চিৎকর, তার চেয়েও বড় কথা তা একেবারেই পাঠকদের মনে ধরেনি। তারও আগে থেকে তাঁর ক্রিটিকরা আর তরুণ লেখকরা, পাঠকরা সমস্বরে বলতে শুরু করেছিলেন তিনি ফুরিয়ে গেছেন। তাঁর আর কিছু দেবার নেই। 'নেই' 'নেই' এই রব একবার তুলে দিতে পারলেই হল। আছে কি, না আছে যাচাই করে দেখবার ধৈর্য্য কার। কাল ইন্দুভূষণের লেখা পড়ে যারা খুসি হয়েছিল, তারা তাকে ভুলে গেছে। অকৃতজ্ঞ, পরম অকৃতজ্ঞ। তুমি আজ যদি কিছু দিতে না পার, কাল যে দিয়েছিলে সে কথা আর মনে রাখবেনা। দানের গৌরব তোমাকে প্রতিদিন অর্জন করতে হবে। প্রতিদিন তোমার নিজেকে অতিক্রম করে যেতে হবে। নিজের সঙ্গেই তোমার প্রতিযোগিতা। তোমার পুরনো তুমির সঙ্গে তোমার নতুন তুমির, কালকের তুমির সঙ্গে আজকের তুমির। ইন্দুভূষণের মনে পড়ল তাঁর সামনে তাঁর সমসাময়িক অন্য কোন লেখকের প্রশংসা করলে তিনি ক্ষুণ্ণ হতেন ; শুধু তাই নয়, তাঁর নতুন লেখার তুলনায় পুরনো লেখার প্রশস্তি করলে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতেন। তাঁর পুরনো-লেখা যেন আর-একজন লেখকের লেখা। সে লেখক তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী, তাঁর পরম শত্রু। আজ নতুন-পুরনো কোন লেখার কথাই কেউ বলেনা। পঞ্চাশের ওপরে বই লিখেছেন ইন্দুভূষণ। ছোট বড় মাঝারি গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ—কিছুরই কোন উল্লেখ নেই। একটি ছেলে গেছে আর পঞ্চাশটি মানসপুত্র। কখন যে গেছে ইন্দুভূষণ অনেক সময় টেরই পাননি। যখন পেরেছেন—জ্বলে উঠেছেন, পুড়ে মরেছেন। আজ আর বাইরে কোন দাহ নেই, সমস্ত অন্তর জুড়ে চিতাশয্যা পাতা। সেই মহা শ্মশানভূমিতে সৃষ্টির অঙ্কুরমাত্র নেই।

মনে আছে ছেলেবেলায় ঠাকুরমাকে প্রণাম করলে তিনি ফোগলা দাঁতে হেসে আশীর্বাদ করতেন, 'আমার মাথায় যত চুল তত বছর পরমায়ু হোক।'

দীর্ঘায়ু হবার যন্ত্রণা যে কত তা কি তিনি নিজেই জেনে যাননি? তবু আশীর্বাদ করতেন। দীর্ঘায়ুতার পথ মৃত্যুতে আকীর্ণ। আত্মীয়ের মৃত্যু; স্বজনের মৃত্যু; পুত্র-পৌত্রের সহস্র শোকাশ্রুতে সে পথ পিচ্ছিল। সবচেয়ে বড় শোক নিজের কীর্তির মৃত্যুতে। সবচেয়ে বড় শাপ নিজের যশের চেয়ে দীর্ঘায়ু হওয়া। তোমার সৃষ্টির চেয়ে তুমি মহৎ হতে চাও হও, কিন্তু দীর্ঘায়ু হয়োনা। নিজের আয়ুর সঙ্গে নিজের সৃষ্টির প্রতিযোগিতায় সৃষ্টিকে তুমি জয়ী হতে দাও। তুমি যে মহৎ সেও তোমার সৃষ্টির মধ্যে। তোমার বাক্যে, তোমার কর্মে। তুমি যদি জীবন-শিল্পী হও—তোমার জীবনই তোমার বাণী, কিন্তু তুমি যদি কথাশিল্পী হও—তোমার বাণীই তোমার জীবন।

মাঝে মাঝে ইন্দুভূষণের মনে হয় এত দীর্ঘজীবী না হয়ে একটি নিটোল সুন্দর ছোটগল্পের মতো শেষ হয়ে যেতে পারলে মন্দ ছিলনা। যৌবনের আকস্মিক মৃত্যুতে ছোটগল্পের চমক আছে। সে মৃত্যু একটি ফুলের মতো একটি সুরভিত দীর্ঘশ্বাসের মতো। কিন্তু জরা তোমাকে অত সহজে মরতে দেবেনা। সে ক্লান্তিকর বিরক্তিকর অনিপুণ লেখকের সুদীর্ঘ উপন্যাসের মতো। জরা তোমাকে ধীরে ধীরে সরিয়ে আনবে, একটি একটি করে তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে অসাড় করবে, তোমার আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবকে তোমার সম্বন্ধে উদাসীন নিস্পৃহ করে তুলবে। দীর্ঘকাল তোমাকে জীবন্মৃত করে রাখবে, তারপর মৃত্যুর হাতে তুলে দেবে তোমাকে ছুঁড়ে আঁস্তাকুড়ে ফেলে দেওয়ার জন্যে।

ইন্দুভূষণ আজকাল আর আয়নার সামনে দাঁড়ান না। দাঁড়াতে ভয় পান। জরা তাঁর সেই ছ'ফুট দেহকে কুঁকড়ে ভেঙে নিজের বিজয়ধনু করেছে। তাঁর সেই উজ্জ্বল গৌরবর্ণে মনের সাধে দু'হাতে কালি লেপেছে। তাঁর মসৃণ ত্বককে হাতের মুঠিতে নিয়ে কুঁচকেছে, কচলেছে। তাঁর দৃষ্টিকে খর্ব করেছে; শ্রুতিকে ক্ষীণ। দাঁতগুলি অনেক আগেই গিয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে পাথরের দাঁত পরে নিয়েছেন ইন্দুভূষণ। আর কিছু না পারুন, বিদ্রূপে ব্যঙ্গে যৌবনদর্পিত দুনিয়াকে ভেংচাতে তো পারবেন।

আজকালকার তরুণী মেয়েরা তাঁকে দেখলে ভয় পায়। সেবার অনুপমাও হেসে বলেছিল, 'তুমি যে এত তাড়াতাড়ি বুড়ো হয়ে যাবে তা ভাবিনি।

নিজেকে একেবারে হরির লুটের মতো যাকে তাকে বিলিয়েছ। আমার সতীন রাক্ষুসীরা শাঁসটুকু নিয়ে আঁশ আর খোসাটুকু রেখেছে।'

শুনে খুসি হননি ইন্দুভূষণ, দারুণ ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। একটু বাদে হেসেই জবাব দিয়েছিলেন, 'এই খোসার মধ্যে এখনো যা আছে অনেক শাঁসেও তা পাবে না।'

অনুপমা তার চেয়ে বছর পনেরোর ছোট। বয়স চুরি করে আরো বেশি ছোট সেজেছিল। ইন্দুভূষণ তাতে আপত্তি করেননি। নিজের বয়স আর পরের মন চুরি করবার জন্যেই তো মেয়েদের জন্ম। বুড়ো বলে খোঁটা দিতে-দিতেও অনুপমা তাঁকে সব দিয়েছে। তাঁর জন্যে ফিরিয়ে দিয়েছে অনেক স্বাস্থ্যবান যুবককে, ফিরিয়ে দিয়েছে তাঁর চেয়ে বহুগুণ ধনীকে মানীকে। স্ত্রী মারা যাওয়ার পর সে প্রায় স্ত্রীর আসন নিয়েই রয়েছে। কতদিন বলেছে, 'তোমাকে কাছে রেখে যত্ন করতে পারি না। তুমি চলে এসো আমার এই নতুন বাড়িতে।'

ইন্দুভূষণ জবাব দিয়েছেন, 'মানে, তোমার রক্ষিত করতে চাও।'

'ছিঃ, রক্ষক করতে চাই, এ কথাও তো বলতে পারতে।'

ইন্দুভূষণ বলেছিলেন, 'তা আর কী করে বলি। তোমার অনেক যশ, অনেক অর্থ। যৌবন যাই-যাই করলেও যুবকেরা যায়নি। এখনো তোমার আনাচে কানাচে তারা ঘুরঘুর করে। ড্রয়িংরুমে একবার এসে বসতে পারলে আর উঠতে চায় না।'

অনুপমা হেসে বলেছিল, 'তুমি সেই হিংসাতেই গেলে। এত বয়স হল, তবু তোমার হিংসে গেল না?'

ইন্দুভূষণ জবাব দিয়েছিলেন, 'তা কি আর যায়? শুনেছি ঈশ্বর নাকি ষড়ৈশ্বর্যময়। মানুষের ষড়রিপুর ঐশ্বর্য, তা শুধু চিতায় ছাই হয়, তার আগে অনির্বাণ অগ্নি।'

তারপর আস্তে আস্তে অনুপমাও ঈর্ষার যোগ্যতা হারিয়েছে। অতনু তার দিক থেকেও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। অতিতনুর বোঝা তার পক্ষে এখন বহন করা কষ্ট। রক্তের চাপে আর মাংসের চাপে তার রক্তমাংসের ক্ষুধা সব গেছে। প্রথম কিছুদিন মা-মাসীর ভূমিকায় নেমেছিল, এখন পরিচালকরা ঠাকুরমা দিদিমা ছাড়া ডাকতে চায় না। অভিমানে অনুপমা একেবারে অবসর নিয়েছে। কি চিত্রে কি মঞ্চে কোথাও আর তার দেখা মেলে না। সে এখন আর পর্দার ওপরে নয়, পর্দার আড়ালে। তার অতিপ্রিয় দর্শকদের চোখের আড়ালে এবং মনের আড়ালে। 'দেহপট সনে নট সকলি হারায়'। নটীও তাই। যৌবনে সে যত

পটীয়সীই হোক বার্ধক্যে তারও সেই দশা। কিন্তু ইন্দুভূষণের তো তা হবার কথা ছিল না। লেখকের যৌবন তো শুধু দেহনির্ভর নয়। সহস্র অক্ষর তাঁর চিরদীপ্তি বহন করে। শুধু যৌবনকে জাগিয়ে রাখতে হয়, সঞ্জীবিত রাখতে হয়। সে বিদ্যা ইন্দুভূষণ ভুললেন কী করে? নারী-সংসর্গে? না, না। ওদের দোষ দেওয়া বৃথা। ওরা তাঁকে অনেক দিয়েছে। অনেক শ্রদ্ধা, অনেক ভক্তি, অনেক উৎসাহ উদ্দীপনা, কত সৃষ্টির প্রেরণা দিয়েছে ওরা। তিনি যে ফিরিয়ে দিতে পারেননি সে তাঁরই দোষ। তিনি দিতে পারেননি, আজ আয়ুর শেষে এসে মনে হচ্ছে নিতেও পারেননি।

হৃতশ্রী হবার পরেও অনুপমা তাঁকে অনেক দিয়েছে। মনে হয় তখনই সবচেয়ে বেশি দিয়েছে। সুহাসিনী বেঁচে থাকলেও বোধ হয় এমনি করেই দিত। এমনি করেই বলত, 'আমার রূপ নেই, যৌবন নেই, শুধু আমি আছি। তোমার যশ নেই গৌরব নেই, তবু তুমি আছ। এসো আমরা কাছাকাছি থাকি।' জরা সব নিতে পারে, কিন্তু সত্যিকারের শিল্পী তার হাত থেকে নিজের সৃষ্টিশক্তিকে কেড়ে রাখেন। জরা সব নেয় কিন্তু সত্যিকারের প্রেমিক তাঁর ভালোবাসবার শক্তিকে তার হাতে ছেড়ে দেন না।

ইন্দুভূষণ জানেন অনুপমার মনে বড় দুঃখ। স্বামীকে ছেড়ে আসবার জন্যে নয়, ছেলেকে ছেড়ে আসবার জন্যে। তার স্বামী ফের বিয়ে-থা করে ছেলেমেয়ের বাপ হয়েছেন। কিন্তু অনুপমার ছেলে বড় হয়ে সব কথা জানতে পেরে বিদেশবাসী হয়েছে। মা আর মাতৃভূমি দুইই ছেড়ে গিয়েছে সে। বিদেশে সে জ্ঞানী হয়েছে, বিজ্ঞানী হয়েছে। তবু মাকে ক্ষমা করতে পারেনি। অনুপমার সম্পদ সে ছোঁয়নি, খ্যাতিকে তুচ্ছ করেছে। এই দুঃখই তার সবচেয়ে বড়। তার কোল জুড়ে আর কোন সন্তান আসেনি, অনুপমাই আসতে দেয়নি। আজ সেই হাহাকার তার আর যেতে চায় না।

ইন্দুভূষণের মনে পড়ছে কত সন্ধ্যায়, কত গভীর রাত্রির অন্ধকারে দুজনে মুখোমুখি বসে কাটিয়েছেন। কখনো বন্ধ ঘরে, কখোনো খোলা ছাদে আকাশের নিচে। মৃতপুত্রের বাপ আর হৃতপুত্রের মা, নষ্টগৌরব লেখক আর বিস্মৃতযশা নটী। মনে হয়েছে এমন করে যেন কোন নারীকেই তিনি আর পাননি। সব হারাবার পর তিনি এমন করে কারো কাছে আর যাননি, সব হারাবার পর এমন করে তাঁর কাছে কেউ আর আসেনি। প্রহরের পর প্রহর কখনো মুখোমুখি, কখনো পাশাপাশি শুধু চুপ করে বসে রয়েছেন। কথা নেই, হাসি নেই, চুম্বন

নেই, আলিঙ্গন নেই। দুজনের মিলনের জন্যে ওসবের প্রয়োজনই কি আর আছে?

তবু এই অনুপমাকেই সেদিন বড় কটুভাষায় অপমান করে এসেছেন ইন্দুভূষণ। কিছুদিন হল এক তরুণ চতুর সুদর্শন অভিনেতা ওকে বশ করে ফেলেছে। অনুপমা আজ দিলীপ বলতে অজ্ঞান। এত অনুরাগ যে তিনখানা বাড়ি আর পঞ্চাশহাজার টাকার ব্যাঙ্ক-ব্যালান্সের জন্যে তা অনুপমা কিছুতেই বুঝতে চায় না।

অনুপমা হেসে বলে, 'তা নেয় যদি নিক। তুমি তো আর ওসব চাওনা।'

ইন্দুভূষণ তা মোটেই চাননা। কিন্তু ওই ছোকরা চালিয়াত ছেলেটা কেন সব নেবে? ও কোন্ যোগ্যতায় সব অধিকার করতে চায়? এই কি ওর ভালোবাসা? এত দিন প্রেমের বেসাতি করেও আসল আর নকলের ভেদ বুঝতে পারলনা অনুপমা?

এ কথায় সে জবাব দিয়েছিল, 'কী করে বুঝব বল? ও জিনিস তো আমি আর পাইনি। তা ছাড়া আমি সারাজীবন অভিনয় করেছি, জীবনের বাকি ক'টা দিন না হয় আর একজনের অভিনয় দেখতে দেখতে, আর একজনের মা সাজতে সাজতেই মরলাম।'

ইন্দুভূষণ ঈর্ষায় জলে উঠেছিলেন, 'ন্যাকামি কোরোনা। তুমি ওর রূপ-যৌবনকে ভালোবেসেছ। তোমার যে কুৎসিত মাংসের স্তূপকে আজ কেউ ছোঁয়না, তোমার সম্পত্তির লোভে—।' কথা শেষ করতে পারেননি ইন্দুভূষণ, তার আগেই পায়ের জুতো ছুঁড়ে তাঁর মুখ বন্ধ করে দিয়েছিল অনুপমা। তারপর আর ইন্দুভূষণ ওমুখো হননি।

মনে মনে ভেবেছেন, অপরাধ যে ওরই বেশি অনুপমা তা বুঝতে পেরে লজ্জিত হয়ে নিজেই যেচে আসবে। কিন্তু অনুপমা আসেনি। এমন ঝগড়াঝাঁটি তো আজ নতুন নয়। দুই শিল্পীর জীবনযাত্রা যে সদাসর্বদাই শিল্প-সম্মত ছিল তা তো আর বলা যায় না। এর আগেও তো কত কাঁচের গ্লাস, তামাকের পাইপ, ছাইদানি আর ছড়ি দুজনের মধ্যে ছোঁড়াছুঁড়ি হয়েছে। তাতে কি সম্পর্ক একেবারে ছিঁড়ে গেছে? জন্মদিনে উপহারের ডালি নিয়ে অনুপমা প্রতিবার এসেছে।

ইন্দুভূষণের জন্মদিন দু'বার খুব ঘটা করে দেশবাসীরা পালন করেছিল। একবার সিনেট হলে, আর একবার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে। কত

লোকজন, বক্তৃতা, মানপত্র, ফুলের মালা, হাততালি। সেই সমারোহের দিনে অনুপমা যায়নি। হয়তো লজ্জা পেয়েছে। ইন্দুভূষণ নিজেও সংকোচ-বোধ করেছেন। ডাকতে পারেননি তাকে। তারপরও কতবার এই ভবানীপুরের বাড়িতে ইন্দুভূষণের জন্মদিনে জনসমাগম হয়েছে। অনুরাগী বন্ধুদের নিয়ে পান ভোজন আর শিল্প-সাহিত্যের আলোচনা করেছেন ইন্দুভূষণ। কোনবার কেউ বা তাঁর নতুন গল্প শুনবার দাবি করেছে, কেউ বা উপন্যাসের অংশ। তখনো অনুপমা দূর থেকে নৈবেদ্য পাঠিয়েছে, সামনে এসে দাঁড়ায়নি। তারপর আরো দুর্দিন এসেছে। ইন্দুভূষণ শুনতে পেয়েছেন, যারা সামনে সুখ্যাতি করে তারাই আড়ালের নিন্দুক। তিনিও শোধ নিয়েছেন। সেই অকৃতজ্ঞ অবিশ্বাসী বন্ধুদের মুখের সামনে দোর বন্ধ করে দিয়ে বলেছেন, 'তোমরা আর এসোনা। এরপর আমার জন্মদিন আমার মৃত্যুর পরে হবে।' মনে মনে ভেবেছেন, সেদিন যত বছর পরেই আসুক, অন্তত একজন সত্যিকারের গুণগ্রাহী পাঠক সেদিন আমাকে নতুন করে আবিষ্কার করবে, নিজের ঘরে বসে আমাকে নিয়ে অন্তত আমার একটি রচনাকে বেছে নিয়ে আমার জন্মবাসর যাপন করবে সে। সেদিন যে মাসের যে তারিখেই হোক কিছু এসে যায় না। সেই আমার একমাত্র জন্মদিন। আজ যারা আমাকে মৃত বলে জেনেছে তারা আমাকে অজাত বলেই জেনে যাক।'

নিজের হাতে সব ব্যবস্থা বন্ধ করেছিলেন ইন্দুভূষণ, সব আয়োজন ভেঙে দিয়েছিলেন। তারপর আস্তে আস্তে সবাই আসা বন্ধ করে দিয়েছে। তবু যারা দু'একজন আসতে চেষ্টা করত, ইন্দুভূষণ তাদেরও বাধা দিতেন। সহজে যেতে না চাইলে কটুভাষায় তাদের অপমান করতেন। আজকাল তাই কেউ আর আসেনা।

শুধু একজন এখনো আসে। সে কোন বাধা মানেনি, কোন নিষেধ শোনেনি। সে ইন্দুভূষণের জীবনের শেষ অভিসারিকা।

আজ সকাল থেকে মনে মনে সারাদিন তারই প্রতীক্ষা করেছেন ইন্দুভূষণ। চাকরের কাছে ধরা দেননি, তার মনিবের কাছেও কথাটা বার বার অস্বীকার করেছেন। বার বার বলেছেন, 'না না, তাকে চাইনে, চাইনে। তাকে আর ডাকবনা, কক্ষণো ডাকবনা। নিউ আলীপুর থেকে ভবানীপুর যখন তার কাছে সাতসমুদ্রের পার হয়ে পড়েছে তখন তাকে দিয়ে আমারও আর কোন

দরকার নেই। সবাইকে বাদ দিয়ে যখন আমি চলতে পারছি, তাকে বাদ দিয়েও পারব।'

সারা বাড়িটা নিস্তব্ধ। কোথাও জনমানব নেই। একতলার ঘরে চাকর আর ড্রাইভার তার বন্ধুদের জুটিয়ে এনে দোর বন্ধ করে বোধ হয় তাস পিটছে।

দেয়ালে টাঙানো ছোট হাতঘড়িটার দিকে তাকালেন ইন্দুভূষণ। দূর থেকে কাঁটা দেখা যায়না। কাছে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে দেখলেন। রাত আটটা। সারা বাড়িতে বড় ঘড়ি কি টাইমপিস টেবিলঘড়ি রাখতে দেননি ইন্দুভূষণ। ঘড়ির টিকটিক শব্দ তাঁর কাছে অসহ্য। সে যেন প্রতিমুহূর্তে বলে, 'আমি আছি কিন্তু তুমি আর নেই। তুমি আর থাকবেনা।'

ঘড়ির শব্দে ঘুম ভেঙে যায় ইন্দুভূষণের, ফের আর ঘুম আসেনা। ঘড়ি তাঁকেও কালের প্রহরী করে রাখে।

তাই বড় ঘড়ি তিনি দূর করে দিয়েছেন।

কিন্তু ছোট ঘড়িও ঠিক সময় দেয়।

রাত আটটা বাজল। এরপর আর কখন সে আসবে?

একখানা চিঠি নয়, একটা ফোন নয়, কাউকে দিয়ে একটি খবর পর্যন্ত পাঠালোনা অনুপমা। তবে কি দিলীপ সিকদার আজও ওকে নিয়ে কোথাও বেরিয়েছে? না না, তা হতে পারেনা। অত অকৃতজ্ঞ হতে পারেনা অনুপমা। অন্তত আজকের দিনে পারেনা। আজ যে তাঁর জন্মদিন। এইদিন কতবার নতুন করে তাঁদের বন্ধুত্বের জন্ম হয়েছে। সেসব কি অনুপমা একেবারে ভুলে গেছে?

বেশ, ভুলে গিয়ে থাকলে ইন্দুভূষণ তাকে ফের মনে করিয়ে দেবেন। যাকে ভালোবাস তাকে শুধু মনে করলেই চলেনা, বার বার মনে করিয়েও দিতে হয়। সে দেওয়া আরো কঠিন। সে দেওয়া নিজের অহংকারকে অভিমানকে ধরে দেওয়া।

তুমি আসবেনা, বেশ আমিই যাব। একটা ফোন করে জানিয়ে যাওয়া ভালো।

চোরের মতো চুপিচুপি ইন্দুভূষণ পাশের ঘরে গিয়ে আলো জ্বাললেন। ডায়াল ঘুরিয়ে ছ'টা ডিজিটের নির্ভুল নম্বর নিয়ে রিসিভারটা তুলে ধরলেন ইন্দুভূষণ। মধুর নিক্কণে ও-বাড়ির ঘড়িতে আটটা বাজল। 'অনুপমা, তোমার

ঘড়িটাকে অত স্লো করে রেখেছ কেন। তোমার সবই কি বিলম্বিত লয়ে? কিন্তু অত বিলম্ব আমার যে সয়না।'

কী ব্যাপার? এত গোলমাল এত হৈ-চৈ কিসের ও-বাড়িতে? 'হ্যালো, অনু, অনুপমা। আমি অনুপমাকে চাই, মিসেস রায়কে চাই। তিনি আর নেই? সেকি! কোথায় গেছেন? মারা গেছেন? হার্ট ফেইল করে? সেকি! কখন? কখন? সাড়ে সাতটায়। আমাকে একটা খবর পর্যন্ত কেউ দিতে পারলেন না? আমি কে? তাইতো আমি আজ কে? তা নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাবেন না। I am now nodody.'

আস্তে আস্তে ফোনটা নামিয়ে রাখলেন ইন্দুভূষণ। ফিরে গেলেন বড়ঘরে চেয়ারে বসলেন। গা এলিয়ে দিলেন না। শক্ত হয়ে সোজা হয়ে মেরুদণ্ড খাড়া করে বসলেন। আশ্বর্য, আজকের দিনে এ-মৃত্যু তিনি আশঙ্কা করেননি। থ্রম্বসিসের রোগীর কাছ থেকেও নয়। এত মৃত্যু দেখেছেন, এত মৃত্যু সয়েছেন, তবু মৃত্যু অপ্রত্যাশিত, তবু মৃত্যুর কথা মনে রাখতে পারেননি। জন্মদিনে মৃত্যুকে কে মনে রাখে? কোনদিনই রাখে কি?

আশ্বর্য, অনুপমা তাঁকে একটা খবর পর্যন্ত দিলনা! সময় পায়নি? না, মন থেকে সায় পায়নি? না কি, যখন সায় পেয়েছে তখন আর কথা খুঁজে পায়নি। যাই হোক, এখন আর কিছুতেই কিছু এসে যায়না। এই মুহূর্তে সবই মিথ্যা। তার মৃত্যুই একমাত্র সত্য।

শুধু এক মৃত্যু নয়, বসে বসে জীবনের সমস্ত মৃত্যুকে স্মরণ করতে লাগলেন ইন্দুভূষণ। স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়-স্বজন, খ্যাতি-কীর্তির মৃত্যু, জীবনভরা ভুলভ্রান্তি ত্রুটি-বিচ্যুতি, ক্ষয়ক্ষতি—এই জন্মদিনে আজ সব-কিছুর তর্পণ হোক। আশ্চর্য, আজ স্ত্রীর কথা, স্ত্রীর মুখ বার বার করে মনে পড়তে লাগল ইন্দুভূষণের। তাকেও যে তিনি ভালোবেসেছিলেন এ-কথা আজ কাউকে বিশ্বাস করানো শক্ত। একই হৃদয় অনেককে দিয়েছেন, তাদের দুজনকেও।

একটু বাদে নীচের ঘর থেকে অমূল্য উঠে এল। তাস খেলেনি, বাবুর জন্যে মালা গেঁথে নিয়ে এসেছে? রজনীগন্ধার মালা? এমন দিনে বাবু কিছুই পরবেননা? শোকে তাপে বাবুর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। যতই রাগ করুন, অমূল্যকে তিনি ভিতরে ভিতরে খুব ভালোবাসেন।

কিন্তু একি! বাবু মহাদেবের মতো অমন ধ্যানাসনে বসে রয়েছেন কেন? এমন তো কোনদিন বসেননা।

'কী হয়েছে বাবু, কী হয়েছে? আজকের দিনে—ছি ছি—'

ইন্দুভূষণ কোন জবাব দিলেন না।

ফুলের মালাটা নিয়ে অমূল্য আর এগোতে পারলনা। তার আর দরকারও ছিলনা। এবারকার জন্মদিনে ইন্দুভূষণ আর একটি নতুন মালা পরে বসে আছেন। দু'গাল বেয়ে অশ্রুর বিন্দু ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরে পড়ছে। আর বিদ্যুতের দীপ্তিতে সেই জলবিন্দুগুলি এক একটি মুক্তার বিন্দু হয়ে ফুটে উঠেছে।